রূপতাপস যামিনী রায়

প্রশান্ত দাঁ সম্পাদিত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
মোহন প্রেস। কলকাতা।

প্রকাশ ঃ ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ব্লক ঃ
অনিল নায়েক।
নায়েক প্রসেস। কলকাতা।

প্রচ্ছদের ছবি ঃ যামিনী রায়
প্রচ্ছদ ও নামাঙ্কণ ঃ সুব্রত চৌধুরী
প্রচ্ছদের ছবির আলোকচিত্র ঃ বীজেশ সাহা

আর্টপ্লেট মুদ্রণ ঃ
দে'জ অফসেট।
কলকাতা।

বাঁধাই ঃ রাধানাথ দত্ত।
অন্নপূর্ণা বাইন্ডিং ওয়ার্কস।
কলকাতা।

প্রচ্ছদের ছবি প্রশান্ত দাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রতিভাসের পক্ষে সন্ধ্যা সাহা কর্তৃক ১৮।এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলক্যাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, বিশ্বনাথ ঘোষ কর্তৃক, শ্রীতারা প্রিন্টিং সেন্টার, ৯/এ, কার্তিক বোস লেন কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

একালের শিল্পীদের চোখে যামিনী রায় :

অনুবাদক : বিষ্ণু বসু। সৌম্যেন্দু ঘোষ। মল্লিকা রায়। আশীষ মজুমদার। সোমক দাস। সত্যব্রত সান্যাল।

সম্পাদকের ভূমিকা

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রধান পথিকৃত রূপতাপস যামিনী রায়ের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি এই গ্রন্থ। শিল্পী যামিনী রায়ের শান্ত অথচ আনন্দময় চিত্রকলার সঙ্গে আবাল্য পরিচয় থাকলেও 'চিত্রকরের নিকট সান্নিধ্যে আসার পরম সৌভাগ্য হয় অনেক পরে। তখন প্রদর্শনীতে, শিল্পীদের স্টুডিয়োতে গিয়ে ছবি মূর্তি দেখা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। নিরীক্ষণের প্রতিক্রিয়া লিখতাম পত্র-পত্রিকায়।

এই সুবাদেই রূপতাপস যামিনী রায়ের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং যাওয়া আসার সূত্র ধরে কালক্রমে তাঁর স্নেহধন্য হই। পরিচয় গাঢ় হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ক্ষণিকা'র দৌলতে। এই পত্রিকার যে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা পাঠক মহলে সমাদর লাভ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'যামিনী রায় সংখ্যা'। এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে তখন ঘন ঘন যেতে হত শিল্পীর কাছে। ১৩৭৮ সনে দ্বিতীয় বর্ষের এই চতুর্থ সংখ্যায় রূপকারের বিস্ময়কর প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণে কলম ধরেছিলেন অতুল বসু, বিষ্ণু দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুধীর নন্দী, রথীন মৈত্র, হামদি বে, মুলকরাজ আনন্দ, রলফ ইটালিয়াণ্ডার প্রমুখ আরও অনেকে। এর থেকে কয়েকটি অন্তরঙ্গ আলোচনা এখানে আবার ছাপা হল। যেমন অতুল বসুর লেখার প্রথমভাগ,

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়, তাছাড়া রথীন মৈত্র ও সুধীর নন্দীর লেখার কথা বলছি।

যামিনী রায়ের কাছের মানুষ অতুল বসুর রচনার দ্বিতীয় অংশ সম্ভবতঃ চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফুলস্কেপ কাগজে টাইপ করা, নিজের হাতে ভুল সংশোধন করা জীবন স্মৃতির এই লেখাটি পুনরুদ্ধার করে এই বইতে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে শিল্পীপত্নী শ্রীমতী দেবযানী বসু ও শিল্পী পুত্র শ্রীসঞ্জীব বসুর সৌজন্যে। আর দেবীপ্রসাদের আলোচনায় প্রথমটি বহুকাল আগেই বসুমতী সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল। সন তারিখ সন্ধান করে পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণারঞ্জন বসু ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এই দুই বাঘা সংবাদিকের কলমের আখরে ফুটে উঠেছে বাগবাজারের বাসিন্দা যামিনী রায়ের জীবন ও শিল্পের কিছু ছিন্ন কথা। দক্ষিণারঞ্জন বসুর নিবন্ধ শিল্পীর মহাপ্রয়াণের পর 'অমৃত' সপ্তাহিকের ৫ই মে ১৯৭২ সংখ্যা থেকে নেওয়া। নন্দগোপাল সেনগুপ্তর রচনাটি সংকলিত হয়েছে তাঁরই লেখা বই 'স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে' থেকে। প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৯১।

মুলকরাজ আনন্দ, অশোক মিত্র, পরিতোষ সেন, গণেশ হালুই ও গণেশ পাইনের তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ চিত্র বিশ্লেষণ আনন্দবাজার পত্রিকার ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৭র সংখ্যা থেকে পুণর্মুদ্রিত এই লেখাগুলোতে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচয় হয় এক নতুন যামিনী রায়ের সঙ্গে। জি ভেঙ্কটচলম লিখিত 'কনটেমপরারি ইণ্ডিয়ান পেণ্টারস' বই থেকে বাংলা তর্জমা করে এখানে সংযোজিত। বোম্বের নালন্দা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বইটিতে প্রকাশকালের কোন উল্লেখ নেই। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর দীর্ঘ অন্তরঙ্গ সংবেদনশীল প্রতিবেদন 'দ্য ওয়াল্ড অব-টুইলাইট' এ আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭০ সালে অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের ইণ্ডিয়া ব্রাঞ্চ থেকে। বর্ষীয়ান শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী, ভবেশ সান্যাল ও সুনীল পালের লেখা যেন দ্রুতচারী রেখায় আঁকা আবেগময় স্মৃতির টুকরো টুকরো স্কেচ।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা 'ধন্য যামিনী রায়' এর রচনাকাল ১৯৪২ সাল। তখন কবির বাসভবন 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সার একটি' সম্ভবত এই নামে একটি চটি বই বেরোত। এই বইতেই এই কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়। পরে অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংযোজিত হয়। আর অসাধারণ প্রবন্ধটিও এই সঙ্গে কবিপত্নী সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর সৌজন্যে ছাপতে পেরে আনন্দিত।

ডায়েরি লেখেন অনেকে। বিশেষতঃ দৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। চিত্রশিল্পী সুনীল মাধব সেনের ডায়েরি লেখাতে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে তাঁর চিত্রের মত। একই জায়গায় একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন

চিত্রময় তথ্য, তত্ত্ব ও মনের উচ্ছ্বাস। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল শিল্পী সান্নিধ্যে যে সব স্বনামধন্য ব্যক্তি এসেছেন তাঁদের নিজের হাতে লেখা মন্তব্য বা উপলব্ধি। ঐ অভিনব দিনপঞ্জীর পাতা থেকে এখানে সংযুক্ত হয়েছে এক শিল্পী সম্পর্কে আর এক শিল্পীর অনুভব-লিপি।

স্মৃতিঘেরা বাসভূমি বেলিয়াতোড় থেকে ১৯৪২ এ প্রত্যাবর্তনের পর যামিনী রায়ের তুলি এক নতুন শিল্প ভাবনা ও ভাষায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। নবীন রূপাভিসার শুধু স্বদেশের বুদ্ধিজীবীদেরই নয়, ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অনেক বিদেশীকেও আলোড়িত করে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে নৃতত্ত্ববিদ উইলিয়াম অরচার, বাংলার গভর্ণরের স্ত্রী মিসেস কে. সি. গভর্ণরের ব্যক্তিগত সচিব জন আরউইন, স্টেটসম্যানের সম্পাদক লিড্সে এমার্সন, পদস্থ ব্রিটিশ জন টার্ণার ও মার্টিন কিরম্যান, 'নকসী কাঁথা'র মাঠের অনুবাদক মিসেস ই-এর মিলফোর্ড এবং আরও অনেকের নাম। চিত্রলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে যামিনী রায়ের শিল্পকলার স্বরূপ ও তাঁর বিকাশের আলোচনা সেদিন যে কজন বিদেশী শিল্পবেত্তার কলম মুখর হয়েছিল অস্টিন কোটস, রলফ ইটালিয়াণ্ডার, স্টেলা ক্রামরিশ ও জন আরুইন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন। যামিনী রায়ের ছবিকে অস্টিন কোটস কত ভালবাসতেন তার সাক্ষর ছড়িয়ে আছে এই বইতে তাঁর অনুবাদ লেখার ছত্রে ছত্রে। চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে ১৯৪৪/এ জন আরুইন ও বিষ্ণু দের যৌথ উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে 'যামিনী রায়' এই নামে রঙিন চিত্রসম্বলিত একটি চমৎকার বই যে পাঠকদের চমকে দিয়েছিল এ খবর অনেকেরই জানা।

এদিকে শিল্পীর এই নব রূপলেখাকে স্বীকৃতি জানিয়ে শাহীদ সুরাওয়ার্দী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রমুখ বিশিষ্ট সৃষ্টিশীল মানুষেরাও যামিনী রায়ের সৃজন প্রতিভার বিশ্লেষণে কলম ধরেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন ধরে শিল্পীর শিল্প চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস আর্তিতর যন্ত্রনা নিয়ে উন্মোচিত করেছেন কবি বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দের গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এই বইতে পুণর্মুদ্রিত প্রবন্ধে। আর যামিনী রায়ের জন্মদিনে বিষ্ণু দের কবিতাটি নেওয়া হয়েছে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ কবিতাগ্রন্থ থেকে। শাহীদ সুরাওয়ার্দীর ছোট্ট লেখাতে ফুটে উঠেছে চিত্র শরীরের খুঁটিনাটি। করুণা সাহার চিন্তা এক হলেও দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র। কল্যানকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্র দুগার এবং রথীন মিত্র স্মৃতি নিংড়ে শব্দের অক্ষরে ছবি লিখেছেন। যামিনী রায়ের ছবি সম্পর্কে এক বহু উচ্চারিত প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়েছেন অহিভূষণ মালিক। প্রণবরঞ্জন রায়ের কলমে যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত ড্রইং স্কেচ নিয়ে চুলচেরা ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় চিত্রকাঠামোর সঠিক শক্তিসত্তা। রূপতাপসের ভাস্কর্য নিয়ে অজিত চক্রবর্তীর আলোচনা এক নতুন দিক দর্শন।

এমন আলোচনা ইতিপূর্বে আর হয়নি। বিকাশ ভট্টচার্য ও রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আলোকিত হয়েছে সৃজন প্রতিভার উৎস ও তার ক্রম বিবর্তন।

রূপস্রষ্টার জীবন ও শিল্পের অনালোচিত দিকগুলো যতটা পেরেছি তথ্য অলঙ্কার দিয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছি। আর শিল্পীর নানান সময়ের প্রদর্শনীর সন তারিখের পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করেছি একটি করে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা। তা থেকে উৎসুক পাঠক সেই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে জানতে পারবেন অনেক অজানা বিষয়। আর যামিনী রায় সংশ্লিষ্ট রচনার নির্দেশিকা আশাকরি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগাবে। আর থাকছে ও সি গাঙ্গুলি, প্রদোষ দাশগুপ্ত, বিনোদবিহারী মুখার্জীর মত বিশিষ্ট কয়েকজনের লেখার অংশ বিশেষ যা থেকে উদ্ভুত অনেক জিজ্ঞাসা ও তার জবাব মিলবে।

যুগান্তর পত্রিকার 'ছোটদের পাততাড়ি'র পাতায় সত্তর সালের গোড়ার দিকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছেলেবেলা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যামিনী রায়ের ছেলেবেলা আমার অনুলেখনে যুগান্তরে ছেপে বেরোয় ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। এখানে শিল্পীর মুখ থেকে শুনে লেখা ঐ তাৎপর্যপূর্ণ রচনাটি ছাপা হল।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭তে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় যামিনী রায়ের 'স্মৃতিকথা' আত্মপ্রকাশ করে। লেখক সূচীতে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ও সি গাঙ্গুলী, মুলকরাজ আনন্দ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বিনোদ বিহারী মুখার্জী, চিন্তামণি কর, প্রতিমা দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী নন্দলাল বসুর মৃত্যুতে শোকমগ্ন গুণগ্রাহী কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিকের লেখা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার ১৮ই এপ্রিল ১৯৬৬র দৈনিকে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সূচীতে ছিলেন ও সি গাঙ্গুলী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংকলনের প্রথম লেখাটি ছিল যামিনী রায়ের। ছোট হলেও শিল্পীর খোলাখুলি অথচ মূল্যবান মতামতের জন্যে ঐ লেখাটি এখানে পুনরায় মুদ্রিত হল।

চিঠি থেকে চেনা যায় ভেতরের আসল মানুষকে। সেই দিক থেকে যামিনী রায়ের লেখা এই বইয়ের পত্রাবলী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর যামিনী রায়কে ই এম ফরস্টারের কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা কয়েক লাইনের চিঠি পড়ে বোঝা যায় একের প্রতি অপরের ছিল কত অগাধ প্রীতি, অপরীসীম শ্রদ্ধা। এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি শ্রীদেবব্রত রায়ের সৌজন্যে এখানে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। শুধু চিঠি নয় প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সহযোগিতায় এই বই যথেষ্ট পরিমানে সমৃদ্ধ হয়েছে মনে করি।

তিন কালের তিন বিখ্যাত চিত্রকরের তুলিতে যামিনী রায়ের তিনটি প্রতিকৃতি

পাঠককে উপহার দিতে পেরে আমি কৃতার্থবোধ করছি। বসন্ত গাঙ্গুলীর ছবির পশ্চাৎপট কাহিনী সংক্ষেপে একটু না বললেই নয়। বসন্ত গাঙ্গুলি একবার জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন যামিনীবাবুর বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ছাত্র কৃষ্ণ পালকে। সেই অনুষ্ঠানে অনেক শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতুল বসু, যোগেশ শীল, সতীশ সিংহ প্রভৃতি। ঐ অনুষ্ঠানে কৃষ্ণ পাল ক্যামেরার চোখ রেখে যাঁকে নিয়ে জন্মদিন তাঁর অনেক ছবি তুলেছিলেন। পরে চাদর গায়ে যামিনী বাবুর একটি ছবি বসন্তবাবুর খুব ভাল লেগে যায়। কৃষ্ণবাবুর কাছ থেকেই ষোল বাই কুড়ি মাপের একটি ক্যানভাস নিয়ে এক রূপান্বেষী আর এক রূপকারের চেহারা আঁকেন তেলরঙে। যামিনীবাবু সে ছবি দেখে আনন্দে বসন্তবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন 'খুবই ভাল হয়েছে তবে গায়ের চাদরটা একটু বেশি ভারি হয়ে গেছে। কিছুটা হালকা এবং নরম হলে আরও ভাল হত।' নিরুত্তর বসন্তবাবু যে কোন কারণেই হোক ঐ ছবিতে আর হাত দেননি। এই চমৎকার প্রতিকৃতিটি এখন আছে কৃষ্ণবাবুর হিন্দ-মোটরের বাড়িতে। প্রকৃতিবাদী শিল্পী অতুল বসুর আঁকা যামিনী রায়ের অসাধারণ আলেখ্যটি গ্রন্থবদ্ধ করা গেছে শ্রীমতী দেবযানী বসুর সহযোগিতায়। একালের অন্যতম শক্তিশালী শিল্পী শ্রীগণেশ পাইনের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নেই। এক কথাতে খুবই অল্প সময়ে তিনি যামিনী রায়ের সুন্দর ছবিটি এঁকে দিয়েছেন গভীর অনুরাগে রঞ্জিত করে। যশস্বী শিল্পী রথীন মিত্র সম্পর্কেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এছাড়া এই বইয়ের বড় আকর্ষণ একশরও বেশি স্কেচ যা মনে হয় প্রতিটি পাতাকে করেছে মূল্যবান। পাশাপাশি ৩২টি ছবির আর্টপ্লেটও চিরকাল বোধকরি কাছে রাখার মত। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে স্কেচ ছবি ছাপার বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি শ্রীমতি প্রণতি দে, অঞ্জন রায় ও দেবব্রত রায়ের কাছ থেকে। প্রচ্ছদের ছবিটি আমার নিজের সংগ্রহ থেকে প্রকাশক ব্যবহার করায় আনন্দবোধ করছি।

একাল ও সেকালের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক যশস্বী শিল্পী সংবাদিক, বিদগ্ধ ঐতিহাসিক সমালোচক তাঁদের মননশীল সুচিন্তিত লেখা দিয়ে এই বইকে সমৃদ্ধতর করে আমাকে ঋণী করেছেন। কয়েকটি লেখার ভাষান্তরে যেসব অনুবাদকেরা সাহায্য করেছেন। তাঁদের এবং ধর্মদাস রায় ও নিখিলচন্দ্র সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে কর্তব্য প্রকাশে ত্রুটী থেকে যেত।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক শ্রীমতী সন্ধ্যা সাহা ও বীজেশ সাহাকে। বীজেশ সাহার অফুরন্ত উৎসাহে উদ্যোগে বিদগ্ধ জনদের লেখায় এই গ্রন্থ পাঠকদের হাতে যাবার অবকাশ পেল। এই বই শিল্পরসপিপাসু পাঠকের সামান্য তৃষ্ণা মেটালে আমার সব শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ প্রশান্ত দাঁ

প্রকাশকের নিবেদন :

শিল্পীর জন্মশতবর্ষে আমাদের প্রকাশনার শ্রদ্ধার্ঘ্য এই মূল্যবান গ্রন্থ রূপতাপস যামিনী রায়। এই মূল্যবান বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত, আমাদের প্রকাশনা সম্মানিত। এই বই প্রকাশ করার পেছনে যার পরিশ্রম অফুরন্ত তাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা, তবুও সম্পাদক প্রশান্ত দাঁকে আমার নমস্কার। বইটি প্রত্যেক পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয় হওয়ার অন্যতম কারণ অজস্র স্কেচ ও ছবি, যারা ছাপার অনুমতি দিয়ে সাহায্য করেছেন, শ্রীদেবব্রত রায় ও অঞ্জন রায় তাদের জানাই ধন্যবাদ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিল্পী সুব্রত চৌধুরী প্রচ্ছদ ও নামাঙ্কন করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করেছেন। আর প্রত্যেক লেখককে জানাই আমাদের নমস্কার। আরো অনেকে অনেক ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি রইল আমাদের অভিনন্দন।

১।১।১৯৮৮

নমস্কার সহ—
সন্ধ্যা সাহা।

চিত্র পরিচিতি

পৃষ্ঠা পরিচয়

যামিনী রায়

"Jamini Roy"

বিষ্ণু দে

চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা

(শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের জন্মদিনে)

ঘৃণার গঙ্গায় নিত্য স্নান করা, অবজ্ঞায় ভাসা।
চতুর্দিকে মতিচ্ছন্ন গৃধ্নুদের ধূর্ত হাঁকডাকে
স্বার্থান্ধের ক্ষমতায় অক্ষমের নিত্য যাওয়া-আসা !
আকণ্ঠ ঘৃণার ঢেউ-য় তাই ডোবা আবিশ্ব বিপাকে ।

অথচ প্রেমেই বৃষ্টি বান ঝর্ণা স্রোতগা ঊর্মিলা,
হৃদয়ের পদ্মরাগে পার্বতীর কণ্ঠে দোলে নীলা ।

যন্ত্রণা অশেষ, আজ প্রেমী খোঁজে প্রেমের আস্তানা,
আশেপাশে জঘন্যের নগণ্যের মরিয়া উচ্চাশা,
সমস্ত কর্মের ক্ষেত্রে তুচ্ছতার অসহ্য পিপাসা,
ঘরে ঘরে জল চায়, অথচ ঘরেই সব নোনা ।

প্রেম মানে প্রকৃতই প্রাণ-দেওয়া প্রাণ-নেওয়া মনেপ্রাণে মানা,
বিলিয়ে মিলিয়ে বুকে ঠাঁই দিয়ে প্রেমের মানেটা যায় জানা।
প্রেমেই ফসল ফলে ফুল ফোটে পেকে ওঠে ফল,
অথচ সকলই আজ পুড়ে-হেজে মরে অবিরল।

ঘৃণার এ অগ্নিযজ্ঞে প্রেমের জটায় বান আনা!
পাড় ভাঙা-গড়া! এ যে ঘৃণাতেই প্রেমের ঠিকানা॥

দুই

যেহেতু আনন্দরূপ তুমি আমিও বুঝিবা
দেখেছি হয় তো কোনোদিন
প্রাণ-কম্প্র অন্ধকারে নক্ষত্র বিশ্বাসে সেই বিভা
নীল নম্র রূপের বিভাস
দেখেছি হয়তো কোনো রুশতীউষায়
উন্মোচিত বাহু-বক্ষ-গ্রীবা
পৃথিবীর সাবিত্রীভূষায় ঘুমভাঙা ভৈরবী দীপ্তিতে
আনন্দরূপের বিভা

অমৃত মুহূর্তে ক্ষিপ্র চির প্রতিভাস
হয়তো বা আমিও দেখেছি
আদিগন্ত বিরাট ছটায়
অনেক শতাব্দী ধ'রে মহীদাস আমরাও সন্ধ্যায় দেখেছি
সিন্ধুতে গঙ্গায় দীপ্র
হাহাকারে সারা দেশে চৈতন্যে স্মৃতিতে আশায় এঁকেছি
বহুকাল বহু আর্য অনার্যের বহু মানুষের

সেহেতু যন্ত্রণা আজ তীব্রতম
দেহের আরামে প্রাণের তৃপ্তিতে মনের আনন্দে।
দুর্মর স্মৃতির সপ্তাশ্বের ক্ষুরে ক্ষুরে
দুর্জয় আশার হাওয়ায় ধুলায়
নিদ্রাহীন একচ্ছত্র স্বপ্নের তুষের উজ্জ্বল ঘটায়
শান্তি নেই দিনরাত্রি শান্তি নেই গ্রামে গ্রামে

শহরে শহরে হাহাকারে দেশে দেশান্তরে
অন্নের অভাবে বাসাবাড়ি বস্ত্রের অভাবে হাহাকারে
নির্বুদ্ধির দুর্বুদ্ধির স্বনামে বেনামে
অক্ষমের অসতের অনাচারে অত্যাচারে
বিশৃঙ্খলা শত-ভেদাভেদে জীর্ণ চৈতন্যের কুয়াশায়
মৃত্যুভয়ে

আনন্দরূপমমৃত তবুও মরে না
শত কঙ্কালের বিস্তীর্ণ কাঁকরে
সে অমর কুরুক্ষেত্রে
ইন্দ্রপ্রস্থে পাশা চেলে বেচাকেনা খেলে
ম্যানেজারী দাঁও মেরে প্রতিদিন
কদম্বকাননে শত শমীদাহ সেরে
কিছুতে সে শেষ নয় হৃদয়বত্তায়
স্মৃতির প্রতাপ আর আশার স্পন্দন শত হাহাকারে
ঈদের রোজায় আর চড়কের ব্রতে আর উপোসী ঈস্টারে

যেহেতু আনন্দরূপে প্রত্যহের বিভা সবাই দেখেছি
যেহেতু এঁকেছি ধ্যাননেত্রে দৈনিক সত্তায় ॥

তিন

যে কথা কানে পশে অহর্নিশি,
যে কথা পড়ি সকালে নিজ চোখে
যে অসত্যে রোজের কাজে মিশি,
ডোবাই মন ড্রেন-পাইপ পাঁকে,
কাটাই দিন সঞ্চয়ের রোখে,
সেখানে কোথা বাঁচবে ঝাঁকেঝাঁকে
মানসজীবী অসিত-শ্বেত মরাল ?

শত বলুক পাঁকেই পলিমাটি,
বলুক পচা নালার কাদা খাঁটি,
পাঁচসালায় লুটুক পরিপাটি,
স্বাধীনভাবে হাঁটুক দশদিশি,

প্রকাশ করে লোভের ফাঁকেফাঁকে,
অক্ষমতা ; কারণ কালদ্রোহী,
তাই এদের অন্ধতাও ভয়াল।

কারণ কাল নেই রে বাদশাহী,
দাস-মহিমা মানে না আর মহী,
কারণ যুগসত্যে দীন দয়াল
মহেশ্বর কঠিন আজ করাল,
লগ্নি আজ ইতিহাসের দাহে
দগ্ধ করে নগ্ন দিবানিশি ॥

চার

গ্রাম কি শহর বলো সব তেপান্তর,
সময়ে মেলে না বৃষ্টি
মাটিতে বা মনে,
যদিই বা নামে জল নামে তা অকালে।
কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা আশ্বিন অঘ্রান
সব অবান্তর সব রসিকতা বেসুরে বেতালে।
অনাসৃষ্টি গ্রামে বা শহরে বহুর জীবনে,
কোথা পরিত্রাণ ?
এতকাল দেশে দেশে জেনেছে মানুষ,
জীবন, তা হোক না সে একের বা অনেকের,
প্রেমের বর্ষায় রৌদ্রে স্ফটিক আকাশে
জীবন স্বধর্ম পায়, মাটি পায় মনে,
হৃদয়েরা স্বর পায়, পায় পেলব পুরুষ,
তা সে বাংলাই হোক আফ্রিকা বা চীন কিংবা রুশ ;
ভ্রুকুটিতে আদরে আশ্বাসে
একের অন্যের আবেগের মননের হাজার ধরনে
জীবনে জীবন দিয়ে মৃত্যু দিয়ে হাসে কেঁদে হাসে।
আজ কেন হাসি পাঁক, রৌদ্র আজ কেন অশ্রুজলে,
আজ মরুভূমি সাজে সাগরে সাগরে
অথচ সমুদ্র মনে আজ ঘরে ঘরে।
জীবনে কি কিছু নেই প্রেমের কাঁড়তে কিংবা ঘৃণার কোমলে ?
অবিশ্বাস্য ছলে আমরা কি সবাই হাঘরে ?

পাঁচ

চতুর্দিকে নির্বোধের ভিড়,
কেউ ভালো, কেউ মন্দ, এরা সকলেই
স্বার্থে বা পরার্থে ঢাকে বর্ষার নিবিড়
সজল বাহার, ঢাকে দু'চোখের নীড়
কথার কালিতে নানা নির্বোধ কৌশলে।

পৃথিবী ঢেকেছে এরা জীবনের মাটি
করেছে শ্মশান পোড়া, পোড়ো ;
কেউ মন্দ, কেউ ভালো, অর্থাৎ কারো বা মন খাঁটি,
সকলে চালাতে চায় কল্কির ঘোড়াই,
অথচ অভ্যস্ত স্বস্তি চায় পরিপাটি।

চতুর্দিকে, মাটিতে আকাশে
এরাই করেছে ভিড়, শালিক ও কাক
কিছু বা শকুন, আর বিচালিতে ঘাসে
বাছুর, শিবের ষাঁড়, আর হাঁকডাক
করে বটে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর আশ্বাসে।

চোখ ঢাকো কান চাপো, বুকচাপা দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
নৈঃসঙ্গ্য রোপণ করো, প্রতিরোধ অশ্বত্থের ধ্যানে ;
অবজ্ঞায় ঘৃণায় নেতিতে, একান্ত সজ্ঞানে
প্রেম-কে লালন করো স্বপ্নশুচি নীড়ে,
অন্য অরণ্যের ভিড়ে, আপন সম্মানে,
গাছপালা পশুপাখি শিশুর কল্যাণে,
মানুষের, যত মেয়ে-পুরুষের গানে ॥

ক'দিন গরম বেশ, কলকাতায় পশ্চিমা রোদ্দুর,
তারপরে বৃষ্টি এল, কালবৈশাখীর বৃষ্টি, ঝড়, শিলা, জল।
ঠাণ্ডায় সন্ধ্যায় ভাবি এই ক'টা দিন ঃ
সমুদ্রের বাংলায় সাবেক হাওয়ায়
সারা দুনিয়ায় কেন—বাংলায় এলোমেলা অকালে আগুন ঝরে
পশ্চিমা রোদ্দুরে ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার ঘৃণার আগুনে
কালো কালো চোখ ভরে রক্ত ঝরে
ছায়ায় ছায়ায় শুধু হত্যার রোদ্দুর!
অথচ ঈস্টার এল!
অথচ পাইলেট! এখনও ঈস্টার আসে পশ্চিমের কারো কারো হৃদয়বত্তায়,
চৈতালী অশ্রুতে বাজে মানবিক উজ্জীবিত সুর
সে কোন মাতার
করুণ বাহুতে এল নূতন মানুষ,
আবিশ্ব নয়নে এল মমতার অশ্রুর প্রণতি।
আজও তবু হেরডেরা সালোমের পসরা যোগায়
এশিয়ায় আফ্রিকায় স্বদেশেও লাভের ক্ষতির
দীর্ঘ ইতিহাসে, শিশুর হত্যায়।
অথচ গির্জায় চলে গম্ভীর আরতি,
সভ্যতা সঙ্গীতে তীব্র রূপ ধরে, ভেসে আসে দক্ষিণে হাওয়ায়।

তবু হেরডেরা অন্ধ গৃধ্নুর সত্তায়
সালোমের ভোগের পসরা দেশে দেশে মরিয়া যোগায়।
যেন বা পাইলেট আজও ন্যায়-দণ্ডধর, এ হাতে ও হাতে
চেলে বণিক বন্ধুর।
যেন বা পশ্চিমা মরু একমাত্র সত্য যেন অক্ষয় অমর
ছায়াহীন বৃক্ষহীন শস্যহীন অকাল রোদ্দুর।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে, শিলাবৃষ্টি, জল পড়ে
স্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় শরীরে নামে অখণ্ড সংবিৎ।
এদিকে গির্জায় একটি মাতার পরম মায়ায় বাজে
ইওহান সেবাস্তিয়ানের, হত্যা নয়, সৃষ্টিময় মহীয়ান সুর
দুর্গতের কলকাতায়, উদ্বাস্তুর বাংলায় এশিয়ায় আফ্রিকায়
বাখের আপন দেশে একটি সঙ্গীত।
ক'দিন সন্ধ্যায় বইছে সমুদ্রের হাওয়া শিলাবৃষ্টি ঝড়ে।
মাথা হেঁট ক'রে নাকি শোনে হেরডেরা
শুনি নাকি পালায় পাইলেট॥

সাত

তারপরে অন্ধকার শান্তি আর উন্মোচিত নিস্তব্ধতা।
ঘুমের সমুদ্রে কিংবা ঘুমের আকাশে মুক্তি প্রতিদিন।
ঘুম ভাঙে প্রতিদিন রুশদ্বৎসা রুশতী ঊষায়,
মনে হয় প্রাণ সত্য, এ নশ্বর জীবন অমৃত।
বিশ্রাম সচ্ছল পরিপূর্ণ, মানবিক, চৈতন্যে বিস্তৃত।
মনে হয় কাজের সন্ধান আর কর্মস্থানে কাজ,
আর সকাল বিকাল যাওয়া-আসা
সব কিছু, মনে হয়, ঘুম থেকে জাগা যেন রাত্রি আর দিন দ্বন্দ্বহীন,
উভয়ে সমান বন্ধু, উভয়েরই এক ভাষা, শুধু বিভিন্ন ভূষায়।
এ দেয় নন্দিত ঘুম আর অন্যে কর্মের প্রবল
ছন্দময় সার্থকতা, যেন এক পতিব্রতা প্রেমে ধৈর্যে
দৈনন্দিনে অন্নপূর্ণা আর রাত্রিতে প্রেয়সী, দুই একাধারে ধৃত.
যেন দ্যাবা-পৃথিবীকে বেঁধে রাখে সূর্যচন্দ্রে আর্ণবিক পৃথিবীকে
একটি মিলনে সাহচর্যে,
কিবা দিন কিবা রাত্রি, স্বদেশ-বিদেশ।

তারপরে ?   তারপরে কর্মস্থলে ক্লান্ত যাত্রী।
কর্ম শুধু ক্লান্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন,
শত অর্থ খোঁজার পরেও অনর্থক।
তারপরে ক্লান্ত ফেরা।
গ্রামে কিংবা গ্রাম্য জীর্ণ অতিকায় শহরেই হোক।
কোথায় সে রাত্রি যার হাসির পূর্ণতা
ঢেকে দেয় স্থূল অন্ধকার
ভাস্বতীর নিজ অন্তরের দীপ্র অন্ধকারে,
যে শান্তিতে গ্রাম্যবাসী অবিক্ষত
নি পদ্বন্তঃ নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনসশ্চিদর্থিনঃ—?
তাই রাত্রি যন্ত্রণাই, অবসর অস্থিরতা, ক্লান্তিকর,
রাত্রি আর দিন যেন সতীনেরা
সদাই উদ্যত, ভবিষ্যত দুঃস্বপ্নে শূন্যতা,
স্মৃতি শুধু শোক।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে
ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শূন্যতাব সেই একই রোখ।
চাই অন্ধকার, অন্ধকার শেষ করি যেন প্রতিদিন দীর্ঘায়ুতে
উষসীউষায় সবিতার খড়্গে খড়্গে,
সে সবিতা পশ্চাৎ ও যে সবিতা পুরস্তাৎ
উত্তরের অধরের সর্বত সবিতা,
সার্থকের বরেণ্য উষায় রুশদ্বৎসা রুশতীর ভর্গে
জগৎহিতায় ঋণশোধ স্নায়ুতে অপার প্রাত্যহিক আত্মস্তুতা
আবিশ্ব প্রসাদ॥

সমসাময়িক রূপকারদের

চোখে যামিনী রায়
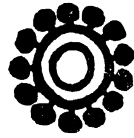
অতুল বসু

যামিনী রায় ॥

এক

আজ তাঁর চুরাশি বৎসর বয়সেও শিল্পী যামিনী রায়ের যে শিল্পকীর্তি সম্ভার তাঁর জীবিতকালেই দেদীপ্যমান হয়ে আছে, তারই মাধ্যমে ভবিষ্যতেও তিনি কালজয়ী হয়ে থাকবেন সন্দেহ নাই। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।'

বাংলাদেশের ভাবলোকে একটা প্রাণবস্তুর রহস্য,—বৈষ্ণব কবিতায়, কীর্তন ও বাউল গানে নিহিত আছে। তারই সন্ধান পাই যামিনী রায়ের চিত্রাবলীর রঙ ও রেখার আলোড়নে। এই প্রাণবস্তুরই সাক্ষ্য স্বরূপ তাঁর ছবি সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গীতে গৃহে গৃহে শোভাবর্দ্ধন করে আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু আজ আমার বলবার বিষয় তাঁর ছবির আলোচনা নয়। অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর আমি নিকট-সান্নিধ্যে তাঁর শিল্প-জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছি বলে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় ঘটে। সেই জীবনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গেছে—সে সম্বন্ধেই কিছু বলতে চাই।

সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পীদের বৃত্তিই স্বতন্ত্র বলে জনসাধারণের মধ্যে তাদের পরিচয় অপরিহার্য রূপে অল্পবিস্তর পাবলিসিটির মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তবে ইংরাজ কোনও শিল্পরসিক যদি আমাদের শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে কিছু বলে থাকেন, তাহলে, আমাদের পক্ষে তা বেদবাক্য তুল্য গণ্য হয়। —Furgusson, Havell, Beverley, Nichols, যিনিই যা বলুন না কেন, ফলে কিছু জনশ্রুতি ক্রমে কালজয়ী হয়ে এমন বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয় যে তার ত্রুটির প্রতিবাদ বা ভাঙার প্রয়াস 'সিন্ধরসে ব্যাঘাত' করার মতনই দোষ হয়ে পড়ে। যামিনী রায়

সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি রহস্যময় রটনা চলিত আছে যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নিষ্ফল হলেও কিছু প্রতিবাদ করতে হল।

প্রথমত একটা বিশেষ মহলের এই ধারণা যে, যামিনী রায় তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে প্রথম শিল্প-জীবনে কোনও উৎসাহ, সমাদর বা যথাযোগ্য পারিশ্রমিক পান নি। দ্বিতীয় রটনা এই যে Western academic art-এর অসারতা বুঝে উনি Art school ও Portrait painting ত্যাগ করেছিলেন। তৃতীয়ত, বিদেশী শিল্পরসিক ও পৃষ্ঠপোষকেরা তাঁকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছিলেন।

এই সমস্তেরই প্রতিবাদে আমি কতকগুলি তথ্য উপস্থাপিত করছি। তাঁর ছাত্রজীবন থেকে আরম্ভ করি ঃ—১৯০৬ সালে যখন তাঁর বয়স ১৮/১৯, তাঁর 'সমাজ' নামে একখানি ছবি দেখে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁকে একটি গিনি উপহার দেন। তখনকার দিনে এ ধরণের উৎসাহ কোনও আর্ট স্কুলের ছাত্রের ভাগ্যে জোটে নি। তারপর তিনি আর্ট স্কুলে থাকাকালীন, ১৯১৫ পর্যন্ত—দশ বছরের অধিককাল নিজগুণে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন যে তখনকার অধ্যক্ষ Mr. Percy Brown তাঁর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কোনও পরীক্ষা না নিয়েই যে-কোনও ক্লাশে তাঁকে কাজ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং পাঠরত অবস্থাতেই তাঁর কিছু ছবি বাঁধিয়ে ক্লাশে টাঙ্গিয়ে রাখবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। বহু দুর্নামযুক্ত আর্ট স্কুলে এই সুনাম কেউই করতে পারেনি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ইনি নিয়মিত ক্লাশে যেতেন না—অবাধ অধিকারের বলেই ইচ্ছামত ক্লাশ করতেন। যদি আর্ট স্কুলের Academic Training-এর অসারতা সম্বন্ধে ইনি এতটাই নিঃসন্দেহ থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ইনি প্রচলিত পাঠ্যকালের দ্বিগুণ সময় নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতেন না। Portrait painting ও উপার্জনের উপায় স্বরূপ বহু বৎসরই ক্রমান্বয়ে করে গিয়েছেন, এমন কি পরে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে সুফল হওয়া সত্ত্বেও। কোনও portrait Commission গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন বলে জানা নেই। তবে এ কথা খুবই ঠিক যে আমাদের দেশে প্রচলিত Photo থেকে Enlarge করে Portrait করা, আরও পাঁচজন শিল্পীর মতই ইনিও বাধ্যতামূলক উপার্জনপন্থা মনে করতেন এবং যথার্থ শিল্পীমনের অধিকারী ছিলেন বলে এ কাজ নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষে ভাগ্যবিড়ম্বনাই ছিল; বিশেষ করে Sitting নিয়ে Portrait করার দক্ষতা তাঁর ছিল বলে। পরবর্তী কালে তাঁর নিজের ও তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর ভাগ্যক্রমে যামিনী রায়ের নিজস্ব রীতিতে ছবি আঁকার খ্যাতি ও চাহিদায় Photo enlarge করে Portrait করার দুর্ভাগ্য হতে ইনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

তারপর আর্ট স্কুল ছাড়বার দুই তিন বৎসর পরেই ১৯১৮/১৯ সালে তাঁর কর্মজীবনে অন্য একটি অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। তখন স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ

মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে ২৪ নং বিডন ষ্ট্রীটে তাঁরই স্টুডিওতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটি শিল্পীচক্রের অধিবেশন বসত এবং তাঁরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় Indian Academy of Art নামে একটি ত্রৈমাসিক সচিত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সেই সান্ধ্য আসরে সমবেত সকল শিল্পীদের চাইতেই যামিনী রায় বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন—প্রায় দশবছরের মতন—তাঁর বয়স তখন ৩০।৩২ হবে। কিন্তু শুধু বয়স্কের অভিজ্ঞতাই নয়, নিজ প্রতিভাবলে এখানেও খুব অল্প দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এখানে সর্বজন স্বীকৃত একটি সামাজিক ও ব্যবহারিক তথ্য ও সত্যের উল্লেখ করছি। সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রশিল্পীরা যখনই মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু একটা গড়ে তোলবার কাজে দল সংগঠন করেন, তখনই দেখা যায় মতবিরোধ, ব্যক্তিগত রেষারেষিতে কলুষিত হয়ে সেই দলে ভাঙ্গন ঘটায়। বাংলাদেশে এর উদাহরণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্যতিক্রম হলে বলা চলে এবং শ্রীমজুমদারের সান্ধ্য আসরে তাই ঘটেছিল। প্রধান উদ্যোক্তা হেমেন্দ্রনাথ ও প্রকৃষ্ট বক্তা স্বর্গত সতীশ সিংহ মহাশয় দুজনের সঙ্গেই যামিনী রায়ের প্রবল মতবিরোধ ও আনুষঙ্গিক বাকবিতণ্ডা হত। কিন্তু এর জন্য দল ভাঙেনি—যামিনী রায়ের বিরোধী কোনও উপদলও হয়নি। পরন্তু সেই আসরে তাঁর ছবি সকলকে হতবাক করে এতই রসস্নিগ্ধ করত যে সেখানেই হেমেন্দ্রনাথ তাঁকে 'যামিনী দা' বলে অভিহিত করেন, যে নাম সর্বজনগ্রাহ্য চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে উপরোক্ত পত্রিকায় যামিনী রায়ের যে সকল ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তারই মধ্যে তাঁর ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতির জীবন্ত স্বাক্ষর রয়ে গেছে। একথাও তর্কের অতীত যে কোনও শিল্পীকেই বাংলাদেশে তার নিজের সম্প্রদায় এতটা সম্মান করেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী পক্ষ এখনও অতন্দ্র সজাগ আছেন।

তারপর পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্ন এসে পড়ে। স্বতঃসিদ্ধভাবেই যদি মেনে নেওয়া যায় যে অন্য কোনও সঙ্গতি না থাকলে চিত্রশিল্পীর কখনই আর্থিক স্বচ্ছলতা হয় না, তাহলে যামিনী রায়ের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তবু ইনি শুধু ছবি এঁকেই যা উপার্জন করতেন, পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও, অন্য কোনও শিল্পীর ভাগ্যেই তা ঘটেনি—একমাত্র তদানীন্তন কালের Indian Society of Oriential Art-এর অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ছাড়া। তাঁর উপার্জন, প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ, ছবি বিক্রয় ও Portrait Painting-এ সীমাবদ্ধ ছিল। আমি নিজে আর্ট একজিবিশনের পরিচালনায় ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রায় কুড়ি বৎসর কাল একান্তভাবে যুক্ত ছিলাম বলে ভাল করেই জানি যে শুধু ছবি বিক্রয় করে কোন চিত্রশিল্পী পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হতেন না। শিল্পী যামিনী গাঙ্গুলী ও হেমেন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। গাঙ্গুলী মহাশয় ধনীর সন্তান

ছিলেন—রাজা মহারাজাদের কাছে যাওয়ার পথ তাঁর স্বতঃই সুগম ছিল। তবে হেমেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর চিত্রের বিশিষ্টতার গুণে ধনীর দরবারে অবধারিত স্থান করে নিয়েছিলেন। ছবির এরকম বাজারে যামিনী রায়ের গুণমুগ্ধ দেশবাসী স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ বশতঃ তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা অনন্যপূর্ব। স্বর্ণ বিনিময়ে কবেই বা চিত্রশিল্পের মূল্যায়ণ হয়েছে।

কালক্রমে তাঁর বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ, Academy of Fine Arts-এ Viceroy's Gold Medal পাবার প্রায় সংগে সংগেই তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রসার লাভ করল। অর্থাগমের পথও অনেকটা সুগম হল এবং বাগবাজারে নিজ বাড়ীতেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হল। এখানে Dr. Stelakramrisch এর নাম উল্লেখযোগ্য—তিনিই প্রথম শিল্পশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত—যিনি ১৯৩০ সালের পূর্ব হতেই যামিনী রায়ের একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। ফলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত তাঁর গুণগ্রাহী ও স্তাবকের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে উঠল। দেশী বিদেশী অনেক সাহিত্যিক ও শিল্পরসিকই তাঁর উচ্ছ্বসিত গুণগান করতে আরম্ভ করেন—বিরূপ সমালোচনা কদাচিত হয়েছে। আশাকরি যে তথ্যগুলি আমি পরপর উল্লেখ করলাম, তাতে একথা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাবে যে যামিনী রায় তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল দেশবাসী ও বিশেষ করে শিল্পী বন্ধুদের নিকট অকুণ্ঠ মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। এখানে Principal Percy Brown এর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা দরকার। তাঁর উৎসাহ ও গুণগ্রাহীতা যামিনী রায়ের প্রথম জীবনের প্রধান মূলধন ছিল। কিন্তু খুবই পরিতাপের কথা যে তাঁর জীবনীকারেরা কেউই Brown সাহেবের উল্লেখমাত্র করেননি, পরন্তু স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট কটাক্ষপাত করেছেন। খাঁটি ইংরাজের মতন Principal Brown কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি।

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পালা—ফলে যামিনী রায়ের জীবনে একটা বিস্ময়কর পটপরিবর্তন হল। পাবলিসিটির মহিমায় গুণী যামিনী রায় শিল্পীকুল মধ্যে ধনীর পর্যায়ে উন্নীত হলেন এবং নিজব্যয়ে প্রদর্শনী প্রকোষ্ঠ সমেত অট্টালিকা নির্মাণ করতে সক্ষম হলেন। এই পাবলিসিটির কাজে পুরধা হলেন 'Verdict on India' বই এর লেখক Mr. Beverley Nichols—এই বইটির বিক্রয় লাখে নয় কোটি সংখ্যায় হয়েছে। এই বইএ নিকলস্ সাহেব দুটি মাত্র মহাপুরুষের নাম করেছেন, যামিনী রায় ও মহম্মদ আলী জিন্না। জিন্নাকে giant ও গান্ধীকে pigmy আখ্যা দিয়েছেন। এই বইএর দু' চারটি ছত্র 'সিসেম দ্বার খোলো' যাদুমন্ত্রে সত্য সত্যই ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিল। তারপর হতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, রাজদূত, সেনানায়ক সবাই যামিনী রায়ের ছবির জন্য তাঁর

বাড়ীতে অবিরত আনাগোনা করতে লাগল। রুশ ও মার্কিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দকে যামিনী রায় একই সখ্যসূত্রে বেঁধে দিলেন। শত শত লোকের চাহিদা তখন যামিনী রায়ের মৌলিক ছবির জন্য। এই নাটকীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ছবির চাহিদা মেটাতে শ্রমক্লান্ত যামিনী রায় ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে পড়লেন—শিল্পীমনও সংকুচিত হয়ে এল, তখন বয়সও সত্তর বৎসর পার হয়ে গেছে—জরা ও বার্ধক্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। এই দুঃসময়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্র অমিয় রায় ও তাঁর বন্ধু (পটল ও মণ্টু) খুবই আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর ছবির চাহিদা যথাসম্ভব মেটাতে সক্ষম হল।

শিল্পী যামিনী রায় তাঁর দীর্ঘ জীবনের একনিষ্ঠ সাধনায় চিত্রশিল্পের জগতে বাংলার একান্ত নিজস্ব প্রাণবস্তুর একটি লুপ্ত রূপরহস্যের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েও হতভাগ্য বাংলাদেশকে চিরকৃতজ্ঞ করে রেখেছেন।

দুই

কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে শ্রেনীকক্ষের দেয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা কিছু প্রাণবন্ত স্কেচ্ আমাকে মানুষটির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সেখানে আমার সাক্ষাত ঘটে নি কেননা আমি সে স্কুলে যোগ দেবার অব্যবহিত আগেই তিনি তা ছেড়ে যান (১৯১৬)। স্বভাবতই কৌতূহলী খোঁজ নিয়ে জানলাম ছাত্র হিসেবে যামিনী রায় ছিলেন চালাক ও ক্লাসের কাজ সম্পর্কে সচেতন যদিও ক্লাসে হাজির হবার ব্যাপারে খেয়ালি। যাই হোক, তাঁর ব্যতিক্রমী গুণের স্বীকৃতিতে পার্সি ব্রাউন (প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন অধ্যক্ষ) তাঁকে যেকোনো সময়ে যেকোনো ক্লাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকে কোনো পরীক্ষায় না বসলেও চলত। বস্তুত তাঁর ছাত্রজীবন এক দশককেও অতিক্রম করেছিল (১৯০৩-১৯১৬), তিনি রেখে গিয়েছিলেন কিছু অসাধারণ স্কেচ এবং একটি ভবঘুরে যুবকের স্মৃতি কেননা তিনি প্রায়ই বাসা বদলাতেন, তাঁর চলাফেরা কেউ জানতেও পারত না। কিছুকাল পর প্রকৃতই বিস্মিত হলাম যখন একজন ছবি বাঁধাইওয়ালা জানাল বাঁধাই করতে দেওয়া আমার আঁকা একটি প্রতিকৃতি দেখে যামিনী রায় আমার খোঁজ করছেন।

অচিরেই আমাদের পরিচয় হল ২৪নং বিডন স্ট্রীটে, যেখানে প্রায়ই হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (আমার জানা শিল্পীদের মধ্যে সবচাইতে উৎসাহী) একটি স্টুডিও নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তখন 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব আর্ট" (১৯১৯-২১) নামে একটি শিল্পপত্রিকা প্রকাশের উপক্রম করছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি শিল্প আন্দোলনের কথা প্রচার করা যা খোলা থাকবে সকল শিল্পীগোষ্ঠীর কাছে। ও. সি. গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'রূপম' নামের

অন্য পত্রিকাটি স্পষ্টতই ছিল এর থেকে পৃথক কেননা তা নিয়োজিত ছিল শুধুমাত্র প্রাচ্য শিল্পে।

নববিবাহিত মজুমদার প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে গোটাকত অকালপক্ক আমিসহ জনাকুড়ি তরুণকে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন খ্যাতনামা সত্যজিৎ রায়ের বাবা প্রয়াত সুকুমার রায়কে (ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স) প্ররোচিত করার ব্যাপারে যাতে পত্রিকাটি প্রকাশ করা যায় স্বল্প ব্যয়ে। মজুমদারের স্টুডিওটি অচিরেই পরিণত হল শিল্প রাজনীতির একটি আখড়ায়— পত্রিকার প্রকাশ অবশ্য হয়েছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী কেননা আমাদের পেছনে কোনো ব্যবসায়ী মনোভাবী ব্যক্তির আর্থিক পোষকতা ছিল না। সে আমলের শিল্প আন্দোলনের দুটি বিরোধী শিবিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে বর্ণনা করছি যার মধ্য দিয়ে যামিনী রায় একটি সাদামাটা চারাগাছ থেকে শক্তিমান বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছিলেন এবং বিশ্বের বাজারে একজন অন্বেষিত চিত্রকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মজুমদারের স্টুডিওতে ফিরে আসি, সবচাইতে তপ্ত আলোচনা সেখানে যা চলত তাদের মধ্যে দুটি প্রাণবন্ত প্রশ্নই কেন্দ্রে থাকত : (১) প্রতীচ্য শিল্পের চর্চা ও অনুসরণ অদেশপ্রেমী অভীপ্সা বলে গণ্য হবে কিনা এবং তা ভারতীয়দের কিছুমাত্র উপকার করবে কিনা, (২) ভারত শিল্পের পুনরুজ্জীবনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে ভারতীয় যাদুঘরের শিল্প বিভাগ, অথবা ভারতীয় পুরাবৃত্ত থেকে আদর্শকে আত্মসাৎ। আমাদের উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয়ের মধ্যে থাকত ঐতিহ্যবাহী ও প্রগতিশীল শিল্পের ধারণা ও আঙ্গিক সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। যামিনী রায়, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ, দশ বছরের পেশাদারী অভিজ্ঞতার জোরে আমাদের সকলের তুলনায় অগ্রবর্তী, অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের জোরে খুব সহজেই অধিকার করতেন অধিনায়কের ভূমিকা। সে সময়ে প্রচণ্ড গুণমুগ্ধ ছিলেন তিনি অবনীন্দ্রনাথের— (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রধান স্থপতি)—যিনি প্রবলভাবে চাইতেন আমাদের যাবতীয় শিল্পপ্রচেষ্টায় ফুটে উঠুক ভারতীয়ত্বের অভিজ্ঞান।

কিন্তু যামিনী রায়কে মনে হত বেশ আশ্চর্যের তাঁর যুক্তিসহ এবং তাঁকে মুখোমুখি হতে হত মজুমদার ও প্রয়াত সতীশ সিংহের কড়া সমালোচনার, যাঁরা ছিলেন প্রতীচ্য শিল্পকলার সমর্থক। আমি ছিলাম সংগঠনটির অবৈতনিক সম্পাদক—আলোচনায় যোগ দিয়ে সম্ভবত বাড়িয়ে তুলতাম জটিলতাই। সেই সঙ্গে যাদুঘরের বিশেষ যুগের শিল্প থেকে প্রেরণা পাবার ধারণা অথবা খোদাই করে আঁকা মুঘল ঘরানার চিত্রশিল্পের মিনিয়েচারের মিষ্ট প্রভাবের ব্যাপারটাকে তিনি প্রত্যাখান করতেন। অন্যদিকে প্রতীচ্য শিল্পকলার বেশির ভাগ অনুকৃত আলোছায়া মেশানো ছবি এবং বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্য আঁকা জাঁকালো চিত্রগুলোকে তিনি ভাবতেন সন্দেহজনক শিল্পমূল্যের বলে—কেননা তাদের

ভারাক্রান্ত করা হত অনাবশ্যক চিত্রবিরোধী উপাদান দিয়ে। তাছাড়া, তার যুক্তি ছিল একটি ছবিকে যথার্থভাবে আঁকা চলে স্বল্পতম সঠিক ছোঁয়ায় মূল চেহারাটির বিশিষ্ট লক্ষণগুলিকে বার করে আনার মধ্য দিয়ে। এবং দরকার হলে একটি গাছের আভাস, একটি মন্দিরের প্রতিভাস, একটি বিবর্ণ সবুজ মাঠ অথবা মৃদু প্রকৃতির প্রশান্ত কালার ওয়াশ কোনো অঞ্চলের পটভূমি হিসেবে কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট। এখানে আমার উল্লেখ করা উচিত যে বিশের দশকে বস্তুত বিষয়চিত্র ছিল আমাদের শিল্পীদের একমাত্র অবলম্বন তা তাঁরা যে ঘরানারই অন্তর্ভুক্ত হোন না কেন।

মজুমদারের স্টুডিয়োতে সন্ধ্যাগুলি গড়িয়ে যেত চায়ের পেয়ালা নিয়ে (শ্রীমতী মজুমদারের বদান্যতায়), বিতর্ক শুধু বেড়েই চলত, কেউ কারুকে পারতেন না প্রভাবিত করতে অথবা পৌঁছানো যেত না কোনো পরিসমাপ্তিতে—আলোচনা স্থগিত থাকত পরবর্তী সন্ধ্যার জন্য। কেউ থাকতে পারতেন না সুখী—সেটা এজন্য নয় যে শিল্প বা শিল্পীদের সমস্যা পৌঁছোয়নি কোনো ঐক্যমতে, বরং সকল সভ্যকে মুখোমুখি হতে হত বাড়ির মহিলাদের যাঁরা প্রতীক্ষারত থাকেন গুটিকতক অপদার্থ 'পটুয়া'র জন্য, যাঁদের নেই জীবনযাপনের উপযোগী জাঁকালো উপাদান অথবা সম্মানিত নাগরিকের মতো স্থায়ী রোজগার।

যামিনী রায়ের সঙ্গে অবশ্য সর্বদাই থাকত বিস্ময়। পরের সন্ধ্যাতেই তিনি হয়ত নিয়ে এলেন কিছু পাকানো কাগজ, খুলে দেখালেন ভেতরের ছবিটি এবং আমাদের করে দিলেন স্তম্ভিত। গত বৈঠকে যা বলেছিলেন তা প্রমাণ করবার জন্য ছবিটি আঁকা হয়েছে এমন সংক্ষিপ্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে যে তার

প্রধান চেহারাটিকে দেখাচ্ছে আরো প্রাণবন্ত ও আত্মসমৃদ্ধ যা কোনো লাইফ স্টাডিতেও করা সম্ভব হত না। ছবিতে ছিল একটি পাহাড়ি মেয়ে নিজের চুলে ফুল পরে একটি পুকুরের স্থির জলের দিকে রয়েছে তাকিয়ে যেন সেটি আয়না। শুকনো মাটির পটভূমিতে সামঞ্জস্য স্থাপন করে তার নমনীয় যুবতী শরীর যেন ভেসে যাচ্ছে সুরেলা ভঙ্গিতে। পশ্চাদ্‌ভূমির স্তব্ধতা এবং সবকিছু যেন পরিপূর্ণ

হয়ে একটি সরল বাঁশের বাঁশি থেকে উৎসারিত কোনো গানের সুরের মতো। নিঃসন্দেহে আমাদের পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় তার সম্মানিত স্থানলাভ ঘটবে বলে স্থির হল এবং তিনি স্বীকৃত হলেন আমাদের মাননীয় বড় ভাই হিসেবে, মজুমদার তাঁকে ডাকলেন যামিনীদা বলে—এ নামটি তাঁর সঙ্গে সেঁটে রইল অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে। প্রশ্নই উঠল না তাঁর ছবির ভারতীয়ত্ব নিয়ে। তাছাড়াও তাঁর মধ্যে ছিল নির্দিষ্ট বাঙালিয়ানা। আগ্রহী যাঁরা দেখতে পাবেন সে পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ যামিনী রায়ের যাবতীয় সম্ভাবনা।

আমাদের প্রকোষ্ঠের দরজা খোলা রাখার পক্ষপাতী ছিলাম আমরা এবং সেজন্যই কোনো গুণসম্পন্ন শিল্পকর্মের প্রশংসায় দ্বিধা থাকত না আমাদের তা হোক না কেন সে ছবি প্রাচ্য বা প্রতীচ্য ঘরানায় আঁকা। অবশ্যই যামিনী রায় ছিলেন স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত, নিজেই তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রবলতম। এ ব্যাপারে আমার শুধু একটিই শোচনা যতই তিনি কালক্রমে প্রশংসিত হচ্ছিলেন একজন মহান চিত্রশিল্পী হিসেবে ততই 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট'য়ের (যে সংস্থা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল প্রাথমিক ভাবে) গণ্যমান্য সদস্য যেন উপভোগ করতে পারছিলেন না তাঁকে।

কিছুকাল পরে ১৯২১-য়ের কোনো এক সময়ে পত্রিকাটি যখন উঠে যাবার মুখোমুখি এবং যার দেনা মেটাতে আমরা প্রায় দেউলিয়া, আমাদের গোষ্ঠীর

শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের প্রাণনাকে প্রবাহিত করতে চাইলেন অন্য কোনো অভিমুখে শিল্পের কথা ভেবেই। ফলত স্থাপিত হল 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' একটি সর্বভারতীয় বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী উদ্‌যাপনের জন্য। শিল্পীশ্রেষ্ঠ যামিনী রায় ও বিশিষ্ট চিত্রকর প্রয়াত ভবানীচরণ লাহা হলেন যথাক্রমে অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং আমি ও প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ শীল হলাম অবৈতনিক যুগ্ম-সহসম্পাদক। অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের খাঁটি সহৃদয়তার ফলে পাওয়া গেল 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট'-য়ের বাড়িটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সব ঘরানার দিকে দরজা খোলা রেখে অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় প্রথম সর্বভারতীয় প্রদর্শনী (১৯২১)।

পুরুষোচিত সৃষ্টিশীল শিল্পী হিসেবে তিনি চেষ্টা করছিলেন একাধিক-দিক দিয়ে আপন বহিঃপ্রকাশের জন্য এবং আমি মনে করি তাঁর সকল অন্বেষার মধ্যেও তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন নিজেকে পরিচিত আঙ্গিক-ভাঙা তাঁর অসাধারণ ব্রাশ-ড্রয়িংয়ে যাতে থাকত সুসমঞ্জস শিল্প-আঙ্গিক। এসকল স্টাডিতে তিনি নিষ্কাশিত করতে পারতেন তন্ময় গুণাবলীকে এমন উৎকর্ষের পর্যায়ে যে তাদের মন্ময় উপাদান প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করত পার্থিবতাকে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করছি জয়দেব ও আরো কিছু বাঙালি কবির কথা যারা স্ত্রী-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে ঘোর অনুরাগে বাস করতেন গুরুনিতম্বিনী পীনস্তনী বিলাসীনি মহিলাদের মধ্যে যাদের ওষ্ঠ ছিল প্রস্ফুটিত পুষ্পদলের মতো, বিস্ফোরিত নয়ন ও ভ্রূ যাদের মদনের ধনুর্বান ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক, যামিনী রায় এধরনের যুবতী রমনীদের শত শত ছবি এঁকেছেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা ধাবিত দৃঢ় রেখায়, কিন্তু কীভাবেই না পরিবর্তিত হয়েছে তারা। অবয়বের রেখা নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অপ্রতিরোধ্য অতিন্দ্রিয় ভঙ্গিতে যার বস্তুগত দিকটা গিয়ে ঠেকেছে প্রায় শূন্যে এবং তার ফলে দর্শককে উন্নীত করে এমন এক বিচিত্র উপভোগের রাজ্যে যেখানে রয়েছে ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে স্থাপন করতে পারি রবীন্দ্রনাথেরও ঊর্দ্ধে যিনি অনন্ত যৌবনা দিব্য নর্তকী উর্বশীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্মৃত হতে পারেন নি রমণী শরীরের সেই মাংসল আকর্ষণকে যা বিচলিত করেছিল মুনি ও পুরুষদের। হয়ত সেটি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়, ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে না এখানে, মহৎরাও ব্যতিব্যস্ত হন আঙ্গিক নিয়ে। বাংলার দুজন মহৎ শিল্পীর মধ্যে তুলনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যমণ্ডিত রবীন্দ্র-নাথের বহু কবিতা রচিত হয়েছে সুরসহযোগে যেন তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন শুধু তাদের কাব্যগুণে এবং সুরগুলিতে শুদ্ধ সঙ্গীতের মর্যাদা না থাকায় আলোচ্য কবিতাগুলোর প্রতি যেন ন্যায়বিচার করা হয় নি এবং দুটি পৃথক শৈল্পিক অভিব্যক্তির অসম মিলনের ফলে তাদের সামগ্রিক মান গেছে নেমে। অবশ্য এটিও গ্রহণ করতে হবে ঘটনা হিসেবে যে কবি বাংলার নরম মাটিতে যেখানে রয়েছে সঙ্গীত ও কবিতার সহ অবস্থান—সক্ষম হয়েছিলেন সুরেলা গানের লোকপ্রিয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায়। আর যামিনী রায়ের চিত্রগুলো, যা শেষপর্যন্ত চিত্রই, সমৃদ্ধ ছিল এমন এক আকর্ষক ও রহস্যময় সৌন্দর্যের দৃশ্যমান প্রতিমায় যেন তার বাচনিক আবেদন অনুভূত হতে পারে চিত্রগত উপাদানকে বিরক্ত না করেও। সম্ভবত প্রযুক্তিগত এ দৃষ্টিকোণ থেকেই একমাত্র তুলনা করা চলে বাংলার এ দুজন শিল্পীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে সম্রাটের মতো শাসন করছেন বহু সাম্রাজ্য এবং যামিনী রায়ের একত্বের অভীপ্সা তাঁকে আবদ্ধ রেখেছে বাংলার প্রত্যন্ত কোণে এক নির্জন কক্ষে যেখানে গুণমুগ্ধদের যেতে হবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে।

জীবনের এক উপান্ত পর্যায়ে যামিনী রায় আবিষ্কার করেছিলেন একটি তাজা ভূমি এবং উৎপন্ন করেছিলেন বেশ কিছু ছবি যা শিহরিত ছিল বদ্ধ বর্ণময় সুরের ঐকতানে। তাঁর প্রথম দিকের কাজ থেকে বেশ সরে এসেছিলেন তিনি কিন্তু প্রায় কখনোই হন নি সুরভ্রষ্ট অথবা রচনা করেননি কোনো বেসুরো পদার্থ। ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হয়েছে উজ্জ্বল রং সমূহ, পরিনামকে উচ্চতায় তুলবার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে সাদা ও কালো সীমানা এবং অলংকরণ। কিন্তু তবু তাঁর ছবিগুলো আঁকা হয়েছে এমন সাবলীল তুলির টানে এবং এযাবৎ অজানা বর্ণ পরিকল্পে যেন তারা প্রায়শই নেচে যাচ্ছে দৃশ্যমান সংগীতের খেয়ালি আনন্দের ঝংকারে।

তথাপি, শিল্পে কলাকৈবল্যবাদের সমর্থক বিশ্বাসী নন যামিনী রায়, শৈল্পিক আবেগে নিরাসক্তও নন তিনি, অথবা অসচেতন নন জীবিকার জরুরি চাহিদা সম্পর্কেও। বস্তুত, যদিও তাঁর পেশায় অভিনিবিষ্ট তিনি, তবু সারা জীবন ধরে তাঁর সতর্কতা ছিল 'দর্শক' সম্পর্কে যার প্রয়োজনীয়তা আছে একজন শিল্পীর কাছে।

সমকালীন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য ঘরানার কোনো শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও তিনি শুধুমাত্র আদর্শগত বিশ্বাস ও সংযোগী গুণের প্রকাশ শক্তিতে সব জায়গায় পথ করে নিতে পেরেছিলেন তিনি। তাছাড়া বিপুল এক শৈল্পিক প্রেরণায় প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করেছিলেন তিনি যা ছিল তাঁর অভিব্যক্তির ধরনের সঙ্গে মানানসই। এটা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে ছবির প্যানেলের প্রস্তুতিতে এবং রঞ্জক পদার্থের ব্যবহারে। তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী হিসেবে যাঁরা তাঁর সাবলীল কক্ষদক্ষতায় মুগ্ধ আমি তাঁদের বলতে চাই যে প্রযুক্তিগত বাধাগুলো অতিক্রম করার জন্য যামিনী রায় বাস্তবিকই পেরিয়ে এসেছিলেন আত্মশিক্ষার এক শ্রমসাধ্য পথ। আত্মিক সৌন্দর্যকে অধিগত করার জন্য দরকার বিষয়ের উপর আধিপত্য। তাঁর চারপাশের সবকিছু ছিল এমনই অনুপম ও সতন্ত্র যে যার ফলে তিনি হয়ে পড়েছিলেন নির্জনবাসী, নিজের বিশ্বাস ও সন্দেহ নিয়ে পরিতৃপ্ত, আমাদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার উৎকট স্বাদেশিকতা ও অবাধ অনুকারবৃত্তি থেকে অনেক দূরে স্থিত।

সন্দেহ নেই আমাদের দেশের শিল্পের ইতিহাসে যামিনী রায় পাবেন এক সম্মানিত স্থান যা আমাকে বাধ্য করে তাঁকে মান্য করতে। আমার দেশবাসীর প্রতি ন্যায়পরতা দেখাতে গিয়ে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এ লোকশ্রুতির বিরুদ্ধে যে তিনি কদাচিৎ প্রশংসিত হয়েছেন আপনজনদের দ্বারা এবং তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ, অধ্যাপক শাহেদ সুরাওয়ার্দি, মিসেস আর জি. কেসী (বাংলার তদানীন্তন গভর্নরের পত্নী), বেভারলি নিকলস ও অন্যান্যদের জন্য যাতে তাঁরা তাঁকে বাঁচাতে পারেন বিস্মৃতি থেকে। আমার বক্তব্যের সমর্থনে কিছু ঘটনা এখানে আমি পেশ করতে পারি:

১। ১৯০৫ থেকে ১৯১৬-র মধ্যে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন, তাঁর ব্যতিক্রমী প্রতিভার স্বীকৃতিতে তাঁকে যেকোনো ক্লাস বেছে নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সারা কালসীমার মধ্যে তাঁকে পরীক্ষার বাধ্যতায় প্রবেশ করতে হয় নি এবং তা ছাড়াও শ্রেণীকক্ষে তার স্টাডিগুলোকে প্রদর্শন করতে দিয়েছিলেন—কোনো ছাত্রের প্রতি সেই প্রতি সেই প্রথম ও সম্ভবত একবারই এধরণের গুণগ্রাহিতা দেখানো হয়েছিল।

২। মজুমদারের স্টুডিয়োর সেই দিনগুলোর সময় থেকে সহশিল্পীদের তাঁর সম্পর্কে ছিল অবিমিশ্র প্রশংসা, তাঁরা ছিলেন তাঁর চির অনুগত—এমন

সম্মান বাংলার আর কোনো শিল্পী কবি বা সংগীতগুণীর প্রতি এতদিন ধরে কখনো দেখানো হয় নি।

৩। বহু শিল্পীপ্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তিনি পেয়েছেন এবং ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস'-য়ের ভাইসরয় স্বর্ণপদকও তিনি পেয়েছিলেন।

৪। চমকপ্রদ রিভিউ যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর স্বাভাবিক এক বিশেষ অধিকার। একক প্রদর্শনী হিসেবে তিনিই প্রথম উপস্থাপিত হন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ের ভবনে যখন সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুল দে এবং তার উদ্বোধন করেছিলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সার আলফ্রেড ওয়াটসন (তখন তিনি ছিলেন 'মিস্টার')।

৫। জীবিকার শুরু থেকেই প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে হিসেবে উপার্জনে সক্ষম ছিলেন তিনি এবং তা চালিয়ে গিয়েছিলেন কয়েক দশক ধরে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বহু বছর ধরে শিল্পপ্রদর্শনী চালানোর সূত্রে তাঁর সঙ্গে জড়িত থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে চিত্রকর হিসেবে যামিনী রায়ের উপার্জনের ব্যাপারে আমি বলতে পারি তাঁর জীবনের গোড়ার যুগে তাঁকে ছবি বিক্রয়ের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করতে হত নিজের ঘনিষ্ঠদের পোষকতার উপর তা সে যত সামান্যই হোক না কেন। তাঁর সহকর্মীরা চালিয়ে নিতেন কোনমতে যদিও তা তাঁর পরিবারকে ভদ্রভাবে প্রতিপালন করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অবশ্য কিছু পোষক চাইতেন 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট'য়ের শিল্পীদের আঁকা ছবির অধিকারী হতে। প্রতীচ্য ভঙ্গিতে আঁকা কিছু তৈলচিত্রও রাখতেন তাঁরা। কিন্তু সকলেই জানতেন শুধু ছবির জন্যই ছবি কেনা আমাদের দেশে বেশ বাড়াবাড়ি কেননা ছবি দিয়ে দেয়াল সাজানো ব্যাপারটা এখনো আমাদের কাছে অপরিচিত।

অবশ্য এটাও নিঃসন্দেহ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বিভারলি নিকলসের কয়েকটি লাইন তাঁর জীবনে চিচিং ফাঁক-য়ের জাদুর মতো কাজ করেছিল। আমি তাঁর 'ভারত সম্পর্কে রায়' লেখাটির (লাখ লাখ কপি বিক্রয় হয়েছিল) কথা বলছি যেখানে যামিনী রায় ও মহম্মদা আলী জিন্নাহ্ বিবেচিত হয়েছিলেন ভারতের দুই মহান সন্তান রূপে এবং গান্ধীকে বলা হয়েছিল পিগমি। ক্রমে অবশ্য জাগতিক সম্পদের দরজা খুলে গিয়েছিল যামিনী রায়ের সামনে এবং তিনি বিপুলভাবে প্রচারিত হয়েছিলেন পত্রিকা সমালোচনা, জীবনীচিত্র, বেতারভাষণ প্রভৃতি দিয়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাগবাজারে তাঁর ছোট স্টুডিয়োটি ভরে উঠল পৃথিবীর দূরপ্রান্ত থেকে আসা গুণগ্রাহী ও সংগ্রাহকদের ভিড়ে। রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রদূত, সেনাবাহিনীর কর্মচারী রুশ

আমেরিকান ও অন্য সকলে যেন তাঁরা বাঁধা বিশ্বভ্রাতৃত্বে কলরব করতেন তাঁর মৌলিক ছবির জন্য।

যখন এ ব্যাপারগুলোর জন্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কলকাতার এক অভিজাত পাড়ায় বারোটি প্রদর্শনীসহ একটি বাড়ি বানানোর, তখন তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন এমন একটি অকপট পদ্ধতি যার সাহায্যে নিজের বিষয়গুলোর পুরোনো ও নতুন শত শত প্রতিরূপ বানিয়ে তোলা যায় কেননা তাঁর আঁকা ছবির তখন ছিল অবিরল চাহিদা। কাজটি কোনো একজন মাত্র লোকের পক্ষে ছিল নিতান্তই কঠিন। ভাগ্যক্রমে এ পর্যায়ে তিনি পেয়েছিলেন পুত্র অমিয় ও তাঁর বন্ধু মনীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (পটল ও মণ্টু) সক্ষম সাহায্য যার জন্য রক্ষা পেয়েছিল দুটি দিক। কিন্তু মানুষের সাধ্যেরও আছে সীমা এবং এ চাপ শিল্পী ও মানুষ যামিনী রায়কে, যিনি ইতিমধ্যেই বয়সে ভারাক্রান্ত, করে ফেলেছিল পরিশ্রান্ত।

সারা জীবন ধরে যামিনী রায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছিলেন শিল্প রাজনীতি থেকে আবার অন্তর্মুখী হবার ফলে তাঁকে কখনো ভুগতে হয় নি চাপিয়ে দেওয়া রোমাণ্টিক বর্ণবলয়ের গরিমায়। যদিও তিনি জানতেন তাঁর ছবিগুলো বহুজনের আনন্দের উৎস, তিনি নিজে ছিলেন নিরানন্দ। তাঁর যাবতীয় জাগতিক অধিকার এবং বিভারলি নিকলস ও অন্যান্য কর্তৃক স্থাপিত বেদীর উপর তাঁর অধিষ্ঠান সত্ত্বেও তিনি কদাচিৎ পারতেন জীবনের কর্কশ বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশের অনুবাদ : বিষ্ণু বসু।

[এই প্রবন্ধটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের বিষয় প্রায় এক হলেও, দুটি অংশেই কিছু কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান রয়েছে, তাই দুটি অংশই এখানে ছাপা হলো, প্রথমটি বাংলায় ও দ্বিতীয়টি ইংরেজীতে লিখিত। আশা করি পাঠক এব্যাপারে সজাগ।—সম্পাদক।]

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

যামিনীদা প্রসঙ্গে

এক

শিল্পী হিসাবে যামিনী রায় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল—শিল্পী বলতে আমি ব্যাপকভাবে তাঁর গুণ দেখছি অর্থাৎ তিনি কোন স্কুলের অঙ্কনপদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথবা কোন স্কুলের প্রভাব তাঁকে যামিনী রায়ের খ্যাতি তাঁর কাজে দিল সে বিষয়ে আলোচনা করতে দিলে অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়—এই খুঁটিনাটির ভিতর প্রথমেই আসে খ্যাতি অর্জনের আগের কথা তখন যামিনীদার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি কলকাতায় এলে প্রায়ই তিনি হোটেল ম্যাজিষ্টিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বেশ খানিকটা সময় ঘরোয়া কথা, ছবির কথা, শিল্পীর কাজ কি ভাবে প্রচার লাভ করে তার কথা, এমন কি ছবি বিক্রয়ের প্রথায় যে ব্যবসায়িক বুদ্ধির অত্যন্ত দরকার, এমন আলোচনাও আমাদের মধ্যে হয়েছে। ছবি বোঝা এবং বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও যে আমাদের মতামতের আদানপ্রদান হয় নি, এমন কথা নয় ; সব বিষয়েই তাঁর সঙ্গে আমার যে মতের মিল ঘটত—এ কথা বলি না। মতের গরমিল থাকলেও মনের গরমিল কখনও আসে নি, কারণ একটি জায়গা ছিল যেখানে আমরা উভয়ে একই পথে চলেছিলাম। পথটি দ্বন্দ্বের, সংগ্রামের। যামিনীদা এদিক দিয়ে দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। সাহস এসেছিল আত্মবিশ্বাস থেকে। দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্বাসের কথা উঠল, কারণ তখন তিনি বিদেশী প্রথায় ছবি আঁকা ছেড়ে পট-চিত্রের অনুগামী হওয়ার চেষ্টা করছেন। বিদেশী প্রথায় 'অয়েলি পেণ্টিং' যখন তিনি করতেন, তখন তাঁর ছবিতে রঙের বিন্যাস, রেখার সংহতি এবং প্রতিকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি ছবির পরিবেশে এমনই

সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতেন যাতে তাঁর আঁকা ছবিকে সাধারণের মধ্যে ফেলার উপায় ছিল না। মুখাকৃতিতে বিশেষ করে যে সব 'টাচ' তিনি তুলির ছোঁয়ায় দিয়েছেন তা প্রত্যেকটি ছবির আসল গুণে যোগ দিয়েছে ছবিকে সুন্দর করে তোলবার জন্য। এর চেয়ে বড় কাম্য শিল্পীর কাছে কি থাকতে পারে। যামিনীদা এইভাবে ছবিতে রসের সম্পদ যখন বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তখনই এল পট-চিত্রের প্রভাব তাঁর উপর। ক্রমান্বয়ে সারাটা জীবন যে ধরনের কাজ করে তিনি খ্যাতির বাইরে থেকে গেলেন তাকেই এনে দিল পট-চিত্রের অনুসরণ যশ ও অর্থের সমাগমে। এই প্রসঙ্গে বলি পট-চিত্রের অনুসরণে তাঁর প্রধান দাবী ছিল ছবি আঁকার জটিল রীতি ও নীতিকে সহজ করা। যামিনীদা শিল্পী, উচ্চস্তরের শিল্পী—তিনি যাকে সহজ বলে ভাবলেন, আসলে তাঁর ছবির বিশ্লেষণ হলে দেখা যাবে জটিলই মুখোস পরে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ সহজ বলতে উচ্ছ্বাসের প্রকাশভঙ্গীতে কিছু নেই, এমন কি শিশু যখন তার উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে, তখন তার প্রকাশের চেষ্টায় রীতিমত সংগ্রাম থাকে—এই সংগ্রাম আর কিছুই নয়, বলার মধ্যে যে সব জটিল বাধা থাকে তাকেই সহজ করার চেষ্টা।

যামিনী রায়ের চিত্রে স্বতন্ত্র-ভাষা আছে বলেই তো আজ তিনি যামিনী রায়। এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল এই যে, যদিও লোকে বলে তিনি পট-চিত্রের অনুগামী কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বিদেশী প্রথায় শৃঙ্খলা আনার ব্যবস্থা এতই সুস্পষ্ট যে, তাঁর আঁকা ছবিকে তাঁর ব্যক্তিগত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানই বলতে হয়। পট-চিত্র প্রভাব যেটুকু তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা অনুপ্রেরণাতেই শেষ হয়েছে অর্থাৎ যাকে বিদেশী মতে বলে– "এ মাইনর টু এ্যান এণ্ড" "এণ্ড" হচ্ছে যামিনী রায়ের নিজস্ব দান।

Reflected Glory যে ক্ষেত্র বিশেষে লাভজনক হতে পারে তা জানা ছিল না। যামিনীদার সম্পর্কে কলম ধরতে গিয়ে আমার এ উপলব্ধি হল। বহুদিন আগের কথা। তখন ছবি আঁকার ফ্যাশন সবে শুরু হয়েছে। আঁকার দিকেও একটা নতুন কিছু করার তাগিদ সচল। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথার ছবি আঁকার ধারা ও উদ্দেশ্যকে সহজ মেলামেশার পথে নিয়ে চলেছেন। মনে পড়ছে Kippling সাহেবের সেই বিখ্যাত লাইন কটা—Oh! East is east, West is west and the twain shall never meet.—উক্তিটি সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধতা থাকতে পারে তাই বিশ্বাসযোগ্য করালেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব প্রথায় রূপ সৃষ্টির দ্বারা।

অপরদিকে অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে চলল কিউবিজিমের ধরপাকড়। কিন্তু এখানেও বিদেশী আধুনিকতা বিজ্ঞ মানুষটির মনকে নাড়া দিল জ্যামিতিক ফর্মের মাধ্যমে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ। তবে বলে রাখা ভাল তার উচ্ছ্বাসের গোড়ায় ছিল ঘরোয়া কথা, এই ঘরোয়া কথায় জ্যামিতিক নক্সার ঘেসাঘেসিতে ছবির গল্প ধরা দিল কখনও পরীর রাজ্যে আবার কখনও শ্রীচৈতন্যের ভাবমুগ্ধ আনন্দ নৃত্যে। সেই সময় যামিনীদাও নতুনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন। ওস্তাদ বৈদেশিক শিক্ষিত চিত্রকর সেজেগুজে নামলেন পটুয়ার ক্ষেত্রে। ছবির পরিবেশে সাদাসিধে গাঁয়ের কথায় রূপে রং এর বিন্যাস হতে লাগল। রেখার ব্যবহারেও বিলাতী কথাতেই বলি Composition এর Assets-এর মধ্যে Economy'র চূড়ান্ত সাধনা চলল। জনসাধারণ জানল তিনিও নাকি অবনীন্দ্রনাথের মত একজন 'রিভাইভালিষ্ট'। ধারণাটা মেনে নেওয়ায় অসুবিধে আছে। কারণ রিভাইভালিষ্ট বলতে যা বোঝায় তা যামিনীদার আঁকা ছবি ও পট-চিত্রের আবহাওয়ায় নেই।

ওস্তাদ কারিগর যতই চেষ্টা করুক তার বুদ্ধির পুঁজি, তার জ্ঞানের পুঁজি ফেলবে কোথায়। টাকা ছুঁড়ে ফেললেও যেমন তাকে তুচ্ছ করার উপায় নেই, যেমন কঠিনের সহিত সংঘর্ষণে ধাতব পদার্থের ধ্বনিকে রোধ করা চলে না, সেরূপ যামিনীদার বিদেশী শিক্ষার পাণ্ডিত্য এবং তাঁর বয়সের অভিজ্ঞতা কিছুতেই তাঁকে সরল শিশুর মত বেপরোয়া হতে দিল না। পটচিত্রে তারই প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ছবির পরিবেশকে যে ভাবে হিসাব করে গোছানো হয়েছে অর্থাৎ 'Compactness in the Composition' পটুয়ার চালকে বিধ্বস্ত করে যামিনীদাকে আঁকড়ে ধরেছে জোর করে বলবার জন্য যে—যে নতুন প্রথায় তিনি ছবিতে রূপ দেখতে চাচ্ছেন সেটি তার নিজস্ব দান এবং এই দান যে আমাদের কৃষ্টির একটি বৃহৎ সম্পদ তা অস্বীকার করার উপায় আমার মত পরশ্রীকাতরের পক্ষেও সম্ভব নয়।

দাদার ছবি নিয়ে 'টেকনিক্যাল এনালিসিস' বেশী ভাল নয়। কারণ বয়ঃজ্যেষ্ঠের পাওনা সম্মান দিতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। সুতরাং তাঁর ছবির সমালোচনা তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল যারা ছবির আত্মাকে ডিসেকসান দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। এর অধিক বলার আমার কি আছে? বিশেষ করে যখন আমি নিজে এখনও রোজ ছবি আঁকি। সেগুলো হয়ত ব্যাক ডেটেড, তা হোক; তবু আমার উচ্ছ্বাসকে কতকটা রূপ দিতে পারলে আমার নিজের ভাষায় তাকেই আমি বলি ছবি।

ভবেশ সান্যাল

কিছু স্মৃতি

১৯২৭ কি ২৮ হবে যামিনীদা নিয়ে গেলেন আমাকে তাঁর বাগবাজারের বাসভবনে। সঙ্গে নিলাম আমি এক তাল গঙ্গার পলিমাটি তাঁর নির্দেশে। Calcutta Society of the fine arts-এর বাৎসরিক exhibition-এ যামিনীদা আমার গড়া গোটা দুই মাথা দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। ঐ exhibition সাজান হোতো আর্ট স্কুল ভবনে। সেই থেকে তাঁর সান্নিধ্য আমি পেয়ে এসেছি যতদিন কলকাতায় ছিলাম। তারপর চিঠিপত্রে।

বাগবাজারের বাড়ীতে পাশাপাশি বসে আমরা যেন পুতুল গড়া খেলতে আরম্ভ করি। কিছু দিন পরেই বুঝলাম উনি যেন কিসের খোঁজে আছেন। কিছু জিজ্ঞাসা, কিছু অব্যক্তব্যাঞ্জনা যা ত্রিআয়তনে রূপায়িত করতে চান। আমার গড়া হাতী, ঘোড়া, মানুষ স্বাভাবিক চেনা জানা রূপ। যামিনীদার হাত গড়ে দেয় যেন বাঁকুড়ার ঘোড়া। মনগড়া। ঘোড়ার তেজী মেজাজটারই প্রাধান্য। ঐ যে সরলীকৃত stylisation পরে তাঁর ছবিতে দেখা গেল তারই পূর্বাভাস মাটির মাধ্যমে তিনি সন্ধান করছিলেন।

আমার সুদীর্ঘ প্রবাস কালে যখনই কলকাতায় এসেছি যামিনীদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয়েছে। কলা পরিস্থিতি নিয়ে বিচার আলোচনার সময় আমি নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসু। আমি প্রশ্ন করি "একি সত্যি যে যামিনী পটুয়া আপন ঘরে তাঁর ছবির কারখানা বানিয়েছেন? দিনে দিনে ছবি তৈরী হলে তাতে শুধু নামাঙ্কন করে দেয়া হয় অর্থাৎ সই করা Thumb impression এর মত"।

প্রশ্নটার মধ্যে হয়তো সামান্য ব্যাঙ্গোক্তির ছোঁয়া ছিল। আমাকে তিনি প্রচুর স্নেহ দিয়েছেন তাই হয়তো এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে একটু ক্ষুন্ন হলেন।

বললেন "জানি এ বিষয়ে একটা প্রচার চলছে। মোদ্দা সার কথা এই যে—আমি চাই দেশের ঘরে ঘরে calender সজ্জা না করে আমার আঁকা একটি পট টাঙাও। তাই তো আমি অল্প দামে ছবি বিক্রী করি। ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে সরবরাহ হয় কি করে। আমার ছবির ফর্মাট আছে। ছেলেকে শিখিয়েছি। সে সাদা মাটা রংগুলো ভরে দেয়-আমি সূক্ষ্ম কাজ গুলো করে নিয়ে নাম লিখে দি। এতে ক্ষতিটা কি? মধ্যযুগের ইয়োরোপে Painters guild-এ এধরনের প্রথা ছিল জানা যায়। চেলারা সাধারণ ভাবে ছবির জমি রাঙিয়ে দিত—অবশ্য ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে—মাস্টার পেণ্টার ছবি শেষ করে সই করে দিত।"

যামিনী রায়ের উদ্দেশ্য ও উপায় বুঝে নিয়ে আমার মনে কোন দ্বিধা রইল না। মনে পড়ে বেশ কিছু সময় হল আমি কলকাতা এলাম দিল্লী থেকে। উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার আলোচনা হল। তখন তিনি শ্রীরামপুরে নিজের বাড়ীতে রয়েছেন। বিদায় নেবার সময় আমি বললাম তার একখানা ছবি আমি মূল্য দিয়ে নিয়ে যেতে চাই—আমার নিজের সংগ্রহে রাখবার জন্য। ছবি পছন্দ করলাম রাধা কৃষ্ণ সিরিজের। পুত্র ছবিখানা সযত্নে pack করে দিয়ে বললেন মূল্য ১৫০ টাকা। মনে হল অতি সুলভ। যামিনীদা কাছে ডেকে বললেন—ভবেশ ৬০ টাকা দাও।

তাঁর বিশ্বাস ও ব্যবহারের সরলতায় আমি মুগ্ধ।

আরও আগের কথা। আমি এসেছি লাহোর থেকে দেশ বিভাজনের বেশ কিছু পূর্বে। যামিনীদা তখনও বাগবাজারের বাড়ীতে রয়েছেন। পটুয়া মেজাজের ছবির প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। কালো সাদায় ছবি। Location-টা মনে নেই। কিন্তু মনে আছে ক্ষিতীশ রায় কি চৌধুরী নামে বেশ জানা-মানা এক ভাস্করের স্টুডিওতে। আমি উপস্থিত ছিলাম। অবনবাবু এলেন যামিনী রায়ের নতুন ছবি দেখতে। ঘুরে দেখলেন খুসি হলেন। যাবার সময় বললেন "যামিনী কিম অতঃ পরম!" তিনি চলে গেলে পর যামিনীদা বলেন "দেখলে ভবেশ—অবন ঠাকুর ঠাট্টা করে গেলেন।"

আর্টিস্ট মাত্রেই কিছুটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুভবশীল লজ্জাবতী লতার মত। কিন্তু যামিনীদাও যে অত অভিমানী তা এই প্রথম জানলাম। আমার মনে হয় অবনবাবুর মন্তব্যটা প্রশংসারই রূপান্তর। কিন্তু যামিনীদা বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজিত রইলেন।

যামিনী রায়ের ছবি কেন যে অত জনপ্রিয় তার উপলব্ধি অতি সচ্ছল ভাবে আমি অনুভব করি সুদূর বিদেশের পরিবেশে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহু ইয়োরোপীয় ও মার্কিন সৈন্য কলকাতায় ছাউনি বসায়। তাদের মধ্যে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি বেশ কিছু সামরিক

কর্মচারী ছিলেন কলানুরাগী। তাদের মধ্যে অনেকেই যামিনী রায়ের ছবি সংগ্রহ করেন। আমেরিকায় বিস্তৃত পর্যটনের পর আমি Santa Fe উপস্থিত হই। সেখানে আমার স্থানীয় তত্ত্বাবধায়িকা Folklore Art Museum-এর Directress। তিনি নিয়ে গেলেন স্বল্পকালীন কলকাতা ফেরত মার্কিন ভদ্রলোকের বাড়ীতে। তাঁর বৈঠক ঘরে চোখে পড়ল সবার আগে তিন খানি যামিনী রায়। ত্বরিত মনে হোলো আমি বাড়ী ফিরে এসেছি। মন উদাস হয়েছিল সেদিন বাড়ী ফেরার টানে।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৬৭ কি ৬৮তে। ললিতকলা আকাদমির পক্ষ থেকে এক গোষ্ঠি নিয়ে আমি ওঁর বাড়ীতে। Fellowship-এর অভিনন্দন—তাম্রপত্র অঙ্গবস্ত্র ও কিঞ্চিত দক্ষিণা দিয়ে বিদায় নিই।

সুনীলমাধব সেন

দিনপঞ্জীর পাতা থেকে

আজ বেলা ১২ টার সময় হঠাৎ কী জানি কেন মনে হল শিল্পী যামিনী রায়ের কাছে যাই। যাহা ভাবা তাই কাজ do it now or never সহকর্মী মণি মজুমদারের Wellington Gariahat Tram Monthly Ticket খানা নিয়ে রওনা হলাম। দেশলাই কিনে পকেটে মাত্র পাঁচপয়সা ছিল। 'where there is a will, there is a way' কথাটা অতিশয় দামী। Bondel Road এ নেমে সোজা পূবদিকে হাঁটতে লাগলাম। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ছে রৌদ্রে কষ্ট হচ্ছে না। প্রায় ১০ মিনিট হেঁটে Dihi Srirampore lane-এ পেঁছন গেল। বেশ ফাঁকা জায়গা সবে সব বসতি গড়ে উঠছে ৫-১০ বছর পর এ সব জায়গার চেহারাই বদলে যাবে। হু-হু করে কলকাতা যে রকম বেড়ে উঠছে তাতে ঐ সব ফাঁকা জায়গা বড় একটা আর পড়ে থাকবেনা। অথচ ১০/১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সব জায়গায় বড় একটা কেউ যেত না।

ক'বছর পূর্ব্বে তখন যামিনী রায়ের বাড়ী সবে তৈরী হয়েছে, অতুল বোস (শিল্পী) মহাশয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। বাড়ীটা খুঁজে তো হাজির হলাম। সদর দরজা দিয়ে উঠে ২।৩টা সিঁড়ি পেরিয়ে বাঁ হাতি প্রথম ঘরটায় ঢুকে পড়লাম। কেউ নেই ঘর খালি সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে প্রাণ ভরে ছবিগুলি দেখতে লাগলাম।

পাশের ঘরগুলো অন্ধকার তবে দূরের জানালা দিয়ে কিছুটা আলো আসছিল আলো আঁধারীতে সে সব ঘরের ছবিগুলো বেশ দেখতে লাগছিল। দুয়ারে টোকা মারলাম। বাচ্ছা একটা হিন্দুস্থানী চাকর আস্লে যামিনীবাবুর

খোঁজ করলাম। সে বসতে বলে চলে গেলো। একটু পরে যামিনী রায় এসে আমার সামনে হাজির হলেন। বেশ একটু বুড়ো হয়ে পড়েছেন। যেন একটু কুঁজোও মনে হল। ৬৬ বছর পেরিয়ে প্রায় যাচ্ছে। বল্লেন "কে সুনীলমাধব সেন না?" "আজ্ঞে", বলে নমস্কার করলাম। "বেশ বেশ-ওকালতি করা হচ্ছে তো?" একটা চাকরী করছি বললাম। পাশটিতে বসে পড়লেন, বল্লেন অতুল প্রায়ই আপনার কথা বলে। তা আর আপনার সাথে দেখাই হয়না। শরীর খারাপ, low pressure একটু কষ্ট হয় ১৬।১৭ বৎসর আর বাড়ী থেকে বেরুইনি।

মাঝে মাঝে মনে হয় সকলের নিকট গিয়ে দেখা করি। কিন্তু Tram Bus চড়তে পারিনা। Taxi করে যাওয়া তাতে বড় খরচ। কোথা থাকা হয়? সেই উত্তরকলকাতাতে না Delhi-তে?" আমি বল্লাম "দিল্লী কেন?" উত্তরে বল্লেন "ঐ যে বল্লেন Govt চাকরী করি? Govt. চাকুরেরাতো প্রায় Delhi-তেই থাকে।" বল্লাম আজ্ঞে না, জগদীশ রায় লেনেই থাকি।

একটু চুপ করে থেকে বল্লেন "হরিঘোষ ষ্ট্রীটের জগদীশ রায় লেন? ছেটবেলায় নিমাইবসু লেনে থেকে চৌরঙ্গীর Govt. Art School-এ পড়তাম তখন ঐ সব অঞ্চলে খুব ঘুরে বেড়াতাম তাই জগদীশ রায় লেন বেশ মনে আছে। একটু থেমে আবার বল্লেন, "এখন কি ছবি আঁকা হচ্ছে?" বল্লাম "Impressionism, Surrealism এই সবই করছি।" বল্লেন "তা বেশ যার যে ভাব ওতে বলবার বা direct করবার কিছু নেই। কারোর উপর কোন জোর খাটেনা। বলে নিজের উপরেই জোর নেই তা আবার পরকে উপদেশ দেব কি? যে যে ভাব নিয়ে জন্মেছে সে সেই ভাবেই চলবে। ইস্কুলে পড়ে বড় একটা কিছু হয় না। নিজের চেষ্টাই সব তাতে originality থাকে, এইতো আমার ছেলে art School-এ পড়েনি সে আমার সাথেই কাজ করে ১½ ঘণ্টায় আমার portrait কেমন করেছে।" পাশের ঘরে গিয়ে ছেলের আঁকা ছবিটা দেখালেন। চমৎকার হয়েছে।

ঘরে "Fire place" এর নীচে Vincent vangogh এর একটা Portrait দেখলাম। যেটা Irving stone-এর "Lust for life" বইটার cover-এ আছে। জিজ্ঞাসা করলাম "এটা কে করেছে?" উত্তরে নিজেকে দেখালেন বল্লেন "খেয়াল, মনে হ'ল করি তাই করলাম।"

এই রকম বহু কথাই হল তাঁর সাথে প্রায় দেড় ঘণ্টা। উঠলাম বল্লাম "আজ আসি"—কিন্তু তিনি যেন কি বলবেন বলে মনে হ'ল। আমিও একটু অপেক্ষা করলাম উত্তরের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ বল্লেন "এটা খুব বাহাদুরী, চাকরী করা হয় আবার ছবিও আঁকা হয়—তা হবেনা কেন ইচ্ছা থাকলে সবই করা যায় বেশ বেশ। তবে এটা নিয়ে থাকলেও প্রথমটায় কষ্ট হয় বটে কিন্তু পরে এ

থেকেই খাওয়া পরার সংস্থান হতে পারে। আমারও খুব কষ্ট গেছলো কিন্তু ছবি ছাড়া আমার আর কিছু মনে ছিল না।"

আমি বল্লাম "আপনার নিকট আসতে খুব ইচ্ছা হয়।" বল্লেন "তা তো হবেই। আমরা যে আত্মীয় অর্থাৎ সকলেই যে শিল্পী এতে বামুন, বৈদ্য, কায়স্থ নেই তাই আত্মীয় বললাম।" সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আর একদিন সস্ত্রীক আসবো জানিয়ে বিদায় নিলাম।

রথীন মৈত্র

যামিনীদার ছবি

আমার শিল্পী-জীবনের প্রথম অধ্যায় যামিনী রায় ছিলেন শুধু আমার কল্পনার পুরুষ। মনে পড়ে তখনও আমি আর্ট স্কুলে ভর্তি হইনি। যামিনীদার অরিজিন্যাল ছবি দেখার প্রথম সুযোগ পাই সোসাইটী অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস-এর চিত্র-প্রদর্শনীতে। যতগুলো ছবি ছিল তার মধ্যে যামিনীদার ছবি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এর পর আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছি। একাডেমী অফ ফাইন আর্টস এ যামিনীদার আরও কয়েকটা ছবি দেখেছি। এইভাবে ছবি দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে কবে যে তাঁর ছবির ভক্ত হয়ে উঠেছি নিজেই জানিনা। তারপর একদিন সাহস করে তাঁর আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অবাক বিস্ময়ে প্রতিটি ঘর ঘুরে ঘুরে শিল্পীর মহৎ শিল্পকর্ম দেখলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ঐ সব ছবি মনের তলায় জমা হয়ে রইল। বার বার মনের চেতনে অবচেতনে তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

এরপর যামিনীদার ছবির একজন অন্যতম গুণমুগ্ধ দর্শক হিসেবে আমি তাঁর বাড়ীতে যাওয়া আসা শুরু করলাম। ব্যক্তিগত তাঁর সংগে পরিচয়ও হল। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার শিল্পবোধের ভাঙ্গা-চোরা শুরু হল। আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের সেই বাড়ী সেই পরিবেশ আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র বলে পরিগণিত হল। তাঁর বিশেষ বন্ধু কবি শ্রীবিষ্ণু দে ও জন আরউইন এবং অধ্যাপক সাহেদ সুরাবর্দীর সংস্পর্শে এসে যামিনীদার সম্পর্কে আরও অনেক বেশী জানতে পারলাম। ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনা ও যাওয়া আসার মাধ্যমে যামিনী রায় কখন যে যামিনীদা হয়ে গেলেন তা ঠিক মনে করতে পারছি না।

এই অসামান্য শিল্পীর কথা বলতে গেলে প্রথমে মনে আসে তাঁর অপরিসীম ধৈর্য ও তিতীক্ষার কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁর দখল ছিল যথেষ্ট। তেল রঙ-এর প্রতিকৃতি অংকনে তাঁর সুনামও ছিল। তিনি নিজে শিশিরবাবু প্রমুখ অভিনেতার সংগে মিশে রাত জেগে জেগে বহু থিয়েটারের দৃশ্যপট এঁকেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পরিবেশ এবং সাহেব শিল্পী না হলে বিদেশী চিত্রের সেই মান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এ পেঁছান মুস্কিল। এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারনা। সুতরাং দিশি বাঙালী শিল্পী হয়ে তিনি দেশীয় শিল্পের মাল মশলার দিকে নিজেকে নিবিষ্ট করলেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গ্রামীন শিল্পের দিকে একটা ঝোঁক ছিল। তাই তিনি উপার্জনের মোটা অংকের টাকাকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য ধরনের প্রতিকৃতি অংকন পরিত্যাগ করেন। এ যেন তাঁর নিজেকে নিজে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। এই সময়টা তাঁর জীবনের 'ষ্ট্রাগলিং পিরিয়ড'। একদিকে সংসার অন্যদিকে জীবনাদর্শ। এই সময় তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছেন এবং নষ্ট করেছেন। কাপড়ের ওপর, চটের ওপর দিশি গুঁড়ো রঙ দিয়ে ছবি আঁকতেন। দারিদ্র্যে ও দুঃখময় জীবনের এই সময় যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সুরাবর্দী, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এবং পরে কবি বিষ্ণু দে ও মিসেস আর জি কে. সি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যামিনীদা তাঁর শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে ধীরে ধীরে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর

মধ্যেও পরিচয় লাভ করতে লাগলেন ; বিশেষ করে তদানীন্তন পরিচয় গোষ্ঠীর যথেষ্ট তারিফ তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর নিজের গ্রাম বেলেতোর এবং বাঁকুড়া বিক্রমপুরের মন্দিরগুলোর টেরাকোটা ভাস্কর্য, পুরানো কাঁথা, পুঁথি, আলপনা, পাটা, পট এবং পটচিত্র ইত্যাদির মধ্যে তিনি শিল্পের বুনিয়াদ ও প্রাণ দেখতে পেলেন। বর্তমান কৃত্রিম সভ্যতার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা বরাবরই ছিল। তাই তাঁকে এ যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি আজীবন একজন সাধারণ আদর্শ বাঙালীর মত দিন কাটিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর (প্যাটার্ণ অফ লাইফ) গৃহসজ্জা ও বেশভূষায় খাঁটী বাঙালী থেকে গেলেন। যামিনীদা আজ বিশ্বের দরবারে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। অনেকে অভিযোগ করেন একই ছবি তিনি এতবার এঁকেছেন কেন ? উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি একজন সাধারণ পটুয়া এবং তার ঐতিহ্যই তিনি সারাজীবন অনুসরণ করেছেন।

তিনি টেমপারার ওয়াস এবং সরু লাইনের বহু ছবি এঁকেছেন। 'মা ও ছেলে', 'সাঁওতাল মাথায় ফুল গুজছে,' এবং সাঁওতাল সিরিজের ছবিগুলো খুব পাতলা তেল রঙ-এ আঁকা লাইন ধর্মী, ফ্ল্যাট কলার ও লিলিয়েণ্ট ট্রিটমেণ্ট। এই পদ্ধতিতে ক্রমে আরও সহজ হয়ে তিনি বিরাট ফ্রেসকো মিউরাল ধরনের ছবি এঁকেছেন। সেগুলোর মধ্যে ফর্মটা আরও অনেক বেশী সরল হয়ে বাংলার প্রাচীন পর্বের ধারা এসে পড়ে। পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের বৃহৎ কাহিনী ভিত্তিক ছবিও তিনি এঁকেছেন। এর পাশে পাশে চলতে থাকে ইমপ্রেসনিষ্ট শিল্পীদের অনুকরণ। জিজ্ঞেস করলে বলতেন 'শুধু দেখলেই ত হয় না। তাই তাদের বোঝার জন্যে তাদের ছবিকে আঁকা।' তিনি লাল, নীল, হলদে, সবুজ এই কয়েকটা রঙ এর ফ্ল্যাট ব্যবহারে এবং কালো বলিষ্ঠ লাইনের মাধ্যমে ছবি করেন। যীশুখৃষ্টের জীবন সম্পর্কিত প্রচুর ছবি তিনি এঁকেছেন, যেমন 'ম্যাডোনা ও যীশু,' 'শেষ ভোজ,' 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু,' ইত্যাদি। এই ছবিগুলো বৃহদাকৃতি। মিউরাল ধর্ম্মী। কেবলমাত্র আল্পনার মাধ্যমেও বহু ছবি এঁকেছেন, বড় বড় মাটির জালার গায়ে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। মাটির ভাঁড়ে নক্সার বিচিত্র রং-এর ব্যবহারে ছাইদানী করেছেন। কালি কলমে নানা স্কেচের মধ্যেও তিনি নানা রকম পরীক্ষা করেছেন।

যামিনীদা জাত শিল্পী-সাধক শিল্পী। তাই প্রতিদিন ছবি না আঁকলে তাঁর ভাল ঘুম হয় না। ছবিই তাঁর ধ্যান জ্ঞান, তাঁর জগৎ ভুবন। পরিতাপের বিষয় শিল্পী এখন তাঁর বয়স ও ব্যাধির ভারে ক্লান্ত অবসন্ন। আজ তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়ীতেই তাঁর রচিত চিত্র-সম্ভার নিয়ে যামিনী রায় সংগ্রহশালাতে পরিণত করা একটা প্রধান জাতীয় কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি।

সুনীলকুমার পাল

প্রণাম

শিল্পী যামিনী রায় আধুনিক ভারতীয় শিল্পে আপনাতে আপনি এবং সম্পূর্ণ। প্রোজ্জ্বল প্রতিভা নিয়ে তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিল্পের পথ প্রথম জীবনে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অর্থকষ্ট এবং আরও নানান দুঃখে তিনি জর্জরিত ছিলেন। প্রথাগত অয়েল পেণ্টিঙে তিনি সুদক্ষ ছিলেন, বরেন্য শিল্পী হিসাবে সেকালের অন্য নামকরা শিল্পীরাও তাঁকে মানতেন। কিন্তু শুধু ন্যাচারালিস্টিক শিল্প ধারায় তিনি তৃপ্তি পাননি, মনে শান্তি ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশের কায়দায় কিছু ছবি এঁকেছেন, তারও মধ্যে তাঁর নিজস্বতা পরিস্ফুট ছিল। তবু এ তাঁর গৌরবোজ্জল অধ্যায় নয়, তিনি জানতেন। এ শুধু নানান জিনিষ ঠুকরে-ঠুকরে নিজের জিনিষ খুঁজে বার করার চেষ্টা।

আমি আর্ট স্কুলে সেকেণ্ড কি থার্ড ইয়ারের ছাত্র তখন। এমন সময় একদিন চুপি-চুপি জানলাম শিল্পী যামিনী রায় এসেছেন। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল বসন্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের ঘরে বসে আছেন। বসন্তবাবুই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গিয়ে দেখি সেই পার্টিশন দেওয়া ঘরে মাস্টারমশাই রমেন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ সিংহ, প্রহ্লাদ কর্মকার এনারা সবাই যামিনী রায়ের সঙ্গসুখ লাভ করছেন। আমি দেখলাম যামিনী রায় ড্রইং করছেন কাগজে পেনসিল দিয়ে অথচ রবার ব্যবহার করেন না। বিনা রবারে ড্রইং করতে পারেন দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। যামিনী রায়ের নাম জানতাম। দেখলাম তাঁকে সেই প্রথম।

যামিনী রায়ের পূর্ণ প্রকাশ এবং তাঁর শিল্পের গুরুত্ব পরিণত বয়সে

যথাকালে আমরা বুঝেছি। কিন্তু ঐ সময় আর্টস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় যামিনী রায় সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের একটি প্রাঞ্জল উক্তি শুনেছিলাম প্রিন্সিপ্যাল মুকুল দে মহাশয়ের মুখে। ছোট্ট কথা কিন্তু কি সত্য এপ্রিসিয়েশন, —"ওর মধ্যে জিনিষ আছে।"

একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে যামিনী রায় নিজেকে মেলে ধরলেন জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায়। বেশ ধুম-ধাম পড়ে গেল। ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠল তাঁকে ঘিরে। সাধারণের মধ্যে তাঁর প্রচার সুরু হল। আমরা চিনতে শিখলাম তাঁকে। এই পর্যায়ে তার প্রথম দিককার ছবির কথা মনে পড়ে। যাকে কালীঘাটের পট থেকে উদ্ভূত বলে নাম দিয়েছিল তখনকার ক্রিটিকরা। আমি অবশ্য কালীঘাটের পটের তেমন লক্ষণ দেখিনি আমার বিচারে। আমি মুগ্ধ হতাম অন্য কারণে, ভঙ্গীর এবং আকার সরলতার জন্য। কালীঘাটের পটত এক রকমের নয়, অনেক রকমের কোনটা ধরব। তবে ক্রিটিকের আর্ট আর আর্টিষ্টের আর্টত এক জিনিষ নয়, গ্রহণের তারতম্য থাকে। ক্রিটিকের বিচারে অনেক ইনফরমেশন থাকে, তথ্য থাকে, তত্ত্ব থাকে তা জেনে অনেক উপকার হয়। নানান জ্ঞান জন্মে। আর্টিষ্টদের সচরাচর সেসব বিদ্যা থাকে না, আর্টিষ্টদের আর্ট অন্য রকমের। আঁকতে আঁকতে স্টাডি করতে করতে। ধরিত্রীকে অনুশীলন করতে করতে তাদের একটা অনুভূতি জন্মায়। আরেকটা চোখ ফোটে। ক্রিকিটদের তা থাকেনা। শুরুতে কালীঘাটের কিছুটা ধাক্কা হয়ত যামিনী রায়ের মধ্যে এসে পড়েছিল, তাঁর ছবিতে ছবির চেয়ে লাইনের কসরৎ অর্থাৎ সরু থেকে আরম্ভ করে মোটা হয়ে আবার সরু করে লাইন দেখাবার ঝোঁক পড়েছিল। এই রকম ম্যানিয়া বা ব্যাধি অবনীন্দ্রনাথের প্রথমাবস্থাতেও তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাঁরও শুরুতে ইণ্ডিয়ান আর্টের মার্কা পড়েছিল। কিন্তু একদিন সত্যই যখন ইণ্ডিয়ান আর্ট নতুন রূপ পেল তাঁর হাতে। তাঁর ছবিতে বক্তব্যের মধ্যে অনির্বচনীয়তার আভাস ফুটে উঠল, নতুন রোম্যাণ্টিসিজম সৃষ্টি হল তাঁর শিল্প কলায় তখন কোথায় তলিয়ে গেল মোগল কাঙড়ার আবিলতা। যামিনী রায় কেও সৃষ্টির পথ তৈরী করে নিতে হয়েছিল। ন্যাচারালিষ্টিক আর্টের পারঙ্গম শিল্পী যামিনী রায়ের অবসাদ এসেছিল। নতুন আর্ট-ফর্ম খুঁজছিলেন। বাঙলার ফোক্-আর্টের দরজা তাঁর চোখের সামনে সহসা খুলে গেল। শুধু কালীঘাট বা বাঁকুড়া নয়, ভারতের এবং বাইরেও গ্রাম্য শিল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান তিনি জানতেন। আর্ট ফর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন হয়ত কালীঘাট বা বাঁকুড়া থেকে। কিন্তু অল্প কালের মধ্যে আপন শিল্পলোক আপন হাতে গড়ে নিলেন।

শিল্পী যামিনী রায়ের ছোট বড় নানান ছবি আমি দেখেছি, জীব-জন্তু, মাঙ্গলিক শিল্প, খ্রীষ্টীয় শিল্প প্রভৃতি নানান বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক ছবি তিনি

এঁকেছেন। টুকরো টুকরো ফ্ল্যাট রং আর মোটা রেখায় তা সমুজ্জ্বল। রঙে রেখায় কম্পোজিসন গম্-গম্ করছে সুদৃঢ় প্যাটার্ণ এর বাঁধনে।

কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে একদিন বাগবাজারে সারদা দাস মহাশয়ের গৃহে একসঙ্গে যামিনী রায়ের অনেকগুলি ছবি দেখে শিল্পী যামিনী রায়কে আমি যেন আরও বড় করে দেখতে পেলাম। বুঝলাম আগে তাঁকে যথার্থ চেনা হয়নি। ফোক-আর্ট তাঁর হাতে চর্চায়, চর্যায় শালীনতায় নিজস্বতায় ক্ল্যাসিক আর্টের গাম্ভীর্যে ও মর্যাদায় মহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগে যামিনী রায়ের শিল্প ভারতীয় শিল্পের এক পরম বিস্তার। তিনি আমাদের অমর শিল্পীদের একজন।
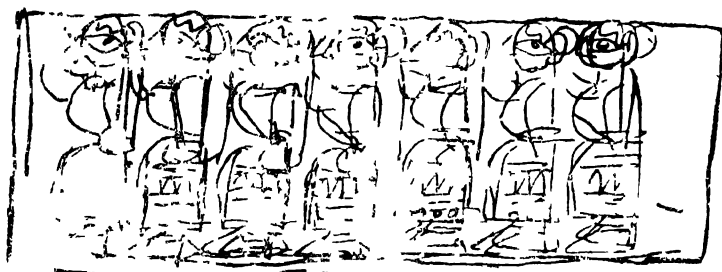
শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁকে আবার প্রণাম করি। এই প্রসঙ্গে তাঁকে আমি যে কয়েকবার দেখেছি তার মধ্যে ছোট দুটো ঘটনার উল্লেখ করব। শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর একটা মত আমি শুনেছিলাম, নবীন শিল্পীরাও সেটা শুনুক। ১৯৪৫ সালে নেপাল থেকে কাজ সেরে কলকাতায় ফিরেছি। আমার পিতৃব্যদেবের কোন একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলাম বাগবাজারে অমৃতবাজার প্রেসের গলিতে যামিনী রায়ের বাড়িতে। তিনি একতলার ঘরে বসে ছিলেন। দেখলাম আড়াই ফুট মত উঁচু তারের উপর এক্সিবিশনের মত পাশাপাশি ছবি সাজান। সে ছবিগুলি কিন্তু তাঁর পটের ঢঙে নয়। ইম্প্রেশনিষ্ট কায়দায় কাগজের পর চড়া টেম্পারা রঙ দিয়ে আঁকা ল্যান্ডস্কেপের সারি। ঘরে কয়েকটা জালায় আলপনা আঁকা ছিল।

তাঁর কাছে যাব বলে আমার মূর্তির কিছু ফটো নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি দেব-দেবী বা কল্পনার মূর্তি গড়েছি ভারতীয় ঢঙে, আর রিয়ালিষ্টিক মূর্তি গড়েছি ইংরাজি শিক্ষায়। দুই ঢঙের কাজের দুখানা ফটো দুহাতে তুলে ধরলেন। খুশি হয়ে বললেন— "হয় এটা আগে শিখে পরে ওটা শেখ। না হয় ওটা আগে শিখে এটা পরে শেখ। এখনকার দিনের আর্টিষ্টদের দুটোই শিখতে হবে।"

আর একবার যামিনী বাবুকে দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের সামনে। এক সময় "রূপযানী" নামে উত্তর কলকাতায় শিল্পীদের একটা সংঘ গড়েছিলাম আমরা। অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব পালন করেছিলাম ঘটা করে ১৯৪৮ সালে বরাহনগরে "গুপ্তনিবাসে"। অনেক বড়বড় মানুষ, অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অতুল বসু, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাতে। যামিনীবাবুও গিয়েছিলেন।

স্থবির অবনীন্দ্রনাথ প্রবীণ যামিনী রায়কে দেখে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন "তুমিও এসেছ।" কি স্নেহ, কি প্রীতি অনুভব করেছিলাম এই ছোট দুটি কথায়।

পূর্ণ চক্রবর্তী

যামিনীদা

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে যামিনীদার স্মৃতিচারণ আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

যামিনীদার জন্ম ১৮৮৭ সালে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯০৩ সালে। ছিলেন ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তের বছর। ছাত্র থাকাকালীন তাঁর ক্লাশওয়ার্ক ছিল খুব উঁচু মানের। এত ভাল যে আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পার্শী ব্রাউন সাহেব কোন পরীক্ষা না নিয়েই এই ছাত্রটিকে যে কোন ক্লাশে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যখন তখন যে কোন ক্লাশে, এমনকি দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরেও কাজ করার সুযোগ ব্রাউন সাহেব যামিনীদাকে দিয়েছিলেন।

তাঁর আঁকা বহু রঙা দু একটি ছবি আর্টস্কুলের লাইফ স্টাডি ক্লাশে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৯২১ সালে আমি আর্টস্কুলে ভর্তি হয়ে ঐ সব ছবি অবাক বিস্ময়ে দেখতাম।

তখন চিত্রকরদের জীবন ছিল দুঃখের। কারণ ছবির বিক্রী প্রায় হতই না বললে চলে। সব জেনে শুনেই যামিনীদা শিল্পীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁকে জীবনে অনেক কষ্টভোগ করতে হয়েছিল।

সেইসময়ে বটতলা ছিল পুস্তক প্রকাশনার কেন্দ্রস্থল। কাঠের ব্লকে বইয়ে ইলাস্ট্রেশান ছাপা হত। যামিনীদা উডকাঠের জন্যে ড্রইং ও সাদা কালো ছবিকে রঙিন করার কাজও করতেন। এমব্রয়ডারি ও শাড়ির পাড়ের ডিজাইন এবং অলংকারের জন্যেও নকশা আঁকতেন অত্যন্ত অল্প সম্মান দক্ষিণার বিনিময়ে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তিনি থিয়েটারে সীন আঁকার কাজে ব্রতী ছিলেন।

তখন আমাদের শিল্পে দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের উদয় হয়েছিল। একদিকে অবনীন্দ্রনাথ অনুকৃত ওরিয়েণ্টাল আর্টের ভক্তদের মধ্যে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং আরও অনেকে। অন্যদিকে ওয়েষ্টার্ণ স্কুল অব রিয়েলিষ্টিক আর্টের অনুসরণকারীদের পুরোভাগে ছিলেন যামিনী রায়, অতুল বসু, হেমেন মজুমদার, সতীশ সিংহ, প্রহ্লাদ কর্মকার প্রভৃতি। ও. সি. গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'রূপম' পত্রিকায় ওরিয়েণ্টাল আর্টের অনুগামীদের কথাই বেশি প্রকাশিত হত। আর হেমেন মজুমদার সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান আকাডেমি অব আর্ট' জার্ণালে ওয়েষ্টার্ণ আর্টপন্থীদের নিয়েই বেশি লেখালেখি হত। সত্যজিৎ রায়ের পিতা প্রয়াত সুকুমার রায় ছিলেন এই দলের সঙ্গে। তিনি এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ইউ রায় এ্যণ্ড সন্স' থেকে অত্যন্ত সস্তায় হাফটোন ও লাইন ব্লক তৈরি করিয়ে দিতেন। এই পত্রিকায় যামিনীদার অনেক ভাল ভাল ছবি ছাপা হয়েছিল। তারমধ্যে একটির কথা মনে পড়ছে লাল পেড়ে শাড়ি পরে এক গৃহিণী তুলসী তলায় সাঁঝের প্রদীপ জ্বালছে।

অবনীন্দ্রনাথের লেখা একটি প্রবন্ধের একটি লাইন যামিনীদাকে দারুণভাবে স্পন্দিত করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আমাদের শিল্প চিন্তায় ভারতীয়ত্বের ছাপ থাকা একান্ত দরকার। এই কথা যামিনীদাকে দারুণ ভাবিয়েছিল। তিনি ফিরে যান বেলিয়াতোড়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে। কিছুকাল পর ফিরে আসেন কলকাতায় ছবির এক নতুন রূপকল্প ও আঙ্গিক নিয়ে। সেই

সময়ের ছবির মধ্যে বেশ কয়েকটি আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন এক সাঁওতাল মা তার ছেলেকে বটবৃক্ষের কাছে নত হতে শেখাচ্ছে, সাঁওতাল রমণী মাথায় ফুল গুঁজছে ; মাঠে গরু চরছে এবং এক সাঁওতাল বালক মনের আনন্দে গাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে, জীর্ণ বই বগলে গ্রামের পুরোহিত পথ চলেছে, লালফুলে রাঙানো পলাশ গাছের শাখায় বসে এক বৃদ্ধ শকুন, প্রভৃতি ছবি জীবন্ত এবং প্রাণময়। চৈনিক শিল্পীদের মত তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়ের প্রয়োজনীয় নির্যাসটুকু নিয়ে বাদবাকি বর্জন করেছেন। ছবির ভাষা সরল। বর্ণব্যবহার চমৎকার। ছবিতে এই ভাষা ও বর্ণসুষমা ছিল বাইজানটাইন পর্ব পর্যন্ত।

শিল্পরীতি বিবর্তনের শেষ দিকে যামিনীদা বাংলার পট শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রগাঢ় কম্পোজিসনের ধারণা, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ রঙের ব্যবহার এবং প্রশান্ত লালিত্যময় রূপকল্পনার মাধুর্যে যামিনী রায়ের ছবি প্রকৃতপক্ষে যেন এক নতুন শৈলীরূপে গড়ে ওঠে।

একের পর এক প্রদর্শনীতে ছবি উচ্চপ্রশংসিত হতে থাকে। তখন চারদিকে যুদ্ধের দামামা বাজছে। কলকাতা আমেরিকান সৈনিকে ভরে গেছে। এঁরা ছিলেন ভারতীয় শিল্পের প্রতি খুবই আগ্রহশীল। এঁদের কাছেই যামিনী রায়ের ছবি হট কেকের মত বিক্রী হয় যায়।

বাংলার গভরনর মিঃ কে. সি. যামিনী রায়ের বাগবাজারের ছোট ভাড়াবাড়ির ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন। গভরনরের মেয়ে যামিনীদার কাছে আসতেন ছবি

আঁকা শিখতে। এই সময়ে বোম্বে মাদ্রাজ এবং দিল্লীতে যামিনীদার দু দুটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। সমস্ত ছবিই বিক্রী হয়ে যায় এক নিঃশ্বাসে।

সারাজীবন ধরে অশেষ ক্লেশ ও আত্মত্যাগের পর যামিনীদার সৃষ্টিসম্ভার স্বতস্ফূর্তভাবে সমাদৃত হয়। ১৯৫৪ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৫৬তে ললিতকলা আকাডেমির ফেলো নির্বাচিত এবং ১৯৬৭তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি প্রদান, যামিনীদার শিল্পী জীবনের সাফল্যের দু একটি দৃষ্টান্তমাত্র।

১৯৭২ সালে ৮৫ বছর বয়সে যামিনীদা রঙ তুলি পেড়ে চিরতরে চলে যান।

কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক
ও শিল্প সমালোচকদের
দৃষ্টিতে
যামিনী রায়ের ছাব

শাহীদ সুরাবর্দী

যামিনী রায়ের শিল্প

ভারতীয় প্রাচ্যশিল্প সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 'সমবায় ম্যানসনে' যামিনী রায়ের কাজের প্রদর্শনী, আধুনিক ভারতীয় শিল্প জগতে এক প্রথম শ্রেণীভুক্ত ঘটনা বলেই বিবেচিত হ'বে। সম্প্রতি তাঁর আঁকা কিছু ছবি কলকাতার কয়েকটি প্রদর্শনীতে দেখা গেল কিন্তু বহু মাঝারি ছবির ভিড়ে সেগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। এমনকি যারা তাঁর ক্ষমতার মুগ্ধপ্রশংসা করেন, তাঁদের পক্ষেও এসব ছবির পুরোপুরি মর্ম উপলব্ধি করা খুবই শক্ত হয়ে পড়েছিল বিশেষতঃ তাঁব বাগবাজারে সুন্দর বাড়ীটিতে যাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, লব্ধ বিদ্যার নিয়ন্ত্রণে নির্মান কৌশল সংক্রান্ত উদ্দেশে নিয়োজিত চিত্রাঙ্কনের উপযুক্ত পরিবেশে তাঁর বড়বড় ছবিগুলি তাঁরা দেখেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে কেউ পুনরীক্ষণ করে নিতে পারেন, তাঁর অগ্রগতির পৃথক স্তর গুলিকে অনুসরণ করতে পারেন এবং সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন তাঁর শিল্পের প্রতি গভীর আগ্রহকে, যা তাঁকে পূর্ব থেকে উত্তর কালে বিশিষ্ট করেছিল। খুব কম মানুষই তাঁর শিল্পীজীবনের উত্থানপতনের কথা জানে। ভারতের আর কোনো শিল্পী এত গভীর নিঃসঙ্গতায় জীবন যাপন করেননি। অনেক পরে, বেশ বয়েসকালে তাঁর খ্যাতি আসে। সংগ্রামের সেই পর্বে কোনো পৃষ্ঠপোষকতাই তাঁর পথের সামনে এসে দাঁড়ায়নি। বহু বছর তাঁকে মনে করা হয়েছিল তিনি শিল্পে এক বাঁক, বাংলার শিল্প ঐতিহ্য পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক, মৌলিক চিন্তা সামর্থে ব্যর্থ এক বিদ্রোহী। এই অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি ছিল না তার কারণ তাঁর শিল্প জীবন ছিল অস্বাভাবিক পথ পরিগ্রহে পূর্ণ। তিনি এক সময়ে বাংলা ঘরাণার অপর শিল্পীদের মতই দুর্বল রেখা ও ভাবপ্রবন

রং দিয়ে অনেক ছবি এঁকেছিলেন। একথাও খাঁটি সত্য যে তিনি রক্ষণশীল, অদম্যকঠোর, সংকীর্ণ, চরম, একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন এবং সেই কৌশলের আয়ত্তাধীন হয়ে তাঁর নিজস্ব শিল্প লক্ষ্যে পেঁছিতে চান। যে পথ তিনি অনুসরণ করেছেন সর্বযুগের, সর্বদেশের মহান শিল্পীরাই তা করেন এবং তার ফল হয়েছিল এই যে তিনি শিল্প কৌশলগত শ্রেষ্ঠত্বে অভিষ্ট হয়েছিলেন, ভারতের যে কোনো চিত্রকর, সবচেয়ে নামী বলে পরিচিত যাঁরা তিনি ছিলেন তাদের কাছেও অদ্বিতীয়।

একথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর কাজের প্রকৃতি সাধারণভাবে আবেদনকে ব্যাহত করে। তিনি যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা প্রশংসিত হতে পারেন না এবং তাঁর শিল্প জীবন ও মানবজীবনের সমগ্রগতি—প্রকৃতি জনপ্রিয় প্রশংসাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছে। সেই একই সময়ে তিনি সর্বদা শিল্প রসিকদের কাছে নন্দলাল বসুর নামের সঙ্গেই প্রশংসিত এবং আলোচিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি শিল্পীর চিত্রকর। তিনি সমকালীন রূপে অনেক বেশী প্রখ্যাত কারণ তাঁর কৌশল বৈচিত্র এবং তাঁর প্রেরণা সঞ্জাত সামগ্রিক সমন্বয় সাধারণ মানুষ ও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। নন্দলাল বসুর শিল্প আমাদের সাংস্কৃতিক আবেশের মুহূর্তকে প্রায়ই প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু যামিনী রায় সর্ব কালীন পটভূমিতে ছবি আঁকেন। তাঁর অভীষ্ট এত নির্ভীক ভাবে বিশুদ্ধ রূপকে অনুসরণ করে··· ·এই প্রদর্শনীর সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি অনুপম লক্ষ্যে পেঁছিনোর দিক নির্দেশ করছে। আমাদের কালের আর কোনো ভারতীয় শিল্পী, শিল্পের গোড়াকার সমস্যা সম্পর্কে এত গভীর চিন্তায় আছন্ন হননি। তাঁর কাজ প্রাসঙ্গিক বা শোভাবর্ধক বিরয়বস্তুর দিক থেকে একেবারে অসার। এই কারণেই তাঁর গুণমুগ্ধরা সর্বদা চিন্তা করেন জীবনে অন্তত একবার যেন মন্দির গাত্রে তাঁকে তাঁর নিজের নকশায় আঁকতে দেওয়া হ'ত কারণ কাজের মধ্যে তিনি অর্জন করেছেন শিল্পকৌশলের এক ব্যতিক্রমী ধারনা। অধুনা তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সরলতম রচনা পরিকল্পনায় যা রাজস্থানী চিত্রকরকে স্মরণ করায় এবং তাদেরই মত আবিষ্কার করেছেন অনমনীয় সম্ভাবনাকে নমনীয় রূপদান করতে। তাদের মত, বিশেষ মুহূর্তে তিনি সরলতম উপায়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং বিস্ময়কর লক্ষ্যে পেঁছেছেন।

যামিনী রায়ের প্রেরণা পুরোপুরি ভারতীয়। ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টের সব ছাত্রদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল তিনি তাঁর কৈশোরে ইয়োরোপীয় ভাবধারায় হাত পাকিয়ে ছিলেন। তাঁর রঙের ব্যবহার ছিল দুর্বল কিন্তু তাঁর প্রথম দিককার অনেক ছবির মধ্যেও রেখার ঋজুতায় তিনি ছিলেন নিশ্চিত যা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। স্বভাবতই ইয়োরোপের আধুনিক অন্দোলনে আরও অবগত হয়ে তিনি পিকাসোর দ্বারা প্রভাবিত হ'ন এবং তাঁর সেই সময়ের কিছু

ছবি পিকাসো এবং সার্ফিসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন তাঁরা প্রথাবন্ধ বিশ্বাসের আবর্তজনিত চমক থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চাইছিলেন এবং নিজেদের ক্ষমতাকে ধ্রুপদী আদর্শে গড়তে চাইছিলেন। অস্পষ্ট বাস্তববাদ যামিনী রায়ের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেইজন্য তিনি বাংলা ঘরাণার নকল জাপানী বাস্তববাদকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন। স্পষ্ট রেখা এবং সপ্রতিভ রঙ তিনি পছন্দ করতেন। তিনি কলকাতা ত্যাগ করে হঠাৎ বাংলার গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে শিল্পী না মনে করে চিত্রকরদের মাঝে বাস করেছিলেন। আমাদের বিখ্যাত অভিব্যক্তবাদী 'পট' অংকন করেছিলেন, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা একই অনুরূপতায় খাদমেশানো নকশা প্রস্তুত কৌশলবিদ্যার মত রং দিয়েই যায়। তিনি তাঁদের কাছ থেকে গোলাকার রেখা অংকনের গোপনীয়তাটুকু শিখেছিলেন, শিখেছিলেন অবয়বের সঙ্গে যুক্ত সমোন্নত রেখা অংকনে দ্রুতধাবিত তুলির টান।
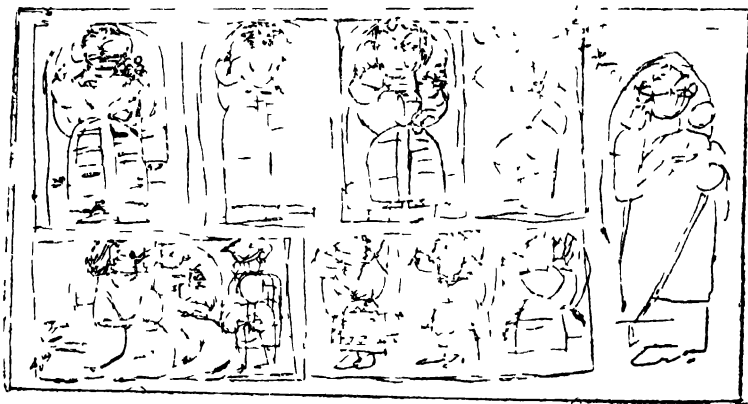
এই প্রদর্শনীর অনেক কাজ তাঁর এই কৌশলেই করা। কোন মুহূর্তে তিনি উল্লম্ব রেখা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে সরে গেলেও আবার এখানেই ফিরে এসেছেন কারণ এটি ছিল তাঁর কাছে মানুষের অবয়ব অংকনের একমাত্র সন্তোষজনক উপায়। আপাতদৃষ্টিতে যেটি বাংলার পোটোদের কাছ থেকে আহরণ করা, তুলির উত্তরমুখী গোলাকার এই টান, ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে হয়ে উঠল এক চমকপ্রদ অধ্যায়। আমাদের মধ্যযুগের অবয়বগত বিষয় বস্তুর সুসমঞ্জস পরিপূরক বলে মনে হ'ল। ঐ দোহাড়ী ঘরাণার লোকশিল্পে, আকর্ষণীয় ছবির শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় অবদান বলে পরিগণিত হয়েছে। সেই থেকে যামিনী রায় যে নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে আমাদের লোক এবং ঐতিহাসিক নক্সা প্রস্তুত করার বিদ্যায় মৌলিকতার পথে সংগ্রাম চালিয়ে

যাচ্ছিলেন তার জন্যে তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। ঐতিহ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর কাজের যে সৃষ্টিমূলক সত্ত্বা, তা স্বাধীনতা ও প্রাণশক্তিতে বিশিষ্ট। 'পুত্রের সেতুপার সাহায্যকারী মা' ছবিটি তার একটি উদাহরণ, (যেটি এখন মহারাজা ঠাকুরের মালিকানায় আছে) যেটি ১৯৩৫ সালে সর্বভারতীয় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে সকল বিচারকের ঐক্যমত্যে শ্রেষ্ঠ বলে পুরস্কৃত হয়েছিল। দৃশ্যটি ছিল পুরোপুরি বাংলা আর বিষয়টি ছিল আবেগমথিত। কিন্তু শিল্পীর স্পষ্ট কৌণিক রেখাগুলির ব্যবহার এবং সহজ রং প্রদান বাংলার কোমলতাকে বেশী করে ফুটিয়ে তুলেছিল। যেখানে বাংলা ঘরাণার অনুসরণকারীরা এই প্রদেশের সাধারণ জীবনের ছবি অংকনে ছিলেন নিষ্প্রভ। যাই হোক, ছবির অঙ্গ বিন্যাসে এবং দৃঢ় সংস্থাপনে তাঁর বড় দেয়াল ছবিগুলিতে সবচেয়ে ভালভাবে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়। শুধু যে কব্জির মোচড় না দিয়েই ছবিগুলি ভালো তাই নয় তাঁর উদ্দেশ্যের পক্ষে রংএর ব্যবহারও সঠিক এবং নিখুঁত। মানুষের অবয়ব নিয়ে এই ছবিগুলি যেন আমাদের শ্রেষ্ঠ লোকশিল্প ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সারকথা। কাজটি প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তিতে প্রাচুর্যময় তাই এগুলি বর্ণনা করা ভুল হবে, যেটা অলংকরণ শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রায়ই করা হয়। বিস্ময়কর এই ছবিগুলির ক্ষেত্রে হয়ত অলংকরণের উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু এগুলি সত্যি খাঁটি উপলব্ধি থেকে এসেছে, যা শৃংখলাপরায়ণ শিল্পচেতনা সমৃদ্ধ এবং শিল্পীর উচ্চদায়িত্ব বোধ সঞ্জাত। এই ছবিগুলিতে আয়তনের এমন ত্রৈমাত্রিক ব্যবহার ঘটিয়েছেন যাতে মনে হয়েছে নমনীয়তার ওপরে শিল্পীর দারুণ দখল আছে। এবং এতদসত্ত্বেও অবয়বগুলিকে ছবির শ্রেণীতেই ফেলতে হবে স্থাপত্যের শ্রেণীতে নয়। কম মাপের শিল্পীদের পক্ষে যেটা করে ফেলবার লোভ, সামলানো খুবই শক্ত হয়। তাঁর খাড়া অবয়বওয়ালা ছবিগুলিতে প্রাচীন মিশরের স্পষ্ট উপাদান আছে। যাই হোক, 'চার নারী'র ছবিতে, যে রচনার উপাদান তিনি প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন, যেখানে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর নিখুঁত ছন্দ যা প্রথম মনুষ্যসৃষ্ট রচনার মধ্যেও যেমন আছে, তেমনি 'নবজন্ম'কালের গৃহনির্মাণগত সৌষ্ঠবেও আছে। তিনি খুব কম বর্ণময় অলংকরণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, সামান্য যা করেছেন তা সহজ নির্মাণকৌশলগত উপাদানে অথবা অবয়ব অংকনের বাঁধনে এবং তিনি সহজেই তাঁর সমসাময়িক যাঁরা অপর্যাপ্ত পুঙ্খানুপুঙ্খতায় সমগ্র ছবির অবয়বী একতাকে নষ্ট করেছেন তাঁদের থেকে পৃথক বলে গণ্য হয়েছেন। এই বর্তমান মুহূর্তে যখন প্রায় সব ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নিরন্তর পরিবর্তনের দিকে ধাবমান সেই সময় যামিনী রায়ের এই সুষম অবয়বের ব্যবহার অতীব অর্থপূর্ণ। তাঁর প্রভাব আজকের এই রক্তহীন ছবির শরীরে স্বাস্থ্য এনে দেবে। যদি তিনি আরো ক্ষমতাবান তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর

জিদ-এর, জনপ্রিয়তার প্রতি অবজ্ঞার, শিল্পের প্রতি প্রয়োজনীয় তৃষ্ণার প্রাচুর্যের, ঐতিহ্যানুসারী সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার জাগরণের এবং সর্বোপরি অবয়ব ও রঙের ওপরে তাঁর কৌশলগত প্রভুত্বের সংযোগ ঘটাতে পারেন তবে এই প্রদর্শনী এক অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল করবে।

ভাষান্তর : সৌম্যেন্দু ঘোষ
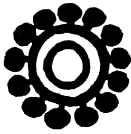
মুলকরাজ আনন্দ

শিল্পীর সমস্যা সংগ্রাম ও সাফল্য

আমার মনে হয়, যেরকম আগ্রহের সঙ্গে আজকাল এদেশে শিল্পী, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি এবং জীবনের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে শিল্পের অবস্থান পুনর্মূল্যায়ণ করা হচ্ছে, বিশ্বের খুব কম দেশেই তার তুলনা মিলবে। এই যে এত সম্মেলন, সেমিনার, সুদীর্ঘ আলোচনাচক্র, ললিতকলার বার্ষিক পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী (যে হয়তো প্রায়শই ক্লান্তিকর, প্যানপেনে জগাখিচুড়ি ও একঘেয়ে), এই সবই দেখিয়ে দেয় যে আমরা একটা জটিল আবর্তে জড়িয়ে আছি এবং শিল্পসৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সেই আবর্তটিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। কেননা, অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রের মতো শিল্পের জগতেও আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীর ঐতিহ্য থেকে শুরু করে সাবেক লৌকিক ঐতিহ্য পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল যুগসঞ্চিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যটি শেষ হয়ে যায়, আর লৌকিক ঐতিহ্যটি ভেঙে পড়ে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় প্রভাবের চাপে। 'সভ্যতা'র শক্তিগুলি আমাদের জীবনের ওপর সূক্ষ্ম-সংস্কৃতির ছদ্ম আবরণ বিছিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় গ্রামসমাজের লোকাচারগত প্রয়োজনগুলি অধিকাংশ মানুষকে কলাকৃতির কাছাকাছি ধরে রেখেছিল। কিন্তু সমাজে উত্তরোত্তর নতুন নতুন গোষ্ঠী ও ধাঁচের উদ্ভব ও বিকাশ সাবেক শিল্পশৈলীগুলি নষ্ট করে দিতে থাকে। যৎসামান্য যা কোনওক্রমে টিকে থাকে, তাকে পুরনো প্রকৌশলের অবশেষ বলা যায়, যাকে নতুন করে আত্মীকৃত করতে হলে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তোলা দরকার। যেমন, সেই লোককলার সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করতে হবে এবং দেখতে হবে, একজন শিল্পী কীভাবে তাঁর

নিজের এবং তাঁর উদ্দিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর স্বভাবকে ওই প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম করেন। সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে, কোনও বিশেষ শিল্পকর্ম কতদূর অবধি শিল্পীর ব্যক্তিগত অবচেতনের প্রকাশ। দেখতে হবে, তাঁর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ, তাঁর নিজের ও তাঁর দর্শকদের পশ্চাৎপট ও বিকাশের সাযুজ্য কতদূর প্ররোচিত করেছে সেই নির্ভরযোগ্য উচ্চারণকে, যা সমাজের নানা স্তরকে অনুরণিত করে এবং সেই শিল্পকর্মটি 'মাস্টারপিস' বলে স্বীকৃত হয়। এছাড়াও অনেক প্রশ্ন আছে। যথা : একজন শিল্পীর অনুপ্রেরণা প্রকৌশল ও প্রভাবের বাস্তব উৎস কী? কোনও বিশেষ শৈলী কতদূর পর্যন্ত সেই জনসম্প্রদায়ের কাঠামো থেকে উদ্ভূত, যার একজন সদস্য শিল্পী নিজেই? এবং যদি চলতি সামাজিক ও নান্দনিক সম্পর্কগুলি অপর্যাপ্ত ও খণ্ডিত হয়, তাহলে কীভাবে সেগুলির পরিবর্তন ঘটানো যায়? ইত্যাদি। যামিনী রায়ের মতো একজন শিল্পীর পর্যালোচনা করতে গেলে এই প্রশ্নগুলো উঠবেই। কারণ, তিনি নিজে যদি সচেতনভাবে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন নাও করে থাকেন, একজন শিল্পীর পক্ষে যেভাবে সম্ভব, সেভাবেই তিনি অনেকগুলি প্রশ্নের সমাধান করে গেছেন—ছবি এঁকে। তাঁর চিত্রমালায় সমসাময়িক ভারতের যাবতীয় সংঘাতই শুধু প্রতিফলিত হয়নি, বিকাশের এক সম্পূর্ণ নতুন যুগেরও তিনিই অগ্রদূত।

যামিনী রায়কে আমি প্রথম দেখি তাঁর পুরনো বন্ধু কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে। খদ্দরে মোড়া বলিষ্ঠ চেহারা, সুস্মিত সুডৌল গোলাকার মুখ, কাঁচা পাকা চুল নম্র বাঙালি চোখ—এই সহজ সাধারণ ভণিতাবর্জিত মানুষটিকে আমার নোংরা ও কসমোপলিটন কলকাতার হতাশাগ্রস্ত ও ভঙ্গিসর্বস্ব শিল্পী ও লেখকদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রিটের এক প্রদর্শনীতে (১৯৩৮) তিনি যেসব ছবি রাখতে চান, সেরকম কয়েকটি ক্যানভাস দেখিয়ে যামিনী রায় চলে গেলেন। আমার চোখ-মুখের অভিভূত ভাব লক্ষ্য করে সুধীন আমাকে শিল্পীর জীবনের কিছু কথা বললেন। সাবেক পূর্ববাংলার ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারের সন্তান যামিনী ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টের চলতি ঐতিহ্যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। সেসময় ক্যালকাটা স্কুল ছিল অজন্তা ও বাঘ গুম্ফার দেওয়াল-চিত্রের মোটিফ পুনরুজ্জীবিত করে শুরু হওয়া এক বেগবান শিল্প আন্দোলন। কিন্তু ক্যালকাটা স্কুলের শিল্পীরা যেভাবে ভুরু ও নখকে অযথা দীর্ঘায়িত করে চলেছিলেন, যামিনী সেই অনুকরণপ্রিয়তায় যেতে চাইলেন না। তিনি তখন নতুন ফর্ম-এর অন্বেষণ করছেন।

কিছুকাল যামিনী ছিলেন চলতি হাওয়ার পন্থী। তারপর তিনি ভ্যান গব ও ইউরোপীয় চিত্রকরদের প্রভাবে পড়েন। কিন্তু একদিন সহসা তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেন এবং ফিরে গেলেন তাঁর নিজের গ্রামের লোকায়ত

ঐতিহ্যের আশ্রয়ে। এবং গড়ে তুললেন সেই অসামান্য সমৃদ্ধ, ইন্দ্রিয়গত, সঙ্গীতময় শিল্প, যাকে তাঁর কোনও কোনও সমালোচক আখ্যা দিয়েছেন—'আধুনিক আদিমতা'।

আদিমতা বলতে ঠিক কী বোঝায়? নিশ্চয়ই এর মানে দেশজ উৎসের পথে অভিসার নয়, যদিও দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালের যেসব প্রথিতযশা শিল্পী নিগ্রো ভাস্কর্য বা জাভার মুখোস অনুকরণ করতেন, তাঁরা সেটাই ভাবতেন। আফ্রিকান বা অন্য লোকায়ত রূপে যে আদিম শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, তা মোটেই জটিলতামুক্ত প্রকৌশল বা সহজিয়া আবেগের ব্যাপার নয়। 'আদিম' শব্দটির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কল্পনার এমনই এক অবস্থা বোঝায় যেখানে প্রকৃতি মানুষ বা নিয়তির অনির্দেশ্য সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে শংকা ও ত্রাস, যাকে প্রশমিত করতে হয় প্রার্থনা দিয়ে, জাদুকরী সূত্র উদ্ভাবন করে। বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ কল্পনার সেই স্তর থেকে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি, যদিও ইউরোপীয় অরণ্যের আতংক ও বিভ্রম তার দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়েছে। তবু, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পরূপগুলির যে অবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে তার রঙে রসে গন্ধে মানুষ নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। যেসব পরিবর্তন এক অবোধ শিশুকে আত্মসচেতন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত করে, সেগুলি আয়ত্ত করার কঠিন প্রয়াস স্বভাবতই শিশুর সহজাত দৃষ্টিভঙ্গীর জাদুকে আধুনিক শিল্পকলার এক নতুন সূচনাবিন্দুতে রূপান্তরিত করেছে।

আপাতদৃষ্টিতে কেতাদুরস্ত, চিত্রাংকনের জগৎ থেকে লোকায়ত ঐতিহ্যের জগতে কোনও মধ্যবিত্ত বাঙালি শিল্পীর প্রত্যাবর্তনকে আদিমতার অভিসার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিষ্ণু দে এবং জন আরউইন, উভয়েই যথার্থভাবে দেখিয়েছেন, সমসাময়িক ইউরোপীয় চিত্রকরদের আলতামিরার গুহায় ফেরা এবং যামিনী রায়ের লোকায়ত ঐতিহ্যে ফেরার মধ্যে তফাৎ আছে। এঁদের মতে, যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, যামিনী রায় কোনও বহিরাগতের দৃষ্টি দিয়ে লোকশিল্পকে দেখেননি। বরং লোক সংস্কৃতির শিকড় যে জনমণ্ডলীর মধ্যে, তাদের জীবন্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও উপলব্ধি ছিল আপনজনের। তাঁদের মতে, সাযুজ্য ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার খোঁজে যামিনী রায়কে গগ্যাঁর মতো দূরান্বেষী হতে হয়নি, একটি অখণ্ড শিল্পদৃষ্টির অধিকারী হতে গিয়ে মাতিসের চিত্রকলাও তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়নি কেননা, তাঁর প্রত্যাবর্তন ছিল তাঁর উত্তরাধিকারের উৎসে, তার সুসঙ্গত ও সুসংহত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে, যার পুরাণ ও কিংবদন্তীকে, যার মৌলিক গঠন ও প্রাথমিক রঙকে তিনি সহজাত অধিকারের মতো আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন।

একই সঙ্গে একথাও স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন (উল্লেখিত দুই আলোচকও যেকথা স্বীকার করেছেন) যে, যামিনী রায়কে তাঁর নিজের বিচিত্র লড়াইও

লড়তে হয়েছিল। কেননা তিনি শুধু বাইরের অবয়বকে অনুকরণ করে, নকশার গভীরতাকে সমতল করে বা নিছক লোকচিত্রকলাকে পুনরুজ্জীবিত করেই তুষ্ট ছিলেন না, তিনি চেয়েছিলেন নষ্ট পরমায়ু গ্রাম্য ঐতিহ্যের মূল উপাদান এক নতুন অগ্রগামী চিত্রকলার সৃষ্টি করতে। এই রূপান্তর অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙনের ফলে এবং আধুনিক সমন্বয় ও সংশ্লেষণের পথে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বাধাগুলির জন্য। কারণ, এই রূপান্তর সার্থক করতে হলে একজন আত্মসচেতন শিল্পীকে যেমন প্রাচীন জাদু-করের সজীব সংবেদনশীলতা নিজের মধ্যে সংরক্ষিত রাখতে হয়, তেমনই আত্মস্থ করতে হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফলগুলি। এবং ভারতে যেহেতু নানা স্তরের সভ্যতার অবশেষগুলোর সংঘাত চলছে, তাই সেই পটভূমিতে ক্ষুধা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার যন্ত্রণা ও নানা মনস্তাত্ত্বিক নৈরাজ্যের অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নকে জয় করে নিজের দৃষ্টি ও দর্শনকে মেলে ধরার প্রয়াসই হয়ে ওঠে এক বীবোচিত চিত্ররূপময় শিল্পকলা, অব্যবহিত স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের তুলনায় যার সংযোগ অনেক পরোক্ষ, কিন্তু অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও গভীর।

যে অদম্য প্রবৃত্তি নিয়ে যামিনী রায় গ্রামের আদিম অনুপ্রেরণার উৎসে ফিরে গিয়েছিলেন, শুধু সেটাই তাঁকে শ্রদ্ধাভাজন করেনি। কেননা, অজ্ঞাত বা লুপ্ত শিল্পকলার প্রতি আগ্রহাতিশয্যের মধ্যে প্রায়শই নিহিত থাকে এক ধরনের শস্ত আবেগপ্রবণতা। তাঁর গুরুত্ব বরং এখানে যে, তিনি প্রতিবেশের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যেমন, তেমনই সহজাত উত্তরাধিকারের মধ্যেই উৎকর্ষের সন্ধান করেছিলেন

এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে শিল্পী সেই সহজলভ্য উৎকর্ষের উপাদান-গুলির রূপান্তর ঘটান। তাঁর মধ্যবিত্ত জীবন ও অভিজ্ঞতায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা রকমারি সংঘাত ও টানাপোড়েনের মধ্যে, একই সঙ্গে সমসাময়িক ভারতের যাবতীয় প্রশ্নের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেও নিজের মনোযোগ একটি অবিভাজ্য বিন্দুতে অবিচলভাবে কেন্দ্রীভূত রাখতে তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, শিল্পী হিসাবে সেটাও তাঁর অনবদ্য গুরুত্ব প্রমাণ করে।

এখন বাঙালির লোকায়ত ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি কী, দেখা যাক। লৌকিক সংস্কৃতি প্রধানত দুটি ধারার সংঘাত—ভারতের আদি বাসিন্দা নব্যপ্রস্তর যুগের দ্রাবিড়দের দেবতায় স্তনর আরোপকারী বিশ্বাসসমূহ এবং প্রথম আক্রমণকারী আর্যদের অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত কাব্যময়তা। অধিকাংশ যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে যা ঘটে, বিজিতদের সংস্কৃতি এখানেও বিজেতার ওপর মধুর প্রতিশোধ নেয়। যার ফলস্বরূপ বৃক্ষ পুজো সর্পদেবতা প্রাণীপুজো, পরী, প্রেত ইত্যাদি সহ দেশজ প্রকৃতি-পুরাণ ও রহস্যময় জাদুবিদ্যা ব্যাপকভাবে বিজেতার সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ে। কিন্তু রাজসভার ধ্রুপদী সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী বিদ্রোহের উত্থানের পরই জটিল লৌকিক আচারগুলি আধিপত্যের অবস্থানে চলে আসে। শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের লয় এবং বিভিন্ন মতের লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় বৈদিক ধর্মের ভাঙন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের গতিশীল প্রবাহের অভিঘাতে ত্বরান্বিত হয়। আর এইভাবেই হিন্দুধর্মের তিনটি মধ্যযুগীয় স্তম্ভ উঠে আসে—উত্তরভারত বিষ্ণুর উপাসনা, দক্ষিণ ভারতে স্রষ্টা পালক ও বিনাশকরূপী ঈশ্বর শিবের আরাধনা এবং পূর্বভারতে মাতৃকারূপী ঈশ্বরী শক্তির উপসনা। সর্বশেষ এই ধর্মানুগামীরাই ছিলেন সেইসব উদ্ভট যৌগিক আচারের আধার যেগুলিকে স্যার জন উডরফ তাঁর তন্ত্রসাহিত্যের অনুবাদগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন লৌহযুগের ভবিষ্যতবাদী রহস্য উদ্ঘাটনমূলক দর্শনের প্রকাশ হিসেবে। এই যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে পুজোচারের যে মনস্তত্ত্ব নিহিত আছে, সেটাই বাংলার নিরবচ্ছিন্ন লোক শিল্পচর্চার প্রধান উৎস। উদ্দীপ্ত নৃত্যলাস্য, সুর ও সঙ্গীতের ছন্দ ও তাল, নদীপুজো, সর্পপুজো, মাতৃকাদেবীর রকমারি প্রকারভেদ—এসবই রক্ষণশীল মনোভাবের ওপর লৌকিক কল্পনার গোপন বিজয়ের নিশান। যামিনী রায় যেখানে জন্মে ছিলেন, সেই বাঁকুড়া জেলায় বিদ্রোহ ও আত্মীকরণের প্রক্রিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত তীব্র। তাঁর জন্মগ্রাম বেলিয়াতোড় রেলওয়ে ও মোটরগাড়ির এই যুগেও সাবেক যুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় অর্থনীতি ধরে রেখেছিল। গোষ্ঠীজীবন সেখানে ঘন বুনোটে বাঁধা ছিল গোষ্ঠী-আচারের সঙ্গে এবং বাইরের পৃথিবীর সংস্পর্শ তাকে পাল্টাতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটে একজন লোকশিল্পীর অবস্থান কেমন হবে, তার বর্ণনা করা যায় গ্রিক নাট্যকার ইসকাইলাসের একটি বচনে—'আত্মার চোখে নিদ্রাতুর হলেই জ্বলজ্বল করে ওঠে, জাগরণে থাকে সুপ্ত'। গ্রাম্য কারিগর নিশ্চয় কোনও আত্মসচেতন শিল্পী নন। নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি কেবল তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন লৌকিক কল্পনা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে এবং প্রাথমিক রঙ ও নকশা সম্পর্কে, বাসনপত্র, খেলনা, ছাপা-কাপড়, পুতুল, পট, নামাবলী ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের প্রচলিত আকৃতি সম্পর্কে সম্প্রদায়ের রুচিকে প্রকাশ করেন।

শৈশবে যামিনী রায় তাঁর নিজের গ্রামে দক্ষ কারিগরদের কাজ করতে দেখেছেন। এবং সামাজিক ও শ্রেণীগত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হস্তশিল্পীদের কাজের প্রতি শিশুর সহজাত আগ্রহ থেকে তিনি তাদের বিষয়বস্তু ও নকশার আদল অনুকরণ করতে শুরু করেন। ছেলের আগ্রহ ও ঝোঁক দেখে তাঁর বাবা, একজন খুদে জমিদারের মর্যাদার পক্ষে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক, তাই করলেন— ছেলেকে সোজা কলকাতার গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট-এ পাঠিয়ে দিলেন। নির্বোধ পাঠ্যসূচি এবং ইউরোপীয় কেতার প্রবাহে বছর তিরিশেক কাটিয়ে দেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত যামিনী রায় যখন আবার লৌকিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর পক্ষে মোটেই অসুবিধে হয়নি সেই চৈতন্য নতুন করে অর্জন করতে, যার প্রেরণায় যে কোনও উৎসবে এক পরিবারের ভক্তরা প্রত্যেকে একটি করে রেখার আঁচড় দিয়ে যৌথভাবে একটি চিত্র রচনা করে। এই সমষ্টিগত অঙ্কনের নামই 'পট'; এবং সেই পটের মধ্যে দিয়ে তিনি অন্বেষণ করলেন ভাস্তনাদের পুরাণ।

আপাতদৃষ্টিতে শিল্প প্রশিক্ষণ স্কুলের শ্বাসরোধকর নিয়মকানুনের বেষ্টনী ভেঙে বের হওয়ার এই প্রয়াস মাতিসে ও ডেরেনের কথা মনে পড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল একটা রীতিমতো বিপ্লব। কারণ, যামিনী রায় ছবিতে শুধু গ্রামীণ হস্তশিল্পীর মানসিকতাই আরোপ করেননি, সেই সঙ্গে সচেতনভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন রেখাঙ্কনের গুণমানের মর্যাদা, যা ভারতীয় চিত্রকলারই বৈশিষ্ট্য এবং যা ছন্দ আয়ত্ত করার শত শত বছরের নিরলস প্রয়াসেরই ফল। সংগঠনা ভারসাম্য, অনুপাত—এসবও যামিনী রায় লৌকিক ঐতিহ্য থেকেই আহরণ করেন। কিন্তু এই সব কিছুই তিনি এমনভাবে রূপান্তরিত করেন, যেভাবে একজন আবেগপ্রবণ বিজ্ঞানী ব্যাপারটি ঘটাবেন। তিনি অন্বয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তোলেন এবং কম গুরুত্বের লক্ষণগুলিকে নির্দিষ্ট রূপ দেন।

অধ্যাপক শহিদ সুরাওয়ার্দি যামিনী রায় সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে যথাযথই বলেছিলেন, ইউরোপীয় প্রকরণ-কৌশলে তাঁর প্রশিক্ষণ যামিনী রায়কে প্রভূত সাহায্য করেছে। যেমন, সরল রেখার বদলে বঙ্কিম রেখাঙ্কনের প্রতি তাঁর ঝোঁক হয়তো তাঁর ওপর সমসাময়িক ফরাসী শিল্পীদের প্রভাব। ইউরোপীয়দের কাছ থেকেই তিনি শিখে থাকবেন পটের বুনোটে আলোর প্রেক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা করার কৌশল। কিন্তু তিনি যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তার তাৎপর্য ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সেই সমন্বয়ের নৈকট্যে এবং সেটাকে তিনি নিজস্ব এক স্টাইলেই পরিণত করেছিলেন। মাত্র দু'তিনটি আঁচড়ের সংযমে তিনি যে ছবি ফুটিয়ে তুলতেন, তাতে মনে হয় যেন তিনি নিজেই কোনও পটুয়ার একমুখী দৃষ্টির সামনে নিবদ্ধ শিল্পমাধ্যম। অথচ একইসঙ্গে বিশ্বশিল্পের সবচেয়ে বিশুদ্ধ উপকরণগুলির মেজাজ তাঁর মধ্যে ধরা পড়েছে।

হয়তো এই কারণেই যামিনী রায়ের অধিকাংশ ছবির প্রস্তুতি পর্বের ড্রয়িং স্কেচ রীতিমতো বিস্মিত করে। কলকাতায় ১৯৩৮ সালের প্রদর্শনীটি যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা যামিনীর চিত্রকলার বেশ কয়েকটি স্পষ্ট পর্যায়ের বিভাজন দেখতে পাবেন বিষ্ণু দে ও জন আরউইনের সংগ্রহ থেকে যামিনীর প্রথম দিককার কাজের খুব বেশি নমুনা মেলেনি। আমি তাই হামফ্রে হাউসের সংগ্রহে রক্ষিত 'মা ও ছেলে' বিষয়ক একটি ছবির উল্লেখ করতে চাই। এটি সেই প্রকরণে আঁকা যা দিয়ে যামিনী কলকাতার শিল্পজগতের নির্বোধ আতিশয্য থেকে সরে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। কৃষকের অবয়ব চিত্রিত দীর্ঘ প্যানেলটিতে ধরা আছে যামিনীর সেই অনুপম স্বাতন্ত্র্যবোধ, যা দিয়ে তিনি বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বেছে নিতে পারতেন এবং নিজের হাতে তৈরি রঙের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা নিজের অঙ্কনে যুক্ত করতেন সারল্যের শক্তি। সাঁওতালি নৃত্যের ছবিতে অঙ্কনের যে নাটকীয়তা আছে পরবর্তীকালে কীর্তন

চিত্রমালায় তা আরও বিকশিত হয়েছিল। এই নাট্যগুণেই নিহত আছে তাঁর জাদুকরী প্রতিভার সার, আর এখানেই চিত্রকল্প হয়ে ওঠে সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী।

যামিনী রায়ের চিত্রকলা অবশ্য কেবল নতুন উপায়ে রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ছিল না। তাঁর শ্লেষধর্মী ছবি ও ব্যঙ্গচিত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই তাঁকে সামাজিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্বসংঘাত সম্পর্কে সচেতন রূপে দেখা যায়ঃ যেখানে মহাজন ও জোতদাররা শিকারি পশুর মুণ্ডসহ উপস্থাপিত হয় ধূমায়মান কৃষক সংগ্রামের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আর স্বপ্নের পাখিরা অপদেবতার প্রেতচ্ছায়ায় অভিভূত হওয়ার আশঙ্কায় দিগন্তে সমবেত হয়। গায়ক দলের শিশুসুলভ ফুল্লতা এবং কুমারী কন্যার অপাপবিদ্ধ সারল্যের পাশাপাশি তাঁর অধিকাংশ ছবির মানুষের পল্লবহীন খোলা চোখের তারায় মূক আতঙ্কের প্রায়োন্মাদ দৃষ্টি কারও নজর এড়াতে পারে না। খেলনার ঢঙের অঙ্কনশৈলীকে অতিরঞ্জিত করেও তিনি এক ধরনের খ্যাপা ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করেছেন।

হয়তো এভাবে যামিনী রায়ের ছবির মধ্যে বক্তব্য খোঁজার পিছনে সাহিত্যধর্মী মনন বা সাহিত্যিক মূল্যায়ণের অভ্যাস কাজ করে! কিন্তু তার ছবিতে বিকাশের যে প্রবাহ—গ্রাম্য পশুপাখি ফুলপাতা থেকে শুরু করে মানুষের সৌন্দর্য ও মর্যাদা নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের আঁচড়, শেষে যীশুর জীবনচর্চায় কেন্দ্রীভূত ও উপনীত হয়—এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে মৌলিক প্রশ্ন তোলার সচেতন প্রয়াসঃ আমাদের জীবনে কী ঘটে গেছে? কেন আমরা এমন বিপর্যস্ত জর্জরিত? কোথায়ই বা আমরা চলেছি?

কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন, যামিনী রায় পাতালের নির্দ্বন্দ্ব শান্তির অভিসারী। শিল্পী নিজে কিন্তু তা মানেন না। তিনি বলেছেন—'শিল্প অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফসল, বৌদ্ধিক ও প্রাকৃতিক সমস্যাগুলির সঙ্গে পাঞ্জা কষার ফসল'।

চিত্রকলা সম্পর্কে এটাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের শিখরেও কবিতার মতো সে মূল্যবোধের অন্বেষণ করে। কবির মতো চিত্রকরও জানতে চান, শব্দের ওড়নার আড়ালে কী সেই সত্য রূপ? কিন্তু এই অন্বেষা সততই সংহত রূপের, সহজ-সুন্দরের, যা এখনও আমাদের কালের দিশাভ্রষ্ট রোমান্টিকতার অবিকল প্রতিমা গড়ে দিতে পারে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যামিনী রায়

অতুল বসু হেমেন্দ্র মজুমদার সতীশ সিংহ প্রমুখ শিল্পীদের একটি সংস্থা ছিল, তার নাম শিল্পীচক্র। ঘুরে ঘুরে প্রতি পূর্ণিমায় শিল্পীদের এক এক জনের বাড়ীতে তার এক একটি অধিবেশন হত। মেলামেশা আলাপ আলোচনা ও খাওয়া দাওয়াটাই প্রধান ছিল তার কর্মসূচীতে, বিশুদ্ধ শিল্পতত্ত্ব নিয়ে কমই কথাবার্তা হত। তা হত কদাচিৎ কেউ একটা প্রবন্ধ ট্রবন্ধ পড়লে। শিল্পীদের বন্ধু হিসাবে আমি এর একজন অনিয়মিত সদস্য হই এবং বাৎসরিক প্রদর্শনী উপলক্ষে চিত্র সমালোচনা লিখতে শুরু করি অমৃতবাজার ও আনন্দবাজারে। সেই সূত্রেই সাহেদ সুরাবর্দী নীলিমা দেবী ও অর্ধেন্দ্রকুমার গাংগুলীর সংগেও পরিচিত হই। আর এখানেই চিত্রজগতের তদানীন্তন বিখ্যাত দুই যামিনীদাকে পাওয়ার সুযোগ হয় আমার। প্রথম জন যামিনীপ্রকাশ গাংগুলী, তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং নিসর্গ চিত্র আঁকিয়ে রূপে অসীম খ্যাতিসম্পন্ন। দীর্ঘদেহী কান্তিমান পুরুষ। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট ছিল এক চোখে চশমা। এই রকম মনোকল পরতেন আর একজন বিখ্যাত বাঙালী, তিনি প্রথম ডাক ও তার বিভাগের ভারতীয় ডিরেক্টর জেনারেল জে পি রায়। দ্বিতীয় যামিনীদা হলেন স্বনামখ্যাত যামিনী রায়। তখন তিনি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে হিসাবে প্রসিদ্ধ। স্বল্পভাষী ঈষৎ উদাসীন ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। সকলের সব কথা শুনতেন, সব কথারই জবাব দিতেন দু এক কথায় এবং যা বলতেন তার চেয়ে বেশী কথা যেন অকথিত থাকত। তবে কোন ক্ষেত্রেই তা কর্কশ বিরূপতার মূর্তি ধরত না। হাসি কৌতুক উপভোগও করতেন আর পাঁচজনের মতই। কাছেই, আবার দূরেও,

একই সঙ্গে এই দ্বৈতসত্তার অধিকারী আশ্চর্য মানুষ ছিলেন যামিনীদা। কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ ছিলেন অনেকটা এই ধরনের লোক। প্রথম থেকেই তাই ওঁকে আমার বিশেষ ভাল লাগে। তারপর যখন যুগান্তরে এলাম, তখন থেকে ত বলতে গেলে তাঁর প্রতিবেশীই হয়ে পড়লাম। বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের যে বাড়ীতে প্রথম যুগান্তরের কার্যালয় ছিল, তার ঠিক পাশের বাড়ীতে থাকতেন একাংশে যামিনীদা, অন্য অংশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আনাগোনার মুখে প্রতিদিনই দেখা হত দুজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে বিকালের দিকে হুট করে এসেও উঠতেন দুজনের কেউ না কেউ। তারাশংকরের সঙ্গে পরিচয় আমার ১৯৩০-৩১ এর কোন সময়। ঐ সময় সাবিত্রী প্রসন্নের উপাসনা পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণি ক্রমশ আকারে ছাপা হয়। স্নাতক শ্রেণীর পড়ুয়া হিসাবে আমিও তখনই লেখা শুরু করি ঐ কাগজে। যামিনীদার সঙ্গে পরিচয় হয় তার বেশ কয়েক বছর পরে। কোথায় তা ত আগেই বলেছি।

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের জীবনান্ত হলে, সেবারকার যুগান্তর শারদীয়ায় অতুল বসু হেমেন্দ্র মজুমদার রমেন চক্রবর্তী ও যামিনী রায়, চারজন শিল্পীর হাত দিয়ে আঁকান কবির চারখানি স্কেচ প্রকাশ করা হয়। এই সংগ্রহের কাজে তদ্বির করতে হয় আমাকেই। অন্যদের গুলো খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে যাই, কিন্তু হাতের কাছকার মানুষ যামিনীদারটাই কিছুতে আর হাতে আসে না। শেষে একদিন দুপুরে বাড়ী এসে বসে গেলাম ওঁর পাশে। বললাম, আমাকে আজই বিদেয় করতে হবে, আর সময় দিতে পারব না। কিছু না বলে তিনি একখানা মোটা খাতার ভেতর থেকে বের করে দিলেন একখানা রবীন্দ্র প্রতিকৃতি, মোটা তুলিতে আঁকা, অপূর্ব একটি কাজ। এর কিছু আগে থেকেই যামিনী রায় আজ যে জন্য প্রসিদ্ধ, সেই পট শিল্পের ধারায় আঁকা শুরু করেন এবং তাঁর সেই অংকন ধারা নিয়ে অনুকূল প্রতিকূলে বহু আলোচনা হতে আরম্ভ হয় শিল্প বিচারকদের মহলে। মনে আছে রাষ্ট্রিকেশন অব আরবান কালচার বা নাগরিক সংস্কৃতির গ্রাম্যবরণ নামে একটি কঠোর প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তখনকার এক দৈনিকে, যাতে বলা হয় লোকসাহিত্যের ধারায় জসিমউদ্দীন, লোকনৃত্যের ধারায় গুরুসদয় দত্ত আর লোককলার ধারায় যামিনী রায় দেশের সংস্কৃতিকে গেঁয়োপনার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এতে নূতনত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সৃজনের গৌরব কি বা কতটুকু আছে? এ সময় কোন বার্ষিক সংকলনে যামিনীদার একখানি ছবি ছাপা হয়, যার সমালোচনা করে উপরোক্ত প্রবন্ধে লেখা হয়, একখানি প্রায় চতুষ্কোণ টেবিলের বাঁ দিককার উপর প্রান্তে দুটি চোখ একজোড়া শিং ও কান, আর ডান দিককার নীচের কোণায় একটি কাত করা জবালা ও তার ওপর বাঁকা করে বসান একটা হাঁড়ি। অনুবীক্ষণিক সতর্কতায় নজর করলে তবেই বোঝা যায় একটি নারী গাভীর দুধ দুইছেন। ছবির নাম গো দোহন,

যা দুর্ভাগবশত ছাপা হয় গোদহন এবং তা নিয়েও সমালোচক শিল্পীকে বিদ্রূপ করতে কসুর করেন নি। যামিনীদা এই সমালোচনায় বিশেষ ক্ষুণ্ন হন। তাই তাঁর মনোবেদনা লক্ষ করে আমি ঐ লেখার প্রত্যুত্তর রূপে লিখি, রিহ্যাবিলিটেশন অব ফোক কালচার, নট এ রেট্রোগ্রেড মুভমেণ্ট, লোকসংস্কৃতির পুনর্বসতি বকেয়াসির আন্দোলন নয়। যামিনীদা খুশী হন এতে।

বাংলা পটশিল্পের সংগে তুলনায় আলোচনা করে যামিনী রায়ের অংকন শৈলী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে একদিন বন্ধু নির্মল ঘোষকে নিয়ে যাই। স্বল্পভাষী যামিনীদা সেদিন বেশ প্রাণবন্ত ও মুখর হয়ে ওঠেন। বলেন—দেখ, আদি ভাষা সব দেশেই ছিল প্রাকৃত, তাকে সংস্কৃত করেই ধ্রুবপদী ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনকালে অকৃত্রিম হয় না। নাচে গানে আঁকাতেও তাই। ধ্রুবপদী ঢং অলংকৃত, কণ্টকৃত, অসহজগ্রাহ্য। তার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ যা হয়, ভঙ্গীর প্রকাশ হয় তার চেয়ে বেশী। এই যে পটে পাটায় দেওয়ালে ইঁটে কাঠে পেতলে পাথরে হাজার হাজার মানুষ শত শত বছর ধরে তাঁদের সৃষ্টিকে রূপ দিয়ে গেছেন, তা কি নগণ্য হতে পারে? নগণ্য হতে পারে কি সেইসব সাহিত্য ও নৃত্যগীত, পুরুষানুক্রমিকভাবে চলে আসছে? সেই পুরাতন ধারাকে নতুন কালের ব্যঞ্জনা দিয়ে জীবন্ত করা যায় কি না এবং এইভাবে সেকালের সঙ্গে একালের, সাধারণের সংগে ওপর তলার নূতন যোগসূত্র গড়ে তোলা যায় কি না, এ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করছেন তাঁদের যাঁরা নিন্দা করছেন,

তারা অদরদী। কথাগুলি নির্মলের ও আমার খুবেই মনে ধরেছিল। হুবহু এই কথাগুলো নির্মল তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন। এতদিন পরে তাদের আবার আমি তুলে ধরলাম, তার কারণ যামিনী রায় আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসে একক প্রতিভা রূপেই অদ্যাবধি জীবিত আছেন এবং তার ঐতিহ্য এখনো স্খলিত তাৎপর্য হয় নি। অবশ্য সুখের কথা যে যামিনী রায় তাঁর জীবনকালেই প্রভূত স্বীকৃতি ও সুযশ পান। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মৃণালিনী এমার্সন, বিষ্ণু দে প্রমুখ গুণীজন তাঁর অংকনের সবিশেষ অনুরাগী হন এবং তাঁর সম্বন্ধে তাঁরা কেউ কেউ কাগজে পত্রে সবিস্তার আলোচনা লিখতে থাকেন। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টানে আগত বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অন্তর্গত তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিক যুবারা তাঁর ছবিতে আকৃষ্ট হয়ে নিজ নিজ দেশে আত্মীয় বন্ধুদের কাছে তার নিদর্শন পাঠাতে শুরু করেন একখানা দুখানা করে। তাতে বেশ অর্থাগমও হতে থাকে যামিনীদার, যা হয়নি সমসাময়িক আর কোন শিল্পীরই। এই বিদেশী অনুরাগীদের অন্যতম ক্যাপটেন আরউইন ও বিষ্ণু দে একযোগে যামিনী রায়ের পরিচিতি সহ একখানি এলবাম প্রকাশ করেন, যা তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। যামিনী রায়ের অংকন ও অংকনরীতি সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য বই, এ ছাড়া আর কিছু আছে কি না বলতে পারি না।

শেষ জীবনে যামিনীদা ইংটালি অঞ্চলে নিজস্ব বাড়ী করে সেখানে উঠে যান এবং শরীরেও ক্রমশ অপটু হয়ে পড়তে থাকেন। তখন তার সঙ্গে আর বেশী দেখা শোনা হত না। তবে কাছাকাছিতেই ছিল অতুল বসুর বাড়ী। আর গড়িয়াহাট ও যতীন দাস রোড এলাকায় ছিল যথাক্রমে রমেন চক্রবর্তী ও সতীশ সিংহের বাড়ী। তাই যেদিন মন ছুটত, বেরিয়ে পড়ে তিনজনের সঙ্গেই মোলাকাত করে আসতাম। কিন্তু তখন কি আর আগেকার মত উত্তাপের তীব্রতা ছিল? তারপর সবাই চলে গেলেন একে একে পৃথিবী থেকে। বান্ধবতার খাতায় এদিকটায় আস্তে আস্তে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। প্রস্থিত শিল্পী বন্ধুদের কথা ভাবলে আজও মন কেমন করে আমার। কে জানে ওঁদের শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলো আজ কোথায় আছে বা আদৌ কোথাও আছে কিনা। শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় অবশ্য একটা একাডেমী তৈরী হয়েছে, কিন্তু যথার্থ জাতীয় চিত্রশালা ত এখনো হয়নি। তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মগুলি সর্বজনের সামনে উন্মুক্ত হবার কোন সুযোগই হয়নি আজও। কিন্তু ও কথা যাক। শিল্পী যামিনী রায় শুধু অসাধারণ আঁকিয়েই ছিলেন না। মানুষ হিসেবেও ছিলেন অনন্য। নিরহংকার উদার সত্যসন্ধ, দীন দুঃখী ব্যথিত পতিতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রেমপ্রবণ। খোলার ছাউনি যুক্ত দু তিনটি ভাঙা কুঁড়ের সামনে রাস্তার কল থেকে কয়েকটি বস্তিবাসিনী মহিলা জল নিচ্ছেন, আর রাস্তার ধুলো কাদায়

অর্ধোলঙ্গ শিশু ও একটি কুকুর এক সঙ্গে খেলা করছে, এই রকম একখানা ছবি এক তরুণ শিল্পী একদিন এঁকে দেখাতে এসেছিলেন। যামিনীদা মন দিয়ে দেখে আঁকার খুব তারিফ করলেন। দু-একটা ছোটখাটো ত্রুটির কথাও বললেন। তারপর বললেন, দেখ ভাই, করুণকে অতি করুণ করলে সহজেই মন ভোলান যায়। স্রষ্ঠাকে এ লোভ সংবরণ করতে হবে। করুণা নয়, চাই শ্রদ্ধা। একজন ভিখারি হোক, একটা গরু হোক, একটা কুকুর হোক, ব্যক্তি হিসাবে সবাই স্বয়ং সম্পূর্ণ। সবাই সমান জৈবচেতনা—সম্পন্ন। আমার দয়ায় তারা সাহিত্যে বা শিল্পে ঠাঁই পেল, এ ভাবতে নেই। আপন অধিকারেই তারা সৃষ্টিতে স্থান করে নিল, এই কথা ভাবতে হবে। বসে বসে শুনলাম। শিল্পী যামিনী রায়ের অন্তশ্চেতনার স্বরূপ, তাঁর জীবন দর্শনের প্রকৃতি এত সুন্দর করে তিনি আর কোথাও বলেছেন কিনা জানি না।

বুদ্ধদেব বসু

ধন্য যামিনী রায়

এক

আমরা সবাই প্রতিভারে করে পণ্য
ভাবালু আত্মকরুণায় আছি মগ্ন,
আমাদের পাপে নিজের জীবনে জীর্ণ
করলে, যামিনী রায়।

জীবনের রসে শিল্পেরে দিলে প্রাণ,
জ্বালালে জীবন শিল্পের শিখা থেকে।
তুমি জয়ী হলে আপনার প্রাণ নিঃশেষে করে দান,
আমরা পতিত খানিকটা হাতে রেখে।

পাপের প্রাচীর দিকে দিকে হবে ভগ্ন,
আবার আসবে শিল্পীর শুভলগ্ন —
পুঁথিতে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রাণের স্বপ্ন রচনা করে
আমাদের দিন যায়ঃ

পুঁথি ফেলে তুমি তাকালে আপন গোপন মর্মতলে,
ফিরে গেলে তুমি মাটিতে, আকাশে, জলে।
স্বপ্ন লালসে অলস আমরা তোমার পুণ্যবলে
ধন্য যামিনী রায়।

দুই

প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে সুধীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ পড়েছিলেন তাতে যামিনী রায়ের প্রসঙ্গ ছিল অনেকটা—'আমাদের মধ্যে তিনি অনন্য' এই উক্তিটি আমার মনে গেঁথে আছে। একই সময়ে একটি যামিনী-রায় প্রদর্শনী চলছিলো। ডালহুসি-পাড়ায় কোনো পুরোনো বাড়ীর আধো-অন্ধকার হল-ঘরে তাঁর ছবি আমি প্রথম দেখেছিলাম—তাঁকেও দেখেছিলাম বারান্দায় উপবিষ্ট। অতিথির ভিড়ে আলাপের অবকাশ ছিলো না সেদিন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জী লেন হয়ে উঠলো এমন একটি আকর্ষণস্থল যেখানে রিপন কলেজে ক্লাশ পড়ানো চুকিয়ে, আমি মাঝে মাঝে যাই কোনো ছোটো প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও। মনে পড়ে সংকীর্ণ ও সর্পিল একটি গলি, রৌদ্রহীন, বালিগঞ্জের বিপরীত মেরুতে পুরোনো দিনের গন্ধে ভরপুর; অনুভব করি নিশ্বাসে সেই 'খাস কলকাতা'কে যা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমি অল্পই পেয়ে থাকি। 'অমৃতবাজারে'র কালাঙ্কিত কার্যালয়গুলি পেরিয়ে উল্টো দিকে থাকেন যামিনী রায়, গলিটা সেখানে দুটো-তিনটে ভাগ হয়ে গিয়ে উঠোনের মতো দেখতে হয়েছে। বাড়িটি দোতলা বা তেতলা হয়তো; উপর তলার পারিবারিক মহলে তিনি আহার করেন ও রাত্রে ঘুমোন, সকাল থেকে নিবিষ্ট হন স্বকর্মে। একতলায় চারখানা কি পাঁচখানা ঘর নিয়ে তাঁর রাজত্ব: ধুলিচিহ্নহীন নির্মল মেঝে. উজ্জ্বল-ধবল দেয়ালে ঝুলছে সারি সারি তাঁর সৃষ্টি, ঢোকামাত্র রঙের ঝলক চোখে লাগে। এখানেই তিনি দিনমান কাটান ঋতুর পর ঋতু প্রতিটি দিন; ছবি আঁকেন, ছবি ভাবেন, কেউ এলে কথা বলেন ছবি নিয়ে—যে কোন সময়ে আগন্তুকের তিনি অধিগম্য—এই তাঁর সাল' এবং স্টুডিও এবং তাঁর আর্ট-গ্যালারিও এখানেই। কিন্তু ঐ প্যারিসীয় শব্দগুলিতে আমাদের মনে যে ছবি ফোটে—বৃহৎ কক্ষর বিচিত্র আসবাব, ইজেল এবং ক্যানভাস এবং অন্য বহু উপকরণ, কোনো এককোণে সোফায় এলানো বিশ্রামরতা একটি মডেল হয়তো—সে রকম কিছুই দেখা যায় না এখানে; এখানে সরঞ্জাম সবই দৈশিক এবং যামিনী রায়ের অদৃশ্য স্বাক্ষরে চিহ্নিত। অতিথিদের বসার জন্য আছে দেয়াল বরাবর ছোটো ছোটো কাঠের টুল, ঢাকনাগুলি লাল পাড়ওয়ালা মোটা কাপড়ে তৈরি—বলা যায় না শারীরিক অর্থে আরামদায়ক, কিন্তু সুবিধে এই যে ছবির দর্শনীয়তা ব্যাহত হয় না, ছবি ও দর্শকের মধ্যে কয়েক গজ ফাঁকা মেঝের ব্যবধান থাকে। তাঁকে পাওয়া যায় এক-এক কামরায় এক-এক দিন কখনো একটি সরু লম্বা করিডরে বা বারান্দায়, দেখে মনে হয় সেটাই তাঁর প্রধান কর্মস্থল, সেখানে থরে থরে সব যন্ত্রপাতি সাজানো—তুলির গুচ্ছ রঙের ভাঁড়, শস্তা পীসবোর্ড জাতীয় পাত পাত দানাদার কাগজ, যেটা তার পটের কাজ করে; আর ছুরি কাঁচি সুতো ইত্যাদি বিবিধ. দু-একটি হয়তো বাংলা

মাসিক বা বিলেতি চিত্র-পত্রিকা, তাঁর রচিত বা সংগৃহীত কয়েকটি মাটির পুতুল বা কাঠের মূর্তি, আর অবশ্য তাঁর ছবি—আরম্ভ করা, শেষ-হয়ে-আসা, নকশা-করে-রাখা, নানান ধরণের—তিনি মাদুরে বসে কোন-একটিকে শেষ করে আনছেন ধীরে ধীরে, তুলির প্রতিটি বিন্দুলেপনে নীল সবুজ ঝিলিক দিচ্ছে রত্নের মতো। প্রতিটি ঘরে ছবি, কোনো দেয়াল-স্থান ফাঁকা নেই, অনেকগুলো থাকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো—কোণের একটি ভাঁড়ার ঘরে পুরোনো কাজ স্তূপীকৃত। আর এই সব-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে-মিশিয়ে অনবরত উপস্থিত আছে পটল (যামিনী রায়ের চতুর্থ পুত্র চিত্রশিল্পী শ্রীঅমিয় রায়)—যামিনী রায়ের শিষ্য ও নিত্যসহকারী এক যুবক; আমরা কড়া নাড়লে সে খুলে দেয় দরজা, কাঁধের ভঙ্গিতে বিনয় ও মুখের হাসিতে অভ্যর্থনা নিয়ে, পিতার কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজে হয়ে যায় অদৃশ্য, কিন্তু তিনি একবার ডাকলেই চলে আসে তক্ষুনি; ঘুরে ঘুরে ছবি দেখায় আমাদের, সম্ভাব্য কেতার সঙ্গে কথা বলে, এগিয়ে দেয় প্রয়োজন মতো ছাইদান হিশেবে মাটির ঘটি বা ঝকঝকে গ্লাশে জল এনে দেয়—যামিনী রায় সৃষ্টিশালার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আমরা তাকে জেনেছিলাম।

আজ হিসেব করে দেখছি, যামিনী রায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় তিনি পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন, বা সবেমাত্র পেরিয়ে এসেছেন। আমার চোখে আছে চওড়া কাঁধের বলিষ্ঠ এক প্রৌঢ় পুরুষ চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে কিন্তু দেহে কোথাও টোল পড়েনি; চামড়া আঁটো, মুখের ট্যান-করা ব্রাউন রংটিতে লালের আভা লাগে তিনি যখন আনন্দিত বা উত্তেজিত হন। তাঁর হাতের পাতাদুটি বড়ো এবং আঙুলগুলো খুব মজবুত, সেই হাতের পাতা টান করে তুলে ধরেন মুখের সামনে, কারো কোনো কথা তাঁর পছন্দ না হলে। তিনি কথা বলেন আধা-আঞ্চলিক উচ্চারণে দ্রুত এবং কিছুটা বিস্রস্ত ভাবে; মাঝে মাঝে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলেন যে কোন টুকরো কাগজে পেন্সিলে বা ফাউন্টেনপেনে রেখাঙ্কন করে।

সৌখিনতার চিহ্ন মাত্র নেই তাঁর ধরণ-ধারণে ; ব্যবহারে নেই কোন লালিত্য বা অতিসূক্ষ্মতা যা অনেকে ভুল করে ভাবে শিল্পীর কুললক্ষণ ; তিনি যে শক্ত পায়ে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছেন তাই যেন যথেষ্ট। তাঁকে দেখে মনে হতে পারে কোনো মিতাচারী সুব্যবস্থিত গ্রামীণ ভূস্বামী, অথবা কোনো কর্মিষ্ঠ কৃতী পেশা-গর্বিত কারিগর, যার সাধু পরিশ্রমের তাপে নাগরিক জীবনের পাতা-বাহারগুলি ফুটতেই পারে নি। পাড়হীন অনতিবিলম্বিত থানধুতি ও ঈষৎ হ্রস্ব মোটা কাপড়ের জামা—শাদা, এবং শাদা ভিন্ন কখনোই নয়—এই তাঁর চিরকালীন বেশ; শীতে যুক্ত হয় একটি ধূসর রঙের কারুকার্যহীন আলোয়ান ; ঘরে বাইরে তালতলার চটি তাঁর পায়ে, বাড়ির বাইরে হাতে দেখা যায় মোটা লাঠি একগাছা—চলার জন্য নির্ভর হিসেবে নিশ্চয় নয়, তাঁর কাঁধে ঝোলানো উড়ুনির মতোই হয়তো শুধু পুরোনো আমলের প্রতীক হিসেবে। আমি প্রায় দুঃখিত হয়েছিলাম যখন যুদ্ধের পরে তিনি উঠে এলেন বালিগঞ্জ প্লেসে তাঁর নিজের বাড়িতে—যদিও তাঁর সান্নিধ্য আমাদের অনেকের পক্ষেই লাভজনক ; আমার মনে হয়েছিল পুরাতনপন্থী বাগবাজারই তাঁর জীবনদর্শনের অনুযায়ী, যেন ঘেঁষাঘেঁষি আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের একতলায় ছাড়া আর কোথাও ঠিক মানাবে না তাঁকে ;—কিন্তু দেখে পুলকিত হয়েছিলাম নতুন বাড়িতে একতলায় তাঁর কর্মস্থলটি অবিকল সেই পুরোনো ছাঁচেই তিনি নির্মাণ করেছেন—অভিনব শুধু সংলগ্ন খানিকটা ঘাসের আঙিনা, কিন্তু আমি তাঁকে সেখানে বেরোতে কখনো দেখি নি।

যামিনী রায়ের ছবির একজন প্রধান ভক্ত হিসেবে আমি গণ্য হতে পারি না ; তাঁর চিত্রকলা যে আমাকে অত্যন্ত বেশি নাড়া দিয়েছে তাও নয়। 'সুন্দর' নিশ্চয়ই নয়নমোহন ; আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়িগুলোর 'বোবা দেওয়াল'কে রঞ্জিত করার একটি সুচারু এবং অদুর্লভ সামগ্রী নিশ্চয়ই—কিন্তু বড় যেন শান্ত ও সমতল ; আমি পাই না তাতে সেই চাঞ্চল্য বা আবেগের ঘাতপ্রতিঘাত, যা সব শিল্পের কাছেই আমার প্রত্যাশা—অথবা তা পাই শুধু মাঝে মাঝে, যেমন তাঁর পশু-চিত্রশালায় দৃপ্তিমান অশ্বে অথবা চৌর্যনিপুণ মার্জারে বা এক-রঙে-আঁকা পটুয়ারীতির বঙ্গবধূ পর্যায়ে, যেখানে মনে হয় একটিমাত্র বঙ্কিম ও লীলায়িত রেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নারীর সব নারীত্ব, যৌবনের সব শ্রী ও সৌষম্য ও উষ্ণতা। অথচ, অন্য এক স্তরে, আমি তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ :— আমি দেখেছি তাঁর মধ্যে সেই চরিত্র বা চারিত্রের দৃষ্টান্ত, যা রীতিমতো সাধনার দ্বারাই লভ্য হয়ে থাকে, শুধুমাত্র প্রতিভার বলে নয় ; এবং তিনি—হয়তো বা 'আমাদের মধ্যে একমাত্র তিনি' যা আয়ত্ত করেছিলেন বলে তাঁর শিল্পের মহৎ মূল্য বিষয়ে আমার মনে সংশয় নেই। আমার সমকালীন যাঁদের আমি ব্যক্তিগত সংসর্গ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে তাঁরই সঙ্গে আমার মতভেদ সবচেয়ে

গভীর, এবং মানুষ হিসেবে তাঁরই প্রতি আমি অনুভব করেছি অপরিমাণ সপ্রশংস বিস্ময়। তিনি আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিরূপঃ নিজে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করেছিলেন এবং এও চান না পুত্র-পৌত্রেরা তা অর্জন করে, তিনি প্রচার করেন পল্লী সমাজের সরলতা; ছবি আঁকেন শুধু সেই সব রঙে যা তাঁর বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপনীয়, 'একটি কলু, একটি তাঁতি, কামার, আর কুমোর কয়েক ঘর চাষি হলেই সংসার চলে যায়'—এ রকম কথাও অনেকবার আমি তাঁর মুখে শুনেছি। কথাটা আক্ষরিক অর্থে ভুল নয়; কিন্তু তিনি বাসা বেঁধেছেন মহানগরে, লিপ্ত আছেন বৃহৎ বিচিত্র জটিল একটি সমাজের সঙ্গে; এবং তাঁর মনের মধ্যে যে আধুনিক পশ্চিম উন্মীল ছিলো তা বোঝার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেও হয় না। আছে তাঁর ভ্যান গগ এবং কোনো কোনো ফরাশি ইম্প্রেশনিস্টের প্রতিলিপিচিত্র, যা নৈপুণ্য সমানুকম্পনের সাক্ষ্য দেয়; আছে 'কবিতা'র রবীন্দ্রসংখ্যায় তাঁর শ্রুতিলিখিত নিবন্ধ যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবিকে বলেছিলেন 'য়োরোপীয়', এবং যার স্বতঃস্ফূর্ত সুখ্যাতি করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-কলাভবনকে ক্ষুব্ধ করেছিলেন। এ সব 'অসংগতি' আমাকে অবশ্য বিব্রত করে না, কেননা আমি ও আমার সমবয়সীরা এতে অভ্যস্ত আছি; আমরা কি দেখে আসি নি ছেলেবেলা থেকে মহাত্মা গান্ধীকে, যিনি পশ্চিমী সভ্যতাকে বলেছিলেন 'শয়তানিক' অথচ রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ ছাপাখানা বিনা এক দণ্ড যাঁর চলতো না, এবং যিনি মরুভূমিতে তাঁবু ফেললেও সেখানেই পোস্টাপিস বসিয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষ ইংরেজ সরকার? যামিনী রায়ের সভ্যতাবিরোধী কথাগুলি আমি নিঃশব্দে শুনে যেতে পারি, কিন্তু গরমিল সোচ্চার হয়ে ওঠে অন্য ব্যাপারে।

কিছুদূর পর্যন্ত আমি চলতে পারি তাঁর সঙ্গে। পটে-আঁকা যে আঙুরগুচ্ছে পাখিরা এসে ঠুকরে যায় 'সে আঙুরফলে রস নেই'—এই কথাটা অল্প বয়সেই তিনি অনুভব করেছিলেন, এবং এও বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ইশকুল, আমাদের তথাকথিত ইণ্ডিয়ান আর্ট—যেখানে 'কাপড়টা আঁকার ইচ্ছে আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই'—সেটাও ঠিক পথ নয়। এবং একই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ রাফায়েল বিষয়েও তাঁর আপত্তি,যেহেতু রাফায়েলের দেবদূতেরা শূন্যে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি বুঝি তাঁর এ-সব প্রত্যাখানের মূল্য; ছুঁতে পারি তাঁর শান্তিহীন সন্ধানী-মনটিকে যখন তাঁর পূর্বজীবনের কথা বলেন তিনি; কেমন করে, সাঁওতাল রাখাল মোগল আমলের মায়া কাটিয়ে, তাঁর পক্ষে জীবিকা-অর্জনকারী ফোটোগ্রাফ থেকে পোর্ট্রেট রচনা পরিত্যাগ করে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন, সেই ইতিহাসে আমার মনে সহজেই অনেক তরঙ্গ ওঠে, কেননা আমরা সাহিত্যেও ঠিক একই সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু তিনি যখন বলেন, 'আমরা ক্যামেরা আবিষ্কার করি নি তো সিনেমা

বানাবো কী করে? ক্যামেরা কিনে হাতল ঘোরালেই কি আর সিনেমা হয়?' তখন আমি তর্ক না তুলে পারি না: 'কেন আমরা একশো বছর ধরে গদ্য উপন্যাস লিখে আসছি, সনেট লিখে আসছি—ও সবও অন্য দেশে জন্মেছিলো।- তাহলে সিনেমাই বা হবে না কেন?' উত্তরে মৃদু হেসে হাতের পাতায় নিষেধের বেড়া তুলে দিয়ে তিনি বলেন, 'না—না—ও হয় না।' আরো তীব্র হয় আমার প্রতিবাদ যখন তিনি কোনারক অজন্তাকে বলেন বিদেশী—ভারতীয় নয়: 'তা হলে ভারতীয় আপনি কাকে বলেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ঘুরে ফিরে আরো একবার চলে আসেন তাঁর বেলেতোড় গ্রামে। সাহিত্যের কথা বড়ো একটা শুনি না তাঁর মুখে, কিন্তু একটি উপাখ্যান তাঁর প্রিয়: কোন পণ্ডিতের মুখে সংস্কৃত কোনো শ্লোক শুনে চৈতন্যদেব বলে উঠেছিলেন 'কাকবিষ্ঠা'; ও-কথা বলার অধিকার চৈতন্যদেবের থাকলেও আমাদের কারো আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় ঘোচে না। এমনি আরো অনেক যুক্তিহীন উক্তি, আরো অনেক প্রশ্ন যার উত্তর নেই! আমার বুঝতে অবশ্য দেরি হয় নি যে তাঁর সঙ্গে তর্ক দূরে থাক, কোনো আলোচনাও অসম্ভব—যামিনী রায়ের কাছে গেলে যামিনী রায়ের কথাই শুনে যেতে হবে; এবং পঁচিশ বছর ধরে তাঁর মুখে একই কথার পুনরুক্তি শুনে শুনে আমি শেষের দিকে ঈষৎ ক্লান্ত হয়েও পড়েছিলাম:—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে মানতে হয়েছে তাঁর কথাবার্তা যতই অসংলগ্ন শোনাক, তাঁর ব্যক্তিত্বটি অখণ্ড এবং ভেদরেখাহীন, নিজের মধ্যে একটি স্থির ভূমিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

কোনো খেয়াল, কোন ঝোঁক, কোনো হঠাৎ-জেগে-ওঠা ইচ্ছে—এ সব কিছুই তাঁর ধাতে ছিল না, তাঁর জীবনযাত্রায় কিছুই ছিল না রোমাণ্টিক। 'আমি চঞ্চল

হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—এই ভাবনাটা যে উনিশ এবং বিশ শতকে দেশে দেশে কবিশিল্পীরা ভেবেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাঁদের আচরণ ও রচনার মধ্য দিয়ে, তা মনে হয় যামিনী রায়কে কখনো কম্পিত করে নি। কখনো শুনি নি তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন—অন্তত তাঁর শিল্পীর চোখে চেয়ে দেখার জন্য কোনো পাহাড়ে বা অরণ্যে বা সমুদ্রতীরে; কখনও শুনি নি তাঁর মুখে কোনো ভ্রমণের গল্প; বেলেতোড় ও কলকাতা ছাড়া অন্য কোনো স্থান। তিনি যদি বা দেখে থাকেন তা স্পষ্টত কোনো প্রতিফলন রেখে যায় নি তাঁর মনের উপর, কোনো নতুন মূর্তিটি রচনা করে নি। তাঁর মনের গড়নটি এমন যে নতুন উপাদান বা অভিঘাতের সন্ধানে তাঁকে বাইরে বেরোতে হয় না, যা-কিছু তাঁর প্রয়োজন সব ঘরে বসেই তিনি প্রাপ্ত হন। তাঁর মতে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এই যে তারা গৃহস্থ এবং এই কথাটাকে তিনি আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর জীবনে: গৃহবাসীর শ্রেষ্ঠ একজন প্রতিভূরূপেও আমি তাঁকে জেনেছিলাম। এমনি আর একজন মোহনলাল গাঙ্গুলির লেখা পড়ে সেদিন জানলাম—এমনি আর একজন গৃহস্থ ছিলেন জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের নির্গমন ছিলো অমিতব্যয়ী ব্যসনবিলাসে: সেদিক থেকেও যামিনী রায় ঠিক উল্টো। অনতিমাত্রায় চা এবং সিগারেট—তাঁর বাহুল্যের তালিকা এর বেশি এগোয় না; আহার বিষয়ে তাঁকে খুব সংযত বলে মনে হয় এবং অর্থের ব্যবহার বিষয়েও তাই। চল্লিশের দশকে, প্রথম ইঙ্গ-মার্কিণ সৈনিকস্রোত আর তারপর বিদেশাগত

রাষ্ট্রদূত ও ভ্রমণকারীদের কারণে তাঁর ক্রেতা সংখ্যা যখন বিপুল, তখন তাঁকে বিশেষ একটা গর্বের সুরে বলতে শুনেছি, 'জানেন, আমি এক পয়সা খরচ বাড়াই নি, সব তুলে রাখছি'। আমরা চোখেও দেখতাম তাই ; যেমন ছিলো বাগবাজারে পনেরো বছর আগে যখন পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হয় নি, এখনো ঠিক তেমনি আছে তাঁর পরিবেশ এবং বাইরে থেকে যতটা অনুমান করা যায়— তাঁর গৃহস্থালি। এটাকে কার্পণ্য ভাবলে ভুল হবে, এটাও তাঁর সেই চরিত্রেরই একটি ব্যঞ্জনা, সেই অখণ্ডতারই একটি বিচ্ছুরণ, যা থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর চিত্রকলা। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে, তাঁরই এক পৌত্রের রচিত তাঁরই জীবনী-সম্পৃক্ত একটি তথ্য সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে তিনি পৌত্রকে বলেছিলেন, 'খোকন, আমার ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিয়ো'—এই কথাটা শুনে যামিনী রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসীমে ঠেকেছিলো কিন্তু একটি মহত্তর বিস্ময়ের আঘাত পেয়েছিলাম যখন তাঁর মৃত্যুর পরে শুনলাম তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তির জন্য কোনো ইচ্ছাপত্র রেখে যান নি।

আমার যৌবনের বন্ধু অচিন্ত্য কুমার ও উত্তর জীবনে আমার সুহৃৎ প্রকাশক বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি শিখেছিলাম প্রুফসংশোধন ও বাংলা বানানের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম আইনকানুন ; সুশৃংখলভাবে চিন্তা করতে শিখেছিলাম সুধীন্দ্র দত্তর কাছে ; আর যামিনী রায়ের কাছে পেয়েছিলাম একটি আদর্শ—রচনার নয়, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার কিছুই মেলে না—দৈনন্দিন জীবন যাপনের। আমার নিজেরও ছিলো স্বাভাবিক ঝোঁক সেদিকে ; আমার প্রকৃতিতে আলস্য নেই, আমার সাহিত্য ব্যবসায়ের অনুপুঙ্খ বিষয়ে আমি মনোযোগী আর বহিরঙ্গের বৈচিত্র্যের প্রতি আমার আকর্ষণ এতই অল্প যে ঘরে আসবাব বিন্যাসের কিঞ্চিৎ বদল ঘটলেও আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু 'ব্রতপালনের মতো দিনযাপন' যে-কথাটা আসলে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু আমার মনে প্রবিষ্ট হয়েছিলো আশালতা সিংহের চিঠি থেকে তাঁর একটি জীবন্ত ছবি—যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার পক্ষে দূরের মানুষ—আমি যামিনী রায়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ঐ যে তিনি ভোরে উঠে কাজে বসে যান এবং নিজেকে ক্লান্তির সীমায় টেনে না-নিয়ে থামেন না ; ঐ যে তাঁর পরিশ্রম চলে অবিরাম এবং বিনোদবিহীন ও বিক্ষেপহীন—ঘটনার সব উত্থানপতন সাময়িক সব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমতালে তাঁর এই নিয়মনিষ্ঠা আমাকে উত্তরোত্তর অধিকতর মুগ্ধ করেছে। 'রোজ ভাত খাই, ভাতে কি কখনো অরুচি হয় ?'—তাঁর এই ছোট্ট কথাটায় এক গভীর সত্যের আভাস পেয়েছি। আর আজকের দিনে এই কথাগুলি যখন লিখছি—কিছুটা বয়সের চাপে, কিছুটা দৈব অথবা দুর্দৈবের জন্য আর অনেকখানি সচেতন চেষ্টায়, আমার মনে হয় আমার দিনগুলিকে আমি সেই ছাঁচে গড়ে তুলতে পেরেছি—যদিও সর্বতোভাবে নয়, কেন না, স্বীয়

কর্মসংসারে যামিনী রায়ের অতি নিখুঁত গৃহিনীপনা, যার জন্য তাঁর স্টুডিও দেখে আমার মনে হতো এখানে একটি আলপিনেরও অপচয় হয় না, প্রয়োজনীয় টুকরো কাগজ হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়—আমার পক্ষে তা উচ্চাশারও সীমানার বাইরে।

দুটি কথা, দুটি গল্প ঘুরে-ফিরে আমার মনে পড়ছে আজ কিছুকাল ধরে যামিনী রায়ের মুখে যা শুনেছিলাম। যৌবনে, তিনি যখন নাট্যশালায় দৃশ্যপট আঁকার কাজ করতেন, তখন দেখতেন এক একটি অভিনেত্রীকে—সাধারণ বেশ্যা তারা—মহড়া দিতে মঞ্চে এসে প্রথমেই প্রণাম করতো সেই পাটাতনে। আর একদিন বলেছিলেন এক বাঈজীর গল্প: তার সাধ গেলো ঘরের বৌ হবে, কিন্তু বিয়ের দিনে যেই না রসুনচৌকি বেজে উঠেছে অমনি ঘরভর্তি লোকের সামনে সে নাচতে শুরু করে দিলে। এই আখ্যান দুটিতে আমি আজকাল তারই দৃষ্টান্ত দেখি যাকে গীতায় কৃষ্ণ বলেছিলেন স্বধর্ম; আর শেষ সম্ভবপর মুহূর্ত পর্যন্ত যাঁরা স্বধর্ম পালন করে গেছেন তাঁদেরই একজন মানি যামিনী রায়কে।

আরো অনেক প্রতিভাবান মানুষের মতো, তিনি বার্ধক্যে আরো সুন্দর হয়েছিলেন—উজ্জ্বল তামার মতো তাঁর মুখের রং শ্বেতায়মান ধূসর চুল তাঁকে গৌরব অর্পণ করেছে; তাঁর ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা আরো উদার, কথাবার্তায় উৎসাহ আরো বেগবান। তিনি বড়ো বড়ো দ্রুতচালিত অক্ষরে চিঠি লিখে থাকেন প্রচুর—আমাকে এবং আরো অনেককেই; কোন এক সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জন্য জনে জনে নিমন্ত্রণ পাঠান স্বহস্তে লিখে; এবং সেই তারিখটির বন্ধু সম্মেলনে তাঁর প্রীতি তাঁর চোখে মুখে আমরা দেখতে পাই। তাঁকে দীর্ঘকাল এমনি সমর্থ ও সপ্রতিভ দেখেছিলাম বলে তাঁর অবক্ষয় যেন একটু অতিমাত্রায় চমকে দিয়েছিলো আমাদের। আধুনিক বিশ্বাসে অবিশ্বাসী, তিনি সারাজীবন চিকিৎসা করিয়েছেন শুধু হোমিওপ্যাথিক, কখনো বসন্তের টিকে নেন নি শুনেছি; কিন্তু সত্তর পেরিয়ে হঠাৎ একটি অস্ত্রোপচার করতেই হলো—আর সেখানেই ভাঙনের শুরু, যদিও তাঁর প্রবল প্রাণশক্তি আরো

কিছুদূর চালিয়ে আনতে পেরেছিলো তাঁকে। শেষের দিকে আমার সংযোগ অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো; কিন্তু একদিন একটি বিশেষ উপলক্ষে দেখা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর চোখে সেই পুরোনো আগুন, কথায় সেই তীক্ষ্ণ আত্মপ্রত্যয়, যা কখনো কোনো বৃদ্ধ শিল্পী পিছন ফিরে পরস্পর তাঁর কাজের দিকে তাকিয়ে, জীবনের শেষে অনুভব করে থাকেন। আবার আর একদিন—একটা রোগের ঝাপটা সদ্য সামলে উঠেছেন তখন—সন্ধ্যার পরে দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে দেখা হলো, তাঁর শিয়রে ছিল সেই ধরণের একটি পুঁটুলি যা নিয়ে মেঠো পথে হাঁটে গাঁয়ের লোকেরা ; সেটাতে হাত রেখে বললেন, 'এই দেখুন, কিছু কাপড়চোপড় বেঁধে নিয়েছি এটাতে—যেতে হবে তো—' হয়তো একটু ভিন্নভাবে বলেছিলেন, কিন্তু অর্থটা এ-ই। কী ভাবছিলেন সেই মুহূর্তে আমি জানি না : কোনো ঈশ্বর, কোনো অদৃশ্য, কোনো অমূর্তের দিকে তাঁর টান আছে, অথবা তিনি মনে মনেও মৃত্যুর কথা ভাবেন, এমন আমার মনে হয় নি কখনো। হয়তো এটা তাঁর অবচেতন হিন্দু মানসের একটি স্বগতোক্তি, যে মানসতা—একবার হিন্দু হয়ে জন্মালে—কোনো মতেই শেষ পর্যন্ত কেউ কাটাতে পারে না।

যামিনী রায়কে শেষ দেখেছিলাম তাঁর মৃত্যুর বছর তিনেক আগে, একটি পারিবারিক বিবাহে নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে। ফাল্গুনের সকাল ছিল সেদিন ; তিনি একতলায় তাঁর স্টুডিও-র একটি ছোটো ঘরে ছবি আঁকছিলেন তাঁর সর্বশেষ মোজেইক শৈলীতে পাটি অথবা মাদুরের উপর, এক ঝলক রোদ্দুর ছিলো ঘরের মেঝেতে ; সেই আলোয় আরো স্পষ্ট দেখা গেলো তাঁর দেহ কত শীর্ণ হয়েছে, চক্ষু কত মলিন, ত্বক কত কুঞ্চিত ; যে-সব কথা বললেন তাতে বুঝলাম তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে। বিষাদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম কিছুক্ষণ পরে—কিন্তু 'রাক্ষসী জরা' রবীন্দ্রনাথকেও যখন নিস্তার দেয় নি তখন অন্য কারো আর কথা কী!
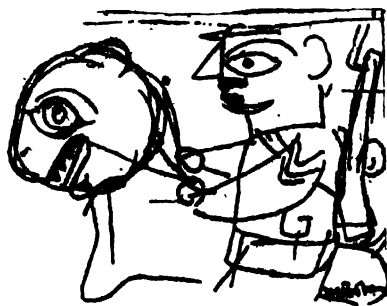
আশোক মিত্র

চিন্তায় মহাজ্ঞানী, কথোপকথনে সরল কৃষক

১৯৩৬ সালে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগে, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে এক রবিবার সকালে শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের বাগবাজারস্থিত আনন্দ চাটুজ্জে গলির বাড়িতে আমাকে নিয়ে যান। সেদিন আমার মনের ভাব ছিল বুঝি বা তীর্থদর্শনে যাচ্ছি। তার কারণ আছে। এর কিছুদিন আগে সমবায় ম্যানশনে যামিনীবাবুর ছবির একটি বড় প্রদর্শনী হয়ে গেছে। বিষ্ণুবাবু তাঁর ১৯নং গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে ইতিমধ্যে যামিনীবাবুর আঁকা একাধিক ছবি টাঙিয়েছেন। এবং 'প্রবাসী' বা 'মডার্ন' রিভিউ'তে আমি এ ধরনের ছবির প্রিন্ট কখনো দেখিনি।

বাগবাজার স্ট্রিট থেকে আনন্দ চাটুজ্জের সরু গলিতে ঢুকলে ডাইনে প্রথমে পড়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিরাট প্রতিষ্ঠান ও ঘোষেদের বসত বাড়ি। তারই প্রায় লাগোয়া যামিনীবাবুর ভাড়া বাড়ি, সেখানে তিনি বহুবছর ছিলেন। বস্তুত তাঁকে কলকাত্তাই বলার চেয়ে বাগবাজারি বললেই বেশি যথাযথ হয়। ডিহি শ্রীরামপুর লেনে নিজের হাতে বাড়ি করলেও তিনি সেখানের সঙ্গে কখনও একাত্মবোধ করেননি। বাগবাজারের বাঙালি সমাজ, সেখানকার খাওয়া-দাওয়া, জীবনযাত্রা প্রণালী, আচার ব্যবহার, অনামিত্ব, থিয়েটার জগৎ, জীবিকার বৈচিত্র্য, কুমারটুলি, চিৎপুর, জোড়াসাঁকো, বটতলার শিল্পিজগৎ তাঁকে মনেপ্রাণে এমন বেঁধেছিল যা বালিগঞ্জে কখনো সম্ভব হয়নি। কলকাতা, বিশেষত উত্তর কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। সর্বদা বলতেন, অনেক তো শুনি অমুক জায়গায় উনি এত বড়, এত মহৎ, তাঁকে কলকাতায় আসতে দাও, এখানে তাঁর চালচলন দেখি, তবে বোঝা যাবে, কত বড় বা কত শিক্ষিত ও সভ্য।

ভাগ্যিস তিনি আর বেঁচে নেই; থাকলে আজকের কলকাতার ব্যাঙ ও পুঁটিমাছদের স্ফীতি দেখলে কষ্ট পেতেন।

দরজায় আস্তে একবার কড়া নাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক দরজা খুলে গাঢ় সস্নেহ গলায় বিষ্ণুবাবুকে এবং সেইসঙ্গে আমাকে ভিতরে আসতে বললেন। পরনে খাটো আট নহাতি ধুতি, তার উপরে ঢিলেঢালা খাটো হাতের বেনিয়ান। দুটিই মনে হলো খদ্দরের। পরিষ্কার করে কাচা। খালি পা। চোখে চশমা ছিল কি না আমার মনে নেই। চেহারা দেখে আমি একটু চকিত হয়ে গেলুম। সে-যুগে কলকাতার মগজে মহলে পরশুরামের লালিমা পাল পুং-সুলভ সূক্ষ্ম, ন্যুব্জ দেহ, নারীসুলভ ব্রীড়া ও দ্বিধা এবং মিহি গলাই বেশি চলন ছিল। কায়িক পরিশ্রম বা দৈহিক বলের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক আছে, একথা স্বীকার করতে যেন লজ্জা পেতেন। কিন্তু এ ভদ্রলোক অনায়াসে দক্ষিণ রাঢ়ের প্রজা শায়েস্তা করা জোতদার হতে পারতেন। মাথা যেন সিংহের মতো প্রকাণ্ড; শক্ত পেশীতে এবং হাড়ে গড়া। ঘাড় যেন গোছা গোছা ইস্পাতের কাছি দিয়ে তৈরি। বৃষস্কন্ধ জাহাজের পাটাতনের মতো চওড়া বুক, শালপ্রাংশু মহাভুজ। পাশ থেকে দেখলে পিকাসোর চেহারার ও মুখের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কেবল মুখোমুখি চাউনিতে সম্পূর্ণ তফাত। পিকাসোর চাউনিতে তীক্ষ্ম, মর্মভেদী, সাপের চাউনির মত এক সম্মোহনী শক্তি ছিল। যামিনীবাবুর দৃষ্টি যদিও তীক্ষ্ম তবুও অত্যন্ত নরম, এমনকি ক্ষমাসুন্দর বলা যায়। ভারতীয় সভ্যতাতেই বোধহয় এই ধরনের চাউনি সম্ভব।

অভ্যর্থনায় কোনও আতিশয্য নেই। আদর যত্নের বাহুল্য নেই। অথচ এমন এক সহজ আন্তরিকতা, যা মুহূর্তেই আগন্তুককে আপন করে। এত অকপট সহজভাবে আমি এক সত্যেন বোস মহাশয় ছাড়া, আর কোনও আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সহসা দেখিনি। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার এবং আত্মীয়তা। উঁচুনিচু, বড় ছোট, ধনী-নির্ধনের তফাত নেই। নিজেকে জাহির
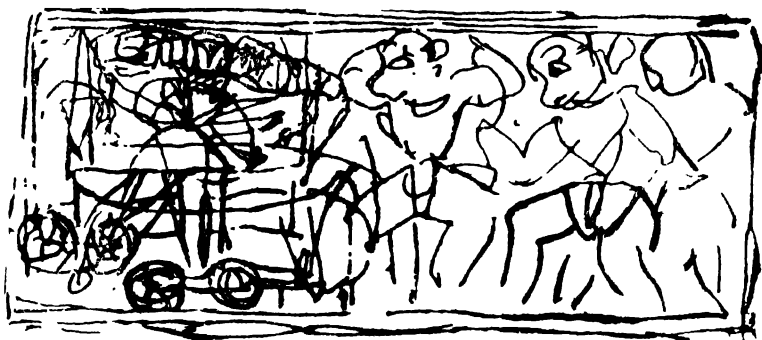
করার কোনও তাড়া নেই ; ভাবখানা আমাকে যা দেখছেন আমি তাই। ১৯:৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের আমি ওঁর বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছি। তারমধ্যে অনেক মহারথীও আসতেন। আমেরিকান দের মধ্যে বিশেষ করে 'নিউ ডিল' নীতির সঙ্গে জড়িত অনেক মনীষীকে দেখেছি। এমন বাঙালী বা ভারতীয় আমি খুব কমই দেখেছি যিনি বাড়িতে শ্বেতকায় মহোদয় বা মহিলা এলে ব্যবহারে একটু অতিরিক্ত খাতির, সম্ভ্রমভাব, আত্মীয়তা বা কৃতার্থ বোধ না দেখিয়েছেন। কিন্তু যামিনীবাবুর ব্যবহারে আমি কোনওদিন বিন্দুমাত্র এই ধরনের অতিশয্য দেখিনি।

প্রথমেই বিষ্ণুবাবুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন, বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন। তারপর আমার পরিচয় নিলেন। ইতিমধ্যে যা বিশেষভাবে চোখে পড়ল এ বাড়ির আসবাবপত্রের অভিনবত্ব। অন্যবাড়ির মতো একেবারেই নয়। পাশাপাশি দুটি দেয়ালের গা ঘেঁষে চারচৌকো ছোট ছোট টুল পাশাপাশি বসানো। দেয়াল বরাবর লম্বা বেঞ্চির মতো। চৌকিগুলি ঠিক ততখানি উঁচু যার ওপরে স্বচ্ছন্দে পা ঝুলিয়ে বসা যায়, ওঠার সময়ে কষ্ট করতে হয় না। প্রত্যেকটি সাদা বড় দোসুতি কাপড় দিয়ে ঢাকা। লাল মসৃণ, ঝাঁট দেয়া, জলে মোছা মেঝে। দেয়াল, ছাত সাদা, যেন সদ্য চুনকাম করা, কোথাও ঝুল নেই, কোণে ময়লা নেই। খানিকক্ষণ পরে যামিনীবাবু বিষ্ণুবাবুকে বললেন, চলুন নতুন যা এঁকেছি দেখাই। ছেলে মৃণালকে ডাকলেন। তখনও পটলবাবু বড় হননি। ভারী শরীরের পূর্ণ ওজন পায়ের উপর পড়ছে। কুমোররা যেমন তাদের উঠোনে হাঁটে, ইতস্তত পড়ে-থাকা হাঁড়ি কুঁড়ি হাতের তৈরী কাঁচা পাত্র বাঁচিয়ে, সেইরকম দু পা ঈষৎ ফাঁক করে, আস্তে আস্তে থপ থপ করে, অথচ বলিষ্ঠ পদে হাঁটা। কাঁধ ঈষৎ সামনের দিকে ঝোঁকা তাতে সিংহভাব আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। গলার স্বর নরম, অথচ প্রতিটি কথা স্পষ্ট। অধিকাংশ বাক্যই অসম্পূর্ণ অথচ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত। যে ছবিগুলি দেখাবেন, ঠিক করেছেন, সেগুলি

প্রতিটি নিজের হাতে দেয়ালে ঠেসিয়ে পাশাপাশি সাজালেন। প্রতিটির উপর যথাযথভাবে আলো পড়ছে কিনা দেখে, ফের অদলবদল করে রাখলেন। ক্বচিৎ মৃণালকে ছবি আনার জন্যে আদেশ করলেন। প্রায় সব কাজই নিজে করলেন। মৃণালকে বললেন, মাকে বলো, বিষ্ণুবাবুরা এসেছেন। বিষ্ণুবাবু ছবি দেখতে লাগলেন। যামিনীবাবু আমাকেও দেখার সময় দিলেন। ওরই মধ্যে আমার সঙ্গে অন্য কথাও বললেন যাতে আমার অপরিচিতের আড়ষ্টভাব কাটে।

কিছুপরে যামিনীবাবুর স্ত্রী এলেন। আটপৌরেভাবে শাড়ি পরা, চাবিরগোছা খুঁটে-বাধা আঁচল বাঁ কাধের ওপর দিয়ে পিঠে ফেলা। চলন অত্যন্ত নরম, সুলক্ষণা বাঙালি গৃহিনীর মরালগতি। মুখের দিকে চাইলে থমকাতে হয় কারণ সে-মুখের পটসুলভ প্রতিচ্ছবি যামিনীবাবুর ছবিতে ইতিমধ্যেই অমরত্বলাভ করেছে। শান্ত, স্থির প্রকৃতি, অথচ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ম বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যোগ্য সহধর্মিণী। বিয়ে মাখা মুড়ি ভাগ করে দিলেন, তার সঙ্গে মটরভাজা। পরে তৈরী করা চা পেয়ালায় ঢেলে দিলেন। মৃদুস্বরে কথা বলে, খাইয়ে দাইয়ে বাসনপত্র গুছিয়ে তুলে চলে গেলেন।

এই প্রথম দর্শনের পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত অগুনতিবার আনন্দ চাটুজ্যে লেনে এবং ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে গেছি। কোনওবারই প্রথমবারের অভ্যর্থনা বা আপ্যায়নের ব্যতিক্রম হয়নি, যদিও তাঁর কাছে থাকার সময় দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়েছে। তাঁর কাজের বিস্তর ক্ষতি করেছি, কারণ যখনই গেছি তখনই দেখেছি কাজ করছেন, কাজ ছাড়া কোনও সময়ে দেখিনি।' ইতিমধ্যে যামিনীবাবুর সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট ঘটেছে। (বিষ্ণুবাবুর কাছে শুনেছি, অত্যন্ত দুর্দিনেও তাঁর দেশের সম্পত্তি ও চাষ থেকে যা আয় এবং সংসারের রসদ আসত তা শহরের যে কোনও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবি সচ্ছল জীবিকার থেকে কিছু কম নয়। তাছাড়া নানাভাবে সাহায্যকারী হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব যামিনীবাবুর কোনও দিন ছিল না।) চল্লিশের দশকে তিনি নতুন বাড়ি করেছেন। আয়করের লোকেরা তাঁকে যখনই উত্যক্ত করেছে, উপযুক্ত স্থলে জানিয়ে তাদের তিনি নিরস্ত করেছেন। কিন্তু এসব বৈভব তাঁর গৃহসজ্জায়, দৈনন্দিন ব্যবস্থায়, বসনে ভূষণে, আহারে, আচারে ব্যবহারে, অতিথি আপ্যায়নে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা বৈপরীত্য আনেনি। কালের গতি তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যে প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু তাঁর সংসারের হালচালে কদাচ নয়।

কবি ইয়েট্‌স্‌ একাধিকবার লিখেছেন তাঁর বান্ধবী লেডি গ্রেগরি প্রায়ই অ্যারিস্টটলের নাম নিয়ে বলতেন, 'চিন্তা হবে মহাজ্ঞানীর মতো, কথা হবে সরল কৃষকের মত'। আমাদের দেশে এ ঐতিহ্য বহু যুগের সহজিয়া কবিতা, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, আউল বাউল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ।

আমার জীবনে আমি দেখেছি যামিনী রায়, সত্যেন বসু, নির্মল বসু, যমদত্ত, রামকিংকর, কমল মজুমদারের কথোপকথনে। সেজান, ভ্যান গগ, মনে, মাতিস, পিকাসো বিষয়ে যামিনী রায় এক আধটি তুলির টানে অথবা কাগজে কয়েকটি রেখায় জমি ভাগ করে এত সহজভাবে ব্যাখ্যা করতেন যা আমি রজার ফ্রাই বা হার্বার্ট রিড-এ পড়িনি। বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র কমল মজুমদার, যমদত্ত ও পৃথ্বীশ নিয়োগী ওইরকম প্রাঞ্জল, নিরক্ষর ব্যক্তির ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তুলনায় শাহিদ সুরাবর্দির ভাষাও মাঝে মাঝে হেঁয়ালি বা কথার ভুরভুরি মনে হত।

গল্পও করতে পারতেন অদ্ভুদ। একদিন বললেন: হামফ্রি হাউস (আমার অধ্যাপক) এসেছিল, বাবা। অত্যন্ত উঁচুদরের লোক, জিগ্যেস করলুম, কলকাতা কেমন লাগছে। সবারই এক রা, বললে, খুব ভাল লাগছে, আমাদের ইচ্ছে এখানেই বরাবর থাকব। আমি বললুম, ওই তো তোমাদের বিপদ। দেখ, নিজেদের দেশে যতদিন তোমরা থাক ততদিন তোমরা অতি মহৎ জাত। তুলনা নেই। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ সুয়েজ পেরিয়ে এ অঞ্চলে যদি পাঁচ বছর থাকে, তবে প্রভুর প্রাপ্য চাকরবাকর, লোকজনের কুর্নিশ সেবা পেয়ে সে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। তার চরিত্রে কুষ্ঠরোগ ধরে। পাঁচ বছরের বেশি কিছুতে থাকবে না। (সুখের বিষয় হাউস পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগেই দেশে ফিরে গেছলেন।)

আমি সিভিল সার্ভিসে চাকরি পেলুম। যামিনীকাকা একদিন বললেন, বাবা, একটি কথা মনে রেখ। যে-কাজে তোমার অন্নসংস্থান হয়, সে কাজ কখনও অবহেলা করবে না। সেই কাজ সদাসর্বদা মনপ্রাণ দিয়ে করে যদি অবসর থাকে তবেই অন্যকাজে মন দিয়ে যশের কথা ভাববে। তা না হলে চরিত্র নষ্ট

হবে। একূল ওকুল দুকুল যাবে। কথাটা কত সত্যি আমার অগ্রজ সহকর্মীদের মধ্যে দেখেছি। কাজ শুরু করার পর একদিন কলকাতা এসে গেছি। তখন বিয়ে করেছি। যামিনীকাকা আশীর্বাদী উপহার দিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, তেলে আঁকা। বিরাট কপাল, বিরল কেশের মধ্য দিয়ে, আশঙ্কায় ও ক্রোধে সিঁদুরবর্ণ, দৃষ্টিতে যন্ত্রণা সুস্পষ্ট। সেই সময়ে 'সভ্যতার সংকট' লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের এরকম প্রতিকৃতি আমি দ্বিতীয় দেখিনি। যা বলতে যাচ্ছিলুম। নতুন বৌকে কাকিমা বেলেতোড় থেকে আনা ঘি আর মুড়ি মেখে, বেলেতোড়েরই মেচা দিলেন। যামিনীবাবু বললেন, মা তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার স্বামীদের অনেক ক্ষমতা। এই ভেজাল দেওয়াটা যেখানে যাবে সেখানে বন্ধ করাবে। আমাকে বললেন, দরকার হলে গভীর রাতে একটা পাঁঠা কেটে তার রক্ত কাপড়ে বেশ করে মাখিয়ে পরের দিন বাজারে টাঙিয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেবে, অমুক লোক। (আজগুবি নাম দেবে, তাতে দোষ নেই), ঘিয়ে ভেজাল দিয়েছিল বলে তাকে কেটে ফেলেছে, তারই এই রক্ত। বলা বাহুল্য, ভেজাল বন্ধ করতে আমি পারিনি। তবে ১৩৫০-এর মন্বন্তরে বিক্রমপুরে ওই জাতীয় দু-একটি কাজ করার ফলে চালের চোরাচালানকারীরা বেশ শায়েস্তা ছিল। ১৯৭৫ সালে যখন মুন্সীগঞ্জে আবার যাই দূরদূরান্তরে গ্রাম থেকে বহু হিন্দুমুসলমান, যাঁরা মন্বন্তরে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন।

একদিন বললেন: অমুককে চেন বাবা? কন্দর্পের মত চেহারা, নাহার বাড়িতে থেকে রিসার্চ করে, দীনেশ সেন স্নেহ করেন। সেদিন এসেছিল। হাতে খট্টাঙ্গপুরাণের মতো একটা জিনিস কাপড় দিয়ে সযত্নে মোড়া। প্রণাম করে, আস্তে আস্তে খুলে মেলে ধরলে। ভিতরে কয়েকটি পট, মন্দিরের কাজ করা টালি আর পুঁথির চিত্রকরা পাটা। তোমার কাকিমা চা দিলেন। কথাবার্তা বলল। তারপর বললুম এবার এস। আর এস না। বড় হলে তুমি হয় খুব বড় সাধু হবে, না হয় খুব বড় ডাকাত হবে। ভদ্রলোক পরে দ্বিতীয়টির দিকে ঝুঁকেছিলেন। তবে বাঙালি তো কদাচিৎ খুব বড় হয়, সেজন্যে কাকাবাবুর কথা সবটা ফলেনি।

বোধহয় ১৯২৫ সালে, একদিন বললেন, কাল স্টেলা (ক্রমরিশ) এসেছিল। চীন ঘুরে এসেছে। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বলল এত বড় সভ্যতা এবার নষ্ট হয়ে যাবে। যাদের তারা শত্রু মনে করে। শহরের মধ্যিখানে পার্কে তাদের জড়ো করে, তরোয়াল দিয়ে তাদের মুণ্ডু কাটে। বন্দুকের গুলিও ব্যবহার করে না। এমন নৃশংসতা কখনো ভাবতে পার? সে কী কান্না! আমি বললুম, দোষটা কী? আগে তো তাই করতো। তোমাদের দেশেও। গরিব দেশে শুধু শুধু গুলি খরচা করবে কেন? শুনে আরো জোরে কেঁদে বললে, যামিনী তুমিও এই কথা বলতে পারলে?

ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ির উপর দিয়ে যখনই উড়োজাহাজ যেত তখনই দু হাত দিয়ে মাথা চাপা দিতেন। ওই প্লেনের কলকব্জা এদেশের লোক তো করেনি জানেও না, শুধু চালাতে শিখেছে, কখন ভেঙে পড়বে কে জানে!

সুভো ঠাকুর, বিষ্ণুবাবু, কমলবাবু বেঁচে থাকলে; সুনীল জানা, পৃথ্বীশ নিয়োগী এদেশে থাকলে; সন্ধ্যাবেলা জলচিকিৎসার আসরে এসব স্মৃতি দপদপ করে জ্বলে উঠত। আজকালকার সদা-ধান্ধায়মত্ত মগজে-বাবুদের কাছে এসব কথা নিশ্চয় জোলো লাগবে।

অহিভূষণ মালিক

যামিনী রায় কি লোকশিল্পী

কয়েক বছর আগে একবার মুখোমুখি হয়েছিলাম কালিঘাটের বিখ্যাত পটুয়া, অধুনামৃত রজনীকান্ত চিত্রকরের। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কালিঘাটের পটশিল্পের সঙ্গে যামিনী রায়ের কাজের কোন সাদৃশ্য আছে কি না। তিনি চিন্তা করে নিয়ে বললেন—বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পটুয়াদের কাজের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ মিল আছে। যামিনী রায় কোন মতেই একজন পটুয়া ছিলেন না। যদিও তাঁর শিল্পকলা আপাতদৃষ্টিতে পটের মতই দেখাত কিন্তু যে বিশেষত্ব কালিঘাটের পটকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে তা কখনোই যামিনী রায়ে দেখা যায় নি। কিছু বিখ্যাত সমালোচক কিন্তু মন্তব্য করেছিলেন যে কালিঘাটের শিল্পচর্চাকে যামিনী রায় পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। আমি কিন্তু রজনীকান্তের সঙ্গে একমত। নতুন করে পটচিত্র আঁকতে গিয়ে যামিনী রায় পটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি এই শিল্প থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে তাঁর অত্যন্ত পরিমিত ও মার্জিত রঙ ও রেখার সাহায্যে যে শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন তাকে কোনভাবেই লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব রীতি অনুযায়ীই গড়ে উঠেছিল যা ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত। পরিশীলন অবশ্যই শিল্পের একটি মহৎ গুণ। তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁকে অনুকরণ করেছেন মাত্র।

ইউরোপীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষিত হয়ে যামিনী রায় তাঁর প্রাথমিক শিল্পী জীবনে ইউরোপীয় রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তেলরঙে তাঁর পোর্ট্রেট

চিত্রণ চমৎকার এমন কি নিও-ইমপ্রেসনিস্টিক বিষয়ও তিনি পিসারিয় রীতিতে এঁকেছেন। কিন্তু যখন জাতীয়তাবাদীদের আহ্বানে বাঙালী শিল্পীরা সাড়া দিলেন এবং জাতীয়তাবাদী ঘরাণায় শিল্পসৃষ্টিতে প্রয়াসী হলেন তখন যামিনী রায়ও এই প্রয়াস নিলেন এবং দেখলেন বাংলার লোকশিল্পের মধ্যেই আছে দেশীয় রীতির সন্ধান। বাঁকুড়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের টেরাকোটা তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বাগবাজারের বসুভবনের দরজা—জানলার কাচের উপর চিত্রিত ছবিগুলি গভীর ভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

এগুলি সম্ভবতঃ অঙ্কিত হয়েছিল কালিঘাটের পটুয়াদের হাতে। এই বাড়ীর মালিক নন্দলাল বসু ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একজন শিষ্য। রামকৃষ্ণদেব কাচের উপর চিত্রিত এই সুন্দর ধর্মীয় ছবিগুলি দেখতে মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে আসতেন। আমি শুনেছি বোসেদের প্রতিবেশী যামিনী রায় যখন তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠা করতে সনাতন শিল্পরীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করছিলেন তখনই তিনি বোসবাড়ীর ছবিগুলির খবর পান। তৎকালীন তরুণ শিল্পীদের সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করেছিল যে বাংলার শিল্পরীতি তা যামিনী রায়ের মধ্যে কোন রকম ছাপ ফেলতে পারে নি। তিনি দৃঢ়ভাবে এর প্রতিরোধ করেছিলেন বলা যায় সংগ্রাম করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন একটি নিজস্ব ধারার শিল্পচর্চার প্রবর্তনে। এটা প্রকৃতপক্ষে কালিঘাটের

পটশিল্পের পুনরুজ্জীবন নয়। এটি হল লোকশিল্পের উপর সুচিন্তিত চর্চার ফসল।

তাঁর শিল্পের একান্ত নিজস্বতার জন্য যামিনী রায় বিশ্বের দরবারে একজন খ্যাতনামা শিল্পী। শিল্পে পুরোপুরি মৌলিক বলে কিছু নেই। পূর্বসূরীরা যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকেই তাকে আরও উন্নত করেন প্রতিভাবান শিল্পীরা এবং যেখানে তাঁরা শেষ করেন সেখানেই আবার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যান চর্চার উন্মুক্ত ক্ষেত্র—ঠিক রিলে দৌড়ের মত। শিল্পী জীবনের প্রাথমিক স্তরে লোকশিল্পের যে রীতিকে যামিনী রায় মূলত ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সেই রীতি উন্নত হয়ে যে পরিণতি লাভ করল তা একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব—যাকে কোন মতেই লোকশিল্প বলা যায় না। আজকের ভারতীয় শিল্পের একটি প্রধান স্তম্ভ যামিনী রায়। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন—কিন্তু তাঁর সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভবত এখনও হয় নি॥

ভাষান্তর : মল্লিকা রায়

সুধীর নন্দী

শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রসাধনা

শিল্পীলোকের দিগন্ত অপসৃয়মান এবং তার সম্ভাবনাটুকু আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্রের মধ্যেই বিধাতা পুরুষ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। মনুষ্যশিল্প দেবশিল্পকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল, অনুকরণও করেছিল এবং সেই আদিম মনুষ্যশিল্পী তার ছবির প্রথম রেখার টানেই দেবশিল্পের অনুকৃতিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল অনায়াসে। মহাদার্শনিক হেগেলের কথা উদ্ধৃত করে বলতে পারি যে, প্রকৃতি যে-সব মালমশলা নিয়ে সৃষ্টি-সৃষ্টি খেলা খেলেছিল, তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সুষ্ঠু সৃষ্টির পথে আত্যন্তিক বাধা। প্রকৃতির মধ্যে, তার সহজ শিল্পকর্মের মধ্যে, যেটুকু অপূর্ণতা থেকে গেলো তা হচ্ছে তার উপকরণের অপূর্ণতা। সৃষ্টির অরিত্র প্রকৃতি শক্ত হাতেই ধরেছিল কিন্তু তবুও তা লক্ষ্যে পৌঁছুলো না। ডাক পড়লো মনুষ্যশিল্পীর। বর্ণবহুল বসন্তের ঐশ্বর্য-সম্ভার থেকে শীতরিক্ততায় সমাদৃত বৈরাগী প্রকৃতির অতুলনীয় বর্ণরিক্ততাটুকু শিল্পী প্রত্যক্ষ করলেন। মহৎ ঐশ্বর্য থেকে কেমন করে মহত্তর বৈরাগ্যটুকুকে আহরণ করা যায় তার মন্ত্রগুপ্তিটুকু শিল্পী শিখলেন প্রকৃতির কাছ থেকে। যে ঐশ্বর্য অতিগোচর তার মূল্যকে অস্বীকার করে তিনি দেখলেন সেই ঐশ্বর্যকে যা প্রচ্ছন্ন হলেও দিগন্তপ্রসারী ব্যঞ্জনায় বিসর্পিত। এই ব্যঞ্জনা-তত্ত্বটুকু কবি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন প্রকৃতির কাছ থেকে, পরিপাটী করে তাকে পরিবেশন করলেন আর এক পরিপ্রেক্ষণায়। বর্ণাঢ্য জটিলতা থেকে শুভ্র সারল্যের আবির্ভাব ঘটলো। দেবশিল্প থেকে মনুষ্যশিল্পের আবির্ভাব ঘটলো।

সমগ্র শিল্প বিবর্তনের ধারা-ইতিহাসটুকু আর একভাবে প্রত্যক্ষ করেছি

শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পে। সেখানেও দেখেছি সেই বর্ণসুন্দর বার বার এসেছে যামিনী রায়ের চিত্রপটে : আবার তার ঘটেছে অন্তর্ধান। শুভ্র, রিক্ত, সুন্দরও প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে ঐকান্তিক আগ্রহে যামিনী রায়ের চিত্রপটে। বর্ণসুন্দরের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ঘটেছে, সংঘাত হয়েছে। অবশেষে এই সহজ সুন্দরের এই নিরাভরণ রিক্ত সুন্দরের জয় হয়েছে। তার বিজয় নির্ঘোষ কান পেতে শুনেছি যামিনী রায়ের সমগ্র চিত্র-জগৎ জুড়ে। দেশ বিদেশ থেকে শিল্পীকে যে বৈজয়ন্তীমালা দিয়ে অভিনন্দন করা হয়েছে তাই এই রিক্ত সুন্দরের বেদীমূলে সমর্পিত অর্ঘ্য।

বারো বছর বয়সে শিল্পী বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীতে বসে যা খুশী তাই আঁকলেন। আঁকার ছন্দটুকু লীলায়িত, ছবি হলো স্বতঃস্ফূর্ত। অনেক ছবি এঁকে চলেছেন : সৃষ্টির প্রেরণায় প্রাণিত কিশোর শিল্পী। কী মহৎ ক্ষুধার আবেশে শিল্পী আবিষ্ট হয়েছিলেন তার কথা আমরা জানি না ; হয়তো তার সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাল্মীকি। শিল্পীর আত্মানুসন্ধান চললো ; প্রকাশের পথে তিনি নিজেকে সার্থক করতে চাইলেন। রূপের সন্ধানে, রসের সন্ধানে কবি আপন শক্তিকে রীতির বন্ধনে বাঁধতে চাইলেন। কিশোর শিল্পী কলকাতায় এসে গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি হলেন : ১৯০৪ সাল। যে রসের সন্ধানে কিশোর-চিত্ত উন্মুখ তার সন্ধান মিলছিলো না স্কুল অব আর্টসের চৌহদ্দির মধ্যে। তিনি বার বার তাই বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন আবার নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন। তিনি শেষবার যখন স্কুলে যোগ দিলেন তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রাউন সাহেব। অধ্যক্ষ ব্রাউন একদিন আবিষ্কার করলেন যে, কিশোর শিল্পী যামিনী রায় কাট বোর্ডে ছোট্ট একটি চৌকো গর্ত করে তার মধ্য দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত প্রকৃতির বন্ধনহীন রূপসাগরের লক্ষ কোটি ঊর্মিমালার কয়েকটিকে ধরবার সাধনায় তন্ময় হয়ে গেছেন। অধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন কিশোর শিল্পীর এই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে প্রত্যক্ষ করার সাধনা। রেখা এবং রঙের সীমানা টেনে যে ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম শিল্পী সৃষ্টি করেন তারই অন্তরে যে ভূমার প্রতিষ্ঠা এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন সেই কিশোর শিল্পী। সুস্পষ্ট রেখায় অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলার যে রীতি কিশোর শিল্পী সেদিন আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তা হলো তার শিল্পবিবর্তনের মর্ম কথা। শিল্প-তত্ত্বের পরিভাষায় বলা চলে যে কিশোর শিল্পী কম্পোজিশনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এ যুগে।

ছবি আঁকা চললো। স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে বিরাট পৃথিবীর সৌন্দর্য, মাটির গন্ধ আন্দোলিত শীর্ষ নব দূর্বাদলের শিহরণ শিল্পী মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এই সৌন্দর্যের ঢেউ শিল্পী-মনকে অনুকারের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করলো। শিল্পী প্রতিকৃতি অঙ্কন বা পোর্ট্রেট পেইণ্টিং-এর দিকে মন দিলেন। এই

অনুকৃতির সাধনা চললো দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। অনেক ছবি আঁকা হলো। শিল্পীমন অশান্ত হয়ে উঠলো পশ্চিমী রীতিতে (western technique) আঁকা প্রতিকৃতিগুলো বাঙময় হয়ে উঠলো ; কবি তাঁর স্টুডিয়োতে বসে নিভৃত আলাপচারী করেন তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে। কিন্তু এ ভাষা তো তাঁর অন্তরের কথা বলে না, হৃদয়ের অপরিমেয় সম্পদকে উদ্ঘাটিত করে দেয় না। ভাষার সন্ধানে শিল্পী মেতে উঠলেন ; যে ভাষা ঐকান্তিকভাবে শিল্পীর মনের কথাটুকু ব্যক্ত করতে পারে ; সে মন যে ঐ বেলেতোড়ের মাটি থেকে, তার আকাশ বাতাস থেকে, তার গাছপালা থেকে আপনার ঐশ্বর্যটুকু আহরণ করেছিল। সে মন মাটির ভাষা বোঝে, মাটির গানে ভরে ওঠে। তাই শিল্পীর সাধনা চললো সেই অনন্য ভাষাটুকু খুঁজে পাবার জন্য। অপরের ভাষায় শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। তাই তো তিনি Oriental School of Arts-এ যোগ দিলেন না। ছবি আঁকা চললো, গ্রাম্য-জীবনের ছবি 'সাঁওতাল, মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি আঁকা হলো। ছবির উপজীব্য আমাদের অতি পরিচিত দৈনন্দিন জীবন নাট্যের কুশীলবগণ।

যোগাযোগ ঘটল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রূপের সন্ধানে ব্যাকুল যামিনী রায় শিল্পাচার্যের কাছে আপনার রূপব্যাকুল মনের আকুতিটুকু নিবেদন করলেন। অবনীন্দ্রনাথ যামিনীবাবুকে উপদেশ দিলেন : "নন্দর কাছে শেখ।" শিল্পাচার্য ভুল বুঝলেন যামিনীবাবুকে। যামিনীবাবু আঙ্গিক-শিক্ষার্থী নন ; তিনি শুদ্ধ মূর্তির সন্ধানে, রূপের সন্ধানে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সাধারণ অর্থে 'শেখা' হয়তো শিল্প শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব আর এই তত্ত্বটিই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র তাঁর 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করে বলেছেন যে, রীতি-আঙ্গিক সম্বন্ধে অনুসর্তব্য বিধি বিধান শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য, শিল্পীর জন্য নয়। সেদিন হয়তো অনবধানতাবশতঃ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের মধ্যে সেই শিল্প-শিক্ষার্থীকেই দেখেছিলেন, শিল্পী হয়তো নেপথ্যে ছিল ; তাই তিনি তাঁকে যে উপদেশ দিলেন তা যামিনীবাবুর মনঃপূত হলো না। নিঃশব্দ সঙ্কোচে শিল্পী সরে এলেন শিল্পাচার্যের কাছ থেকে তাঁর নিভৃত নিকেতনের মাঝখানে। নিঃসঙ্গ সাধনায় দুচোখ ভরে দেখা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা গ্রাম্যজীবনের শান্ত সৌন্দর্য ফুটে উঠতে লাগলো একের পর এক ছবিতে। শিল্প রসিকেরা এই নবীন শিল্পীকে সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। স্বীকৃতি পেতেও দেরী হলো না। ভাইসরয়ের স্বর্ণপদক শিল্পীর কণ্ঠে দুলিয়ে দিলেন সে যুগের কলারসিকেরা। স্বীকৃতির ধারাজলে স্নান করে ক্ষণিকের জন্য তিনি স্বস্তি পেলেন।

শিল্পরীতির উদ্বর্তন চললো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেগেই আছে। এবার যামিনীবাবু flat technique-কে আশ্রয় করলেন, কতো কম রঙে এবং রেখায়

ছবি আঁকা যায় তারই পরীক্ষা। কাব্যে যেমন অতিকথনদোষ কাব্যসৌন্দর্যে হানি ঘটায়, অঙ্কনকার্যেও তেমনি রং ও রেখার বাহুল্য ছবির সৌন্দর্য হানি করে। ছবিতে আঁকা পাত্র-পাত্রীর অঙ্গসজ্জা বা drapery কত কম রঙে এবং রেখায় সুব্যক্ত করা যায় সেটুকু যামিনীবাবু তাঁর সুমিত আঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করালেন রসিক-সুজনকে। Oriental Arts Society-তে চিত্র প্রদর্শনী হলো। নবু ঠাকুর খ্যাতনামা শিল্পরসিক, গগনেন্দ্রনাথের পুত্র, তিনি এই চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, তাঁর আহ্বানে যামিনীবাবু আপনার কয়েকটি ছবি দিলেন এই প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে। নতুন করে আবার যামিনীবাবুর শিল্প-প্রতিভা স্বীকৃত হলো। মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ যামিনীবাবুকে আশীর্বাদ করলেন। Flat technique এ আঁকা 'মা ও ছেলে' শীর্ষক ছবিখানি গগনেন্দ্রনাথ ক্রয় করলেন। তিনি তখন বাক্‌শক্তি-রহিত। তবুও ছবির আবেদনে সাড়া তুললো শিল্পীসভার অণুতে পরমাণুতে। প্রশংসার ভাষা নেই; যামিনীবাবুর আঁকা ছবির সামনে গগনেন্দ্রনাথ আত্মস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো। সে যুগের মহাশিল্পীর আশীর্বাদ অশ্রুধারায় সিঞ্চিত হয়ে ঝরে পড়লো এ যুগের মহাশিল্পীর মস্তকে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন যামিনীবাবুর শিল্পরীতির উদ্বর্তন। Flat technique-এ আঁকা ছবি দেখে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর যামিনীবাবুকে করা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল : 'ততঃ কিম্ ?' এ প্রশ্ন যামিনীবাবুর অন্তরের প্রশ্ন। ১৯২৮ সাল; যামিনীবাবুর মানসলোকে আবার সেই অস্থিরতার ঝড়। এতোদিন যা এঁকেছি, এতোদিনের রূপকর্ম সবই 'এহ বাহ্য'। নতুন আঙ্গিকে নতুন ভাষায় আপনার মনের কথাটুকু বলতে হবে; পরিমিতি বোধটুকুকে আরও কৃশকায় করে তুলতে হবে। অর্থাৎ রং, তুলির বিদায় দিতে হবে ছবির জগত থেকে। শিল্পী মন দিলেন line drawing-এ। রেখা, সন্নত রেখা, বিসর্পিত রেখা, সরল রেখা, বক্র রেখা শুধু এই রেখা দিয়েই জীবনের সহজ ছন্দটিকে ফোটাতে হবে। সহজ ছন্দ অর্থাৎ Simplicity এবং Balance-এই দুটি শিল্পগুণকে সংযোজিত করতে হবে আপন শিল্পকর্মে। উপনিষদকার একে বলছেন ছন্দ। এই ছন্দই মানুষের জীবনকে মানুষের শিল্পায়নকে এবং মানুষের জীবনায়নকে বিধৃত করে রেখেছে আনন্দের মধ্যে। এই ছন্দ বা Balance-এর সন্ধানে তখন শিল্পী বিভোর হয়ে আছেন। চার বছরের ছেলে অমিয় শ্লেটে একটি ছবি এঁকে পিতৃদেবকে দেখাতে আনলেন ছবিটা। অন্যমনস্কভাবে শিল্পী শ্লেটটি চোখের সামনে তুলে ধরলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি! পুত্রের আঁকা সরল অনাড়ম্বর মুখের দিকে চেয়ে মন ভরে উঠলো; মন বললো পেয়ে গেছি। যে রূপ সর্বঐতিহ্যের বন্ধনমুক্ত, যে রূপ পূর্ণবয়স্ক মানুষের

সংস্কারবন্ধ নয় সেই রূপটুকু ফুটে উঠলো শিল্পীর মানসনেত্রে একদিন যেমন মহাকবি ওয়ার্ডস্বার্থের চোখের সামনে সেই 'Cragey Hill'-টা বিন্ধাচলের মতোই হঠাৎ মাথা তুলতে আরম্ভ করে দিয়েছিলো ঠিক তেমনি করেই শিল্পী যামিনী রায়ের চোখের সামনে শিশুশিল্পী অমিয়ের আঁকা ছবিটা প্রাণস্পন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন শিশুর মতো ঐতিহ্য-বিরহিত রীতিতে সহজ করে ছবি আঁকতে হবে, ছবির উপজীব্য সেই গ্রাম্যজীবন। তবে পটুয়া শিল্পীরীতি তাঁর জন্য কোন আবেদন বহন করে আনলো না।
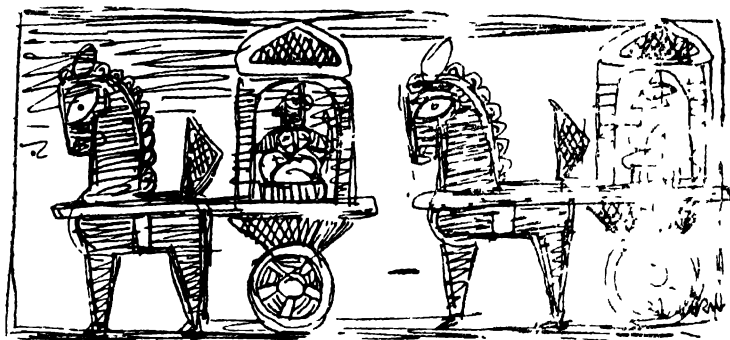
সেই গ্রামীন শিল্পরীতি কলুষিত এবং নানান ধরণের অশুভ প্রভাবে প্রভাবিত। আমরা একবারও যেন না ভাবি যে যামিনীবাবুর শিল্পরীতি গ্রামপটুয়ার শিল্প-আঙ্গিকে সংস্কৃত সংস্করণ। যামিনীবাবুর শিশুপুত্র অমিয়ের শ্লেটে আঁকা ছবির উল্লেখ করলেন এই কারণে যে এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর মধ্যে যামিনী রায়ের শিল্পধর্মকে বোঝাবার উপযোগী অনুধাবন সূত্রটুকু লুকিয়ে রয়েছে। সুন্দরের প্রতি শিশুর যে সহজাত প্রবণতা (Pure instinct) রয়েছে সেই প্রবণতাটুকুই হবে শিল্পসৃষ্টির উৎস। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মানসিকতা বিমুক্ত একটি সহজ মনন সম্পদের অধিকারী হতে হবে শিল্পীকে। ছবির মধ্যে দিয়ে শিশুর দেখা, শিশুর কথা বলাকে অমেয় মাধুর্যে রূপায়িত করতে হবে। শিশুর দেখার মধ্যে যে বিস্ময়, শিশুর প্রকাশের মধ্যে যে আদিম মানুষের প্রকাশের আনন্দটুকু লুকিয়ে থাকে তাকেই উদ্বারিত করতে চেয়েছেন শিল্পী যামিনী রায় আপন শিল্পকর্ম্মে। তিনি উপলব্ধি করলেন শিশুর দেখায়, তার উপলব্ধিতে যে রূপ প্রতিভাত হয়, শিশুর জিজ্ঞাসায় যে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশিত হয় তা তো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে অবহেলার বিষয় নয়। আত্যন্তিক মূল্যে শিশুর জানার জগত থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জানার জগতের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই সত্যটি যেমন শিল্পী যামিনী রায় উপলব্ধি করলেন তেমনি করে এটির উপলব্ধি ঘটেছে আরও বহু কবি-মনীষীর মনে। শিশুমনের সুগভীর

জিজ্ঞাসার কথা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা পড়েছি, পড়েছি Walt Whitman-এর কবিতায়। তাঁর Grass শীর্ষক কবিতাটির কথা বলি :

"A child said is the grass ? Fetching it to me with full hands ;

Hog could I answer the child ? I do not know what it is any more than he."

এই যে শিশুর জ্ঞানের সঙ্গে কবির জ্ঞানের বৃত্তবলয়ের সমীকরণ ঘটেছে তা কবিমনের অভ্রান্ত বিলাসের ফলশ্রুতি মাত্র নয়। জীবনের সত্যকে দর্শন করার এটি একটি বিশেষ ভঙ্গী। সেই ভঙ্গীটি Walt Whitman এর কাব্যে যেমন প্রত্যক্ষ করলেন তেমনি করেই তা প্রত্যক্ষ করেছি যামিনী রায়ের ছবিতে।

১৯২০ সালের কথা। একদিকে শিল্পী সাধনা করে চলেছেন শিশুর অনাবিল ঐতিহ্য বিম্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের উপজীব্যকে দেখা এবং তাকে চিত্রকর্মে রূপায়িত করা ; অন্যদিকে পরিশীলিত সুর সংস্কৃত আঙ্গিকে বর্ণবহুল ছবি আঁকা। গোপিনী, কৃষ্ণলীলা প্রমুখ ছবিতে এই পরিশীলিত আঙ্গিক বা Stylised from এর দেখা মেলে। শিল্পী যামিনী রায়ের তৎকালীন সৃষ্টি গঙ্গা-যমুনা দ্বি-ধারায় বহমানা। শিল্পীর তখন সব্যসাচীর ভূমিকা। পরিশীলিত আঙ্গিকে আঁকা 'Krishna and the cow', গোপবালক প্রমুখ ছবি শিল্পী-রসিকের প্রশংসাধন্য হোল। এই পরিশীলিত রীতির প্রায় বিপরীত আঙ্গিকে 'বিড়ালের মুখে মাছ,' 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি আঁকা হোল। এই রীতির স্রষ্টা হলেন প্রাপ্তবয়স্ক যামিনী রায়ের অন্তর্বাসী সেই শিশুশিল্প, নিভৃত সাধনার মধ্য দিয়ে শিল্পী যাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছিলেন। পরিণত যামিনী রায়ের শিল্প আজ এই শিশুটির পূর্ণায়িত লীলাই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই শিশু-শিল্পটিকে যামিনী রায়ের মনরাজ্যে একছত্র সম্রাট করে, স্বরাট প্রতিভা করে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা অতীব কঠোর এবং দুরূঢ়। এই কালের যামিনী রায় সেই দুরূঢ় সাধনায় ব্রতী হলেন। কোনদিকে লক্ষ্য নেই, উদ্‌ভ্রান্ত, রূপোন্মাদনায় বিহ্বল প্রাণ। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপদের সঙ্কেত করছে। শিল্পীর কোনদিকে খেয়াল নেই, নিজের পরনের ধুতি এবং স্ত্রীর পরনের শাড়ী কেটে কেটে ছবি আঁকা চলছে। সন্ধান শুদ্ধ মূর্তির সন্ধান চলেছে অন্তরে অন্তরে। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে শিল্পী উদাসীন। অভাব, দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্রসাধন কোনটাই শিল্পীর রূপের সন্ধানে বাধা সৃষ্টি করতে পারলো না।

এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল। শহীদ সুরাবর্দী, সুধীন দত্ত ও মৃণালিনী এমার্সন, অরুণ সিংহ ও বিষ্ণু দে প্রমুখ শিল্প-রসিকেরা শিল্পীর একান্ত সাধনাকে সম্মানিত করলেন—অভিনন্দিত করলেন তাঁর শিল্পকর্মকে।

যামিনী রায়ের শিল্পের প্রসাদগুণেরই সন্দেশ সমুদ্রপারের বন্দরে বন্দরে পেঁছে গেল। বিদেশী শিল্প-রসিকেরা দেখা দিলেন শিল্পীর দ্বারে। শিল্পীর স্বীকৃতি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে পেঁছল। শিল্পীর অন্তরে এই স্বীকৃতির কোন মহৎ মূল্য ছিল না। তিনি তখন শুদ্ধ মূর্তির ধ্যানে তন্ময়। স্বল্পতম উপকরণে বৃহত্তম সৃষ্টি কেমন করে করা যায় তারই সম্ভাব্য কল্পনায় শিল্পী বিভোর।

১৯৪০ সাল। যীশুখ্রীষ্টের ছবি আঁকলেন শিল্পী। এই ছবি আঁকার পিছনে শিল্পীর একটা লোভ লুকিয়েছিল। ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা নানান খ্রীষ্টমূর্তির সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ছিল। তাঁদের অঙ্কন-রীতিতে যামিনীবাবু শিল্পী ষড়ঙ্গের, গুণীজনগ্রাহ্য শিল্পরীতির ব্যত্যয় প্রত্যক্ষ করলেন, রূপের শুদ্ধমূর্তির নিদারুণ অভাব তিনি এই তথাকথিত ঐতিহ্যবিমণ্ডিত খ্রীষ্টের মূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন। অলৌকিক বিষয় লৌকিক প্রথায় যখন শিল্পী প্রবর্তিত করেন তখন তা অশুদ্ধ হয়ে যায়। এই অশুদ্ধ শিল্প-কল্পনার উদাহরণ তিনি দেখলেন পশ্চিমদেশীয় শিল্পীদের 'মেয়ের গায়ে পাখা লাগিয়ে পরীর রূপকল্পনায়'। তাঁর দেওয়া নূতন রূপে কোথাও লৌকিক রীতির ক্ষুণ্ন না করেও অলৌকিক রূপের ব্যঞ্জনা তিনি দিলেন। 'Annunciation last supper' প্রমুখ ছবি আঁকলেন শিল্পী। সেই শিল্পরীতিতে 'নিয়তিকৃত নিয়ম' কোথাও ব্যাহত হোল না বটে কিন্তু তিনি অনায়াসে প্রকৃতির বিধিবন্ধতাকে অতিক্রম করে গেলেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী' শিল্প প্রবন্ধাবলীতে শিল্পের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে শিল্প হ'ল 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিত'। যামিনী রায়ের উপরোক্ত ছবিগুলিতে এই শিল্পতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখলেন। তাঁর আঁকা 'Crucification ; 'May and Christ' প্রমুখ ছবি রসোত্তীর্ণ হয়ে যে অসামান্যতা অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে সহজ রূপের সহজ সারল্য এবং বিশুদ্ধতা (Simplicity and purity)। এক dimension এ আঁকা শিল্পীর এই ধরণের ছবিকে ঘিরে এমন একটা বিশুদ্ধ রূপের পবিত্রতা বিরাজ করছে যে সংবেদনশীল মনে এরা সহজেই গভীর শিল্পানুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন সাধনা হোল এই বিশুদ্ধ, ধৌত, শুদ্ধ মূর্তিকে আপন শিল্পে প্রতিষ্ঠা করা। এই রূপের সন্ধানে, এই বিমূর্তকে মূর্ত করার সাধনায় শিল্পী তাঁর Technique এর বার বার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন ; কখনও অনেক রং লাগিয়ে চিত্রকে বর্ণবহুল করেছেন, আবার কখনও বা রূপান্বেষণের কৃচ্ছ্রসাধনায় রং-এর বৈচিত্র্যকে অনায়াসে ত্যাগ করেছেন। মন ভরেনি ; রংকে ত্যাগ করে মনের অভাব বোধ তীব্রতর হয়েছে। আবার রং-এর পুনঃ সংযোজন ঘটেছে তাঁর ছবিতে। খ্রীষ্টকাহিনীকে কেন্দ্র করে যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন তার মধ্যেই এই সত্যটিকে

আমরা অবলোকন করেছি। ক্রমে রূপ তার বর্ণবৈচিত্র্য, তার আঁকার বৈচিত্র্য হারিয়েছে শিল্পীর হাতে। নিরাবিল, স্বচ্ছ, স্বয়ংসম্পূর্ণ সে রূপটি আপাত-দৃশ্যমান বস্তুর অন্তরে লুকিয়ে থাকে তাকে শিল্পী প্রমূর্ত করে তুললেন ডট্ অর্থাৎ ফুট্‌কি দিয়ে দিয়ে ছবি এঁকে। রেখা অর্থাৎ লাইন তিনি বারবার ভেঙেছেন ; এই লাইন ভাঙার কাজ যামিনী রায়ের হাতে প্রায় সম্পূর্ণ হ'ল আল্‌পনা আঁকার মধ্যে। আল্‌পনা—বাংলাদেশের অতি সনাতন শিল্প আল্‌পনা-শিল্পীর হাতে ছবির রূপ নিল। from সেখানে আভাসিত মাত্র ; স্বল্প-রেখার লীলায়িত ভঙ্গিতে ছবিও সম্প্রকাশ। ঐতিহ্য-বিমণ্ডিত যে শিল্প উপজীব্যের ধারণা আমাদের মনে আছে তার সহজ সন্ধান এই আল্‌পনাধর্মী চিত্রকর্মে মেলে না এই পথে যামিনীবাবু Abstract from বা অরূপ রূপের যে সন্ধান করে চলেছেন তা আজ শিল্পীর নিরাকার রূপ-কল্পনায় সার্থক হতে চলেছে। এ হ'ল শিল্পীর শিল্পবিবর্তনের প্রায় শেষ পর্যায়ের ইতিহাস। জানি না শিল্পবিবর্তনের ধারায় এর পরেও কোন পর্যায়ের অস্তিত্ব আছে কিনা। বোধ হয়, শান্ত সকালের তরঙ্গহীন পরিবেশে সমাহিত শিল্পীকে যখন তাঁর ষ্টুডিও ঘাসে ঢাকা আঙ্গিনায় ধ্যান-নিমগ্ন দেখি তখন তাঁর ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দুটি এই নিরাকার রূপেই নিবিষ্ট হয়ে থাকে। শিল্পী এখানে শিশুমনের চরমতম সারল্যে অন্তরের

অমেয় ঐশ্বর্য্য-সম্ভারকে ছোট ছোট রেখা টেনে এবং রঙের ফোঁটা দিয়ে ব্যক্ত করতে চাইছেন। একথা অনস্বীকার্য্য যে এই পর্য্যায়ে আঁকা একটি ছবি ঘরে থাকলে দর্শকের মনে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র ভাবের বান ডেকে যায়; দর্শক অভিভূত হয়ে পড়েন, আর এটি ঘটে বলেই যামিনী রায়ের শিল্প আজ বিশ্বসমাদৃত।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন চিত্র সাধনায় যে অসংখ্য ছবি লেখা হয়েছে তাদের ক্রমপর্য্যায়টুকু বোঝবার চেষ্টা করলে শিল্পীর চিত্রধর্মের পরিণতিটুকু বোঝবার পক্ষে সহায়ক হবে :

(ক) Flat technique-এ আঁকা ছবি : স্বল্প রং ও পরিমিত রেখায় এদের প্রকাশ। 'বধূ' 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি এই পর্য্যায়ের। অবশ্য Flat technique এ ছবি আঁকা শুরু হবার আগে যামিনীবাবু ইউরোপীয় রীতিতে অনেক ছবি এঁকেছেন; পোর্ট্রেট পেন্টিং-এ যামিনীবাবু যে সফলতা অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিল এই পশ্চিমী শিল্পাঙ্কন রীতি। এই বিদেশী অঙ্কনরীতিতে পরিত্যাগ করে তিনি যখন গ্রাম্য শিল্পরীতিকে গ্রহণ করলেন, বাংলাদেশের গ্রামের এবং তার মানুষের ঘরের কথা বলার জন্য তখন তাঁর

শিল্পবিবর্তনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হোল ; শিল্পী নিজের ভাষায় কথা বললেন। আঁকা হোল বাংলাদেশের গ্রামের ছবি ঃ 'সাঁওতাল', 'মা ও ছেলে' ও 'গ্রাম্য-চাষী' প্রভৃতি ছবি। এই ধারায় যখন শিল্পকর্ম বেশ কিছুটা অগ্রসর হোল তখনই শিল্পীর হাতে এলো পূর্বকথিত ফ্ল্যাট টেকনিক।

(খ) লাইন, ড্রয়িং এর পর্যায় ঃ কালো রেখায় সাদা কাগজের উপর ছবি আঁকা শুরু হোল অদ্ভুত তার প্রসাদগুণ ; দর্শকের মনে কালো রেখায় যে অসংখ্য দাগ কাটা হোল তা সহজে অবলুপ্ত হোল না। রসিক-সুজন সাধুবাদ জানালো শিল্পীকে। এই প্রথায় তিনি আঁকলেন 'মা ও ছেলে', 'বধূ' ও অসংখ্য জন্তু-জানোয়ারের ছবি।

(গ) এই পর্যায়টি সমন্বয়ের পর্যায়। প্রথম যুগের গ্রাম্য ছবি আঁকার রীতি, ফ্ল্যাট টেকনিক ও লাইন ড্রয়িং সমন্বিত হোল ও তাদের সাঙ্গীকরণ ঘটলো। 'চাষীর মুখ', 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি এই সমন্বিত আঙ্গিকে আঁকা হোল।

(ঘ) এর পরের পর্যায়েই হোল যামিনী রায়ের শিশু হবার সাধনা। পূর্ব্ব পর্যায়ের সমন্বিত টেকনিক সব প্রচলিত রীতির লক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেল ঃ সহজ সরল চিত্ররীতি। বড় হয়েও ছোট ছেলের ভূমিকা নিলেন শিল্পী। নতুন করে আঁকা হোল ছবি, জন্তু জানোয়ারের ছবি, শিকার ও নাচের ছবি।

(ঙ) আবার ঊর্দ্ধমুখী বিবর্তন। অতি সরল আঙ্গিকের রিক্ততায় শিল্পী বুঝি আনন্দ পেলেন না। তাই আবার ফিরে গেলেন বর্ণ-বাহুল্যে। আবার রেখা এবং রঙের সমৃদ্ধি সংযোজিত হোল শিল্পীর ছবিতে। 'পূজারিণী মেয়ে', 'কীর্তন' এবং 'বাউল' এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে অগ্রগণ্য। চিত্রের বর্ণাঢ্যতায় শিল্পীর আনন্দ রসঘন মূর্তির সৃষ্টি করেছে। শিল্পী আপন অমেয় অংশভাগী করেছেন রসিক সুজনকে ; কিন্তু এ আনন্দ শিল্পী-মনে স্থায়ী হয়নি ; এই বর্ণাঢ্যতা শিল্পীর আনন্দকে বেশীদিন সঞ্জীবিত করে রাখতে পারে নি। আবার তিনি তাঁর সে রূপ সন্ধানের বেদনায় ডুবে গেছেন। রূপকথার কথা ও কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের নানান গল্প তাঁর চিত্রকর্ম্মে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর আঁকা 'গণেশ জননী' এই পয্যার্য়ের উল্লেখযোগ্য চিত্র।

(চ) এর পরেই এলো শিল্পীর তুলিতে চিত্রের সুসংস্কৃত পরিশীলিত রূপ। বিদেশী শাস্ত্র-শিল্পের পরিভাষায় একে বলা চলে Stylised form-এর পর্য্যায়। এই ধরণের চিত্রকর্মে অলঙ্কৃত রূপের ছড়াছড়ি ঃ কৃষ্ণলীলার ছবি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

(ছ) এই সুসংস্কৃত রূপের সৌখীনতা শিল্পীকে বেশীদিন আবিষ্ট করে রাখতে পারল না। চকচকে পালিশের জৌলুষ, শোফিষ্টিকেশনের অন্ধতা

শিল্পীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারলো না। প্রাণবন্ত উদ্দাম রূপকল্পনা শিল্পীর তুলিতে বাসা বাঁধলো। নন্দনতত্ত্বে একে বলা হয়েছে Bold and Rough Form। এই দৃপ্ত বেপরোয়া রূপকল্পনার সামনে দাঁড়িয়ে রসিকমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শিল্পীর প্রশংসায়। লাইন বা রেখায় ভাঙচুর হোল, বলিষ্ঠ প্রাণের মহৎ উন্মাদনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শিল্পী রীতি সঙ্গত লাইন বা রেখার ভাঙচুর করলেন। তালপাতার চাটাই-এর উপর শিল্পী ছবি আঁকলেন। 'কৃষ্ণ বলরাম' ছবির প্রাণসম্পদ এক বলিষ্ঠ দুর্বারতায় আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

(জ) এর পরের পর্য্যায়ে শুরু হোল ডট্ বা ফুট্‌কি দিয়ে আঁকা। তাল পাতার উপর আঁকা ছবিতে যে সজীবতা বা Boldness প্রতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল তা আরও দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে দেখা দিল এই ফুট্‌কি দিয়ে আঁকা ছবিতে। আঙ্গিকের কৃশতা বিষয়বস্তুর দৃঢ়তাকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠা করলো তা বিস্ময়কর। 'ম্যাডোনা', 'বিড়াল ও চিংড়ি মাছ' ইত্যাদি ছবি এই পর্য্যায়ে শিল্পকৃতির স্বাক্ষর বহন করছে।

(ঝ) অশান্ত শিল্পীর বিশ্রাম নেই। আবার আঙ্গিকের ভাঙচুর চললো। নতুন করে লোকগাথার আন্তর রূপটিকে শিল্পী খুঁজে পেতে চাইলেন। 'মহাদেব', 'কৃষ্ণলীলা', 'বাঘের পিঠে রাজা', প্রমুখ ছবি এবং রামায়ণের ছবি এই পর্য্যায়ে আঁকা হোল।

(ঞ) এই রীতিভাঙার কাজ চললো। আধুনিকীকরণ নন্দনতত্ত্বে শিল্পরীতিকে শিল্পকৃতির বহিরঙ্গ বলা হয়েছে এবং এই বহিরঙ্গটুকু শিল্পপদবাচ্য নয়। প্রাচীন ভারতের রসশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য', আর আধুনিক ইতালীয় নন্দনতত্ত্বে এই রীতিকে কাব্যবহির্ভূত বলা হয়েছে। যামিনী রায়ের শিল্পে, আশ্চর্যের কথা, এই আঙ্গিককে আশ্রয় করেই বারবার শিল্পবিবর্তন ঘটেছে। ছবি এই পর্য্যায়ে শিল্পীর হাতে আল্‌পনার রূপ নিল। Form কিছুটা থাকলেও ব্যঞ্জনাই সমগ্র ছবিটি জুড়ে বিরাজ করছে। Form শুধুমাত্র আভাসিত, শিল্পের বিষয়বস্তু বা উপজীব্য নেই বললেই চলে ছবির

তবুও সপ্রকাশ। কবি রবীন্দ্রনাথের সেই অরূপ বীণার চিত্রকল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : "অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে।"

রূপকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিয়ে যখন সেই অবলুপ্তির আড়ালে অরূপ বীণার ঝংকার ওঠে তখন সে ঝংকারে কোন রূপলক্ষণ নেই ; কোন বিশেষ নির্দেশে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। নিরাবয়ব সেই রূপ বিমূর্ততার ইঙ্গিতটুকু করে। এটাই তার ধর্ম। বলতে পারি এই পর্যায়ে শিল্প লিরিক-ধর্মী হয়ে উঠেছে আপন ব্যঞ্জনার গভীরতায় ও বিস্তারের Epic-এর অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই শিল্পরীতিতে ও ব্যবহৃত উপকরণে। বিমূর্ত রূপের শুদ্ধতা শিল্পীর কোন কোন ছবিতে অসম্ভব প্রাখর্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই যুগের অঙ্কন চিত্রে এমন একটি শুচিশুভ্র ভাব থেকে গেছে যা মনে পবিত্রতার বন্যা বইয়ে দেয়।

কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দৃষ্টির প্রভামণ্ডলে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র

বাংলাদেশ দুটুকরো হয়ে যাবার শেষ অধ্যায়েও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্ভবত কলকাতা ছিল উজ্জ্বল গৌরবের উত্তুঙ্গ শিখরে। জীবনের বেশিরভাগ সময় ছায়াসুনিবিড় শান্তিনিকেতনে কাটালেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ কীর্তির অনেকখানিই সৃষ্টি করেছিলেন কলকাতাতে বসে। অবনীন্দ্রনাথ নিজে এবং তাঁর অনুসৃত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট তখন খ্যাতির মধ্য গগণে। রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন একাই একশো। বাংলা ছায়াছবি নতুন দিগন্তে মোড় নিচ্ছিল। অপর্ণা দেবীর কণ্ঠে অপূর্ব কীর্তন এবং তাঁর ব্রজমাধুরী সঙ্ঘের গান, কৃষ্ণ চন্দ্র দে এবং অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গীতসুধা এবং আরও কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গীত বাংলার লোক সংস্কৃতিকে গভীর গরিমায় পুষ্পিত করছিল।

ভারতীয় বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবময়। শিক্ষা দীক্ষার এই প্রাণকেন্দ্র থেকে বেরিয়েছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, দীনেশ চন্দ্র সেন এবং আরও অনেক কৃতী সন্তান। শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতির এই আবহাওয়াতেই জাগ্রত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট হল নামে ধ্রুপদী স্থাপত্যের আশ্রয়ে আশুতোষ সংগ্রহশালার। উদ্দেশ্য ছিল বাংলার লোক-শিল্পকলা নিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা। লোকায়ত শিক্ষার প্রসার, প্রচার এবং তার সার্বিক উন্নয়ন—সাধন করা। ধীরে ধীরে এই আশুতোষ সংগ্রহশালাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয় বিশেষতঃ যাঁরা বাংলার লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন আগ্রহী।

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা প্রায় নিয়মিত এখানে আসতেন এবং শুধু বাংলার নয়, তামাম বিশ্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন।

এই রকমই এক বিকেলে এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন এই মিউজিয়াম অফিসের আড্ডায়। তাঁর হাতে ছিল এক পোটলা। তাতে কিছু গোটান পটচিত্র আছে বলে মনে হল। আশুতোষ সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ তখন অফিস ঘরেই ছিলেন। তিনি ভদ্রলোককে সাদরে আহ্বান করলেন এবং উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি হলেন শিল্পী যামিনী রায়।

বাঁকুড়া জেলা থেকে বহুকষ্ট স্বীকার করে তিনি বহু রকমের সুন্দর সুন্দর পট সংগ্রহ করেছিলেন। অধ্যাপক ঘোষের অনুরোধে তার থেকে কয়েকটি এনেছিলেন আশুতোষ মিউজিয়ামের জন্যে। শ্রীরায় সেই কাপড়ের পোটলা থেকে বের করে একের পর এক দেখাচ্ছিলেন কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা লখীন্দর, কমলে কামিনী প্রভৃতি অপরূপ পটচিত্র। আর আমরা গভীর বিস্ময়ে তা নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ হচ্ছিলাম।

নাম গোত্রহীন অজ্ঞাত শিল্পীদের আঁকা বাংলা পটের রূপ মহিমায় সেদিন আমাদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন অধ্যাপক শহীদ সুরাওয়ার্দী। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী
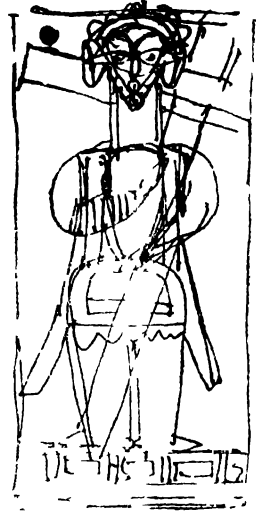
অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ইনি বাংলা লোকশিল্পের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল ছিলেন। রূপমুগ্ধ অধ্যাপক সুরাওয়ার্দী শ্রীঘোষকে তাঁর জন্যে একটি পট ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। কিন্তু শ্রীঘোষকে নিরুত্তর দেখে যামিনী রায় পটচিত্র জোগাড় করে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। এই সূত্রেই উভয়ের মধ্যে আলাপের সূচনা। আশ্বস্ত হয়ে অধ্যাপক যামিনী রায়কে তাঁর থিয়েটার রোডের বাসভবনে (এখন সেকসপীয়ার সরণী) যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান।

অধ্যাপক সুরাওয়ার্দী প্রায়ই আসতেন আশুতোষ সংগ্রহশালায় তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত কাজের জন্যে। আমার কর্মস্থল ছিল এই সংগ্রহশালা। অধ্যাপক সুরাওয়ার্দী ছিলেন আমার গবেষণা এবং শিল্প জিজ্ঞাসার প্রধান গুরু। যদিও অধ্যাপক ষ্টেলাক্রামরিশকেও পেয়েছিলাম আমার শিক্ষাদাত্রীরূপে। এ প্রসঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়ছে। তবে ওই ঘটনার কয়েকদিন পর আশুতোষ মিউজিয়াম অফিসে এমন এক দৃশ্য দেখেছিলাম যা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

একদিন দেখি আশুতোষ মিউজিয়ামের অফিস ঘরে দুই বিপরীত মেরুর দুই ব্যক্তি এক টেবিলে একে অপরের উল্টো দিকে মুখোমুখি বসে অনর্গল কথা বলে চলেছেন। একজন হাইকোর্ট বিচারকের পুত্র। যাঁর শিক্ষা দীক্ষা প্রথমে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে অক্সফোর্ডে এবং দীর্ঘ বাইশ বছর বিদেশে থাকার সূত্রে যিনি মাতৃভাষায় প্রায় কথাই বলতে পারতেন না। আর অপরজন গ্রাম বাংলার বর্ধিষ্ণু অথচ অজ গাঁয়ের মানুষ। যাঁর পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্তা,

চালচলনে ছিল গ্রামের সাদামাটা সহজ সরলতা। অন্ততঃ তখনও পর্যন্ত ইংরেজীতে প্রায় কথাই বলতে পারতেন না। অথচ দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে এত ব্যবধান সত্ত্বেও ভাব বিনিময়ে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল না দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। দুধ চিনিহীন হালকা লিকারের চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একজন যতটা সম্ভব সহজ ইংরেজীতে কথা বলে চলেছেন। অন্যজন তা আত্মস্থ করে সরল গ্রাম্য বাংলা ভাষায় জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশি সময় নিয়ে এই অন্তরঙ্গ আলাপ কি করে সম্ভব হয়েছিল তার কোন উত্তর আজও আমি খুঁজে পাইনি।

শ্রীরায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই পাশ্চাত্য শিল্পগ্রাহী অধ্যাপক সুরাওয়াদী বাংলার ঐতিহ্যময় সনাতন লোকায়ত শিল্পের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। অনাদরে অবলুপ্তপ্রায় বিষয়টিকে নিয়ে গবেষনাও শুরু করেন। অনেক অজানা তথ্য ও মূল্যবান চিত্র বিচিত্র দিয়ে তাঁকে একাজে সাহায্য করতে থাকেন যামিনীবাবু।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারে তদানীন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধ্যাপক সুরাওয়াদীর কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে অধ্যাপক সুরাওয়াদী তাঁর আরাধ্য কাজ মাঝপথে থামিয়ে দেন। এইখানেই ঘটনার শেষ নয়। ক্ষুব্ধ অধ্যাপক বাগীশ্বরী অধ্যাপকের চেয়ার ছেড়ে চাকরী নেন প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনে।

গবেষনার কাজে ইতি দিলেও তিনি পরে বাংলার লোকশিল্পের ওপর একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'প্রফেসেস' নামক গ্রন্থে স্থান পায়। বাংলার ঐতিহ্য সম্পন্ন লোক শিল্পকলার ওপর তাঁর অনুরাগ কত গভীর ও অনুসন্ধিৎসা কত ব্যাপক ছিল তা ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায়।

অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিলেও যামিনীবাবুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতার এতটুকু টান পড়েনি। লোকশিল্পের নানান দিক নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হত। মত বিনিময় চলত। শিল্পানুরাগী সুরাওয়াদী বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্য অন্বেষনে মগ্ন শিল্পীকে নিরন্তর অফুরন্ত প্রেরণা যোগাতেন।

এই প্রেরণা যামিনীবাবুকে তাঁর স্বীয় লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে অনেকখানি শক্তি যুগিয়েছিল যা পরবর্তীকালে তাঁর চিত্র সাধনাকে এক নতুন দিগন্তের নীলিমায় নিয়ে যায়। এজন্যে আজ অধ্যাপক সুরাওয়াদীকে জানাই ধন্যবাদ কারণ তিনিও শিল্পীর সাধনার পথটি যে সঠিক সেদিন তা হৃদয়ংগম করে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। পারঙ্গম যোদ্ধা অধ্যাপক সুরাওয়াদী তাঁর একাধিক রচনাতেও তিনি যামিনীবাবুর ছবির উৎকর্ষতাকে স্বীকার করে অভিনন্দিত

করেছিলেন। মনে পড়ছে স্টেটসম্যান পত্রিকার কলা সমালোচক হিসেবে ঐ পত্রিকায় শিল্পীর নতুন রূপের ছবি সম্পর্কে অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল একটি আলোচনার কথা। তখন যামিনীবাবু থাকতেন অমৃতবাজার অফিসের গায়ে বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে ছোট এক ভাড়া বাড়িতে।

এই সময় থেকেই শিল্পীর রূপলেখা বুদ্ধিজীবি মহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হতে থাকে। অনেকেই ছবির ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তাঁরা হলেন ত্রিশ দশকের দুই বিখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে। এঁরা দুজনে শুধু যামিনীবাবুর গুণমুগ্ধই ছিলেন না, শিল্পীর ছবিকে সর্বসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে।

ধীরে ধীরে সৌজন্যের পালে হাওয়া লাগে। শিল্পী হিসেবে যামিনীবাবুর খ্যাতি বাড়তে থাকে। রঙ রেখার জগতে তাঁর ছবি বাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন অতীত ঘরাণার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিয়েও স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বলতায় সর্বজন স্বীকৃত হয়। কি ভাবসম্পদে, কি শিল্পসুষমায় ছবি রসগ্রাহীর মনকে জয় করে। বাংলার মানুষজন, জীবন-জীবিকা, প্রকৃতির আলোছায়া আলোকিত হল রূপারোপের ভাষায়। শান্ত সমাহিত আনন্দঘন চিত্রকলায় বাংলায় নিজস্ব অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-চেতনা যেন শতধারায় পুষ্পিত হয়ে উঠল। রাতারাতি ছবির বিক্রী সাংঘাতিক বেড়ে যায়। একজন শক্তিধর শিল্পী হিসেবে যামিনীবাবুর খ্যাতি বাড়তে থাকে।

আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের ছোট ভাড়া বাড়িতে শিল্পীর ছবির এক মনোরম প্রদর্শনী আজও আমার স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন তদানিন্তন কালের গভর্নর মিঃ কে সির সহধর্মিনী মিসেস মেগী কে সি। এই উপলক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকায় আমার লেখা প্রদর্শনীর সমালোচনা পড়ে শিল্পী ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভাবঐশ্বর্যকে যামিনী রায় তাঁর চিত্রপ্রকল্পের দ্বারা এক উত্তুঙ্গ পর্যায়ে স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী এই বক্তব্যে 'ফোক আর্ট' কথাটার ব্যবহারই যামিনী রায়কে আঘাত করেছিল। কিন্তু পরে তাঁকে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে তাঁর ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

দীর্ঘজীবনের সাধনার ফলে যামিনী রায়ের শিল্প এক মহান ভিত্তিপটের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর এই শিল্পী প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ণ বৃহত্তর শিল্পমতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার স্মৃতি পরিপ্লুত হয়ে আছে যামিনী বাবুর ব্যক্তিত্বের উষ্ণস্পর্শে। আমি এই স্মৃতিকে আমার জীবনের এক বিশেষ মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করি। ভাষান্তর ঃ প্রশান্ত দাঁ।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

যামিনীদাকে যেমন দেখেছি

তেইশ চব্বিশ বছরের এক তরুণী। দুধে আলতায় রঙ, যামিনী রায়ের ছবির মতোই পটলচেরা চোখ, উন্নত নাক—সিল্কের শাড়ি পরা অসামান্য সুন্দরী হাসিখুশি অথচ গম্ভীর মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমেই প্রদর্শনীতে ঢুকে পড়লেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে আনন্দ চ্যাটার্জির গলিতে দেশ-বিদেশী লোকদের আনাগোনা লেগেই থাকতো ঐ স্থায়ী ছবির প্রদর্শনীতে। বছরে অন্তত একবার নতুন ছবির মেলা বসতো। ছবির উৎসব। সে উৎসবে দেশ-বিদেশের রসিকজনেরা তো আসতেনই সাধারণ মানুষও এসে ভিড় জমাতেন খাঁটি গ্রাম বাংলাকে যামিনী রায়ের চিত্রে আস্বাদন করার জন্যে।

তেমনি এক উৎসব উপলক্ষেই সেদিন বিকেলে যে অপরূপা সুন্দরী তরুণী বেশ কিছু সময় কাটিয়ে গিয়েছিলেন যামিনী রায়ের প্রদর্শনীতে তখন কে জানতো তিনিই হবেন একদিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

তখন প্রধানমন্ত্রী না হলেও জওহর কন্যা ইন্দিরা পাড়ায় এসেছেন সে কথাটা অল্পক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল ঐ শিল্প-নিকেতনের সামনে। ইন্দিরা তন্ময় হয়ে দেখছিলেন দেয়ালে টাঙানো এক একখানা ছবি এবং স্বয়ং শিল্পী মাঝে মাঝে তাঁর এক একখানি চিত্রের মর্মবাণী অল্পকথায় তুলে ধরছিলেন ইন্দিরার কাছে।

কমকথার মানুষ যামিনীদা সেদিন দু-একটি ব্যক্তিগত কথাও বলেছিলেন ইন্দিরাকে। শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতীর ছাত্রী ইন্দিরা শিল্পকলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করবেন, যা সুন্দর তাতেই আকৃষ্ট হবেন—তা ধরে নিয়েই

খোলাখুলি বলে ফেললেন যামিনীদা, ভারত-কন্যাকে ভারতীয় শাড়িতে কী অপূর্ব দেখায়।

হাসির রেশ ছড়িয়ে দিয়ে ইন্দিরা শিশুপুত্রের হাত ধরে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

সেই থেকে গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা শিল্পগুরু যামিনী রায়ের প্রতি। শিল্পীর কাছে লেখা ইন্দিরার বিভিন্ন পত্র যে শ্রদ্ধার নিদর্শন।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যামিনী রায়ের বাসভবনে লাট-বেলাটরাও আসতেন, আসতেন মিত্রবাহিনীর সেনা-সেনানীরা, দেশের ছোটবড়ো নেতারা, এমনকি স্বয়ং কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথও এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে যামিনী রায়কে কতখানি সম্মান করতেন ও গুরুত্ব দিতেন তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যেতে পাবে।

সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাষ দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে।·· আমার সৌভাগ্য এই, বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলাম, এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।'

এ চিঠিই কি কম বড়ো স্বীকৃতি যে কোনো শিল্পীর পক্ষে।

দীর্ঘ প্রায় দশটি বছর যামিনীদার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাল কেটেছে আমার। যামিনীদা, তারাশঙ্কর ও আমি—আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের একই সারির পর পর তিনটি বাড়িতে পাশাপাশি থাকতাম আমরা। দুই বাঙালী সাধকের সাধনা আমি কাছে থেকে লক্ষ্য করতাম। প্রতিদিন হয়তো দু বেলাই দু চারটে করে কথাবার্তাও হতো। কখনো কখনো শীতের সকালে বা গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় এক একদিন যামিনীদার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে গল্প শুরু করে দিতাম। আমার পক্ষে সে কি কম সৌভাগ্যের কথা।

সেসব গল্প, সেসব কথা গুছিয়ে লিখতে পারলে একখানা বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ রচনা ফাঁদতে আমি বসিনি। প্রতিবেশী রূপে যামিনীদাকে
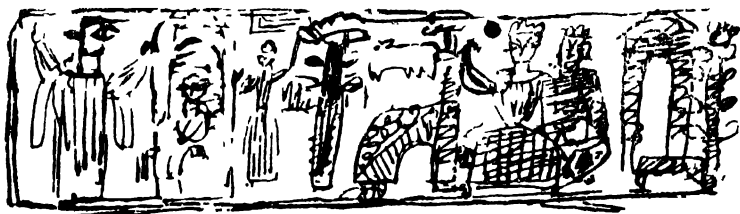
যেমনটি দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর যে সমস্ত অসাধারণ গুণ আমায় আকৃষ্ট করেছিল সেসব সম্বন্ধেই সামান্য কিছু লিখছি।

এমন বাঙালী মানসিকতা এবং নির্ভেজাল ভারতীয়তার কাছে মাথা আপনি নুয়ে আসে। শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁর বাড়িতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখতে এলে যে কয়টি ব্যক্তিগত কথা তিনি সেদিন তাঁকে বলেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে যামিনী রায়ের স্বদেশপ্রাণতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যামিনীদার অনেক কথা ধরতে পারতাম না। কখনো কখনো তাঁর কোনো কথাকে হেঁয়ালি বলে মনে হতো। তবু তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভালো লাগতো। জগৎসংসারের বহু ব্যাপারেই তিনি নিস্পৃহ থাকতেন কিন্তু বড়ো রকমের কোনো অন্যায় বা অশুভ ঘটনায় তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। এখানে একবারের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। একদিন, তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানির সংবাদে শিল্পীমন ভীষণভাবে পীড়িত, সকালে আমি আফিসের দিকে চলেছি বাড়ির সামনে পাইচারী করছিলেন তখন যামিনীদা। আমায় আটকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো খবর কখন পাচ্ছি—এর মধ্যে কি আর কোনো কাজ করা যায়?

বাস্তবিকই সেই দিনগুলিতে শিল্পীকে কেবলি ছটফট করতে দেখেছি। কাজে তিনি মন বসাতে পারতেন না মানসিক যন্ত্রণায়।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের যে বাড়িটিতে তিনি বিশ-বাইশ বছর কাটিয়ে গেছেন সেখানে তাঁর নিজের জগৎ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়ির একটি ঘরকে তিনি অতি সুন্দর করে তাঁর স্টুডিয়ো করে নিয়েছিলেন। সেই স্টুডিয়োই ছিল তাঁর দিনরাতের শিল্প-সাধনার ক্ষেত্র। দিনের বারো আনা সময়ই তাঁর সেখানে কাটতো। তাঁর ছেলে পটল অমিয় ছিল তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের শিল্প-সহকারী। আর এই পটলের সঙ্গে তাঁর বন্ধু মন্টু ছিল শিল্পীর কাজের সহায়ক হিসেবে।

মানুষ হিসেবে শিল্পী যামিনী রায়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সবারই চোখে পড়তো যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্টভাবে দেখতেন। অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন তিনি। পোশাক-আশাকের বাহুল্যের কোনো বালাই ছিল না। ধুতি-ফতুয়া আর বিদ্যাসাগরী চটি এবং শীতের দিনে একখানা খদ্দরের চাদর। হাতের মোটা লাঠিটা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে বড়ো একটা বেরুতেন না। কখনো বেরুলে ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবীতে সেজেই বেরুতেন লাঠিখানা হাতে নিয়ে। সভা-সমিতিতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। বাড়িতে টেলিফোন রাখার বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘকাল কলকাতা মহানগরীতে বাস করলেও সম্পূর্ণভাবেই নাগরিকতার মোহমুক্ত ছিলেন যামিনী রায়। জীবনে ও কর্মে উভয় ক্ষেত্রেই তার সুস্পষ্ট ছাপ আমরা লক্ষ্য করেছি।

গ্রাম্য-জীবনের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ বোধ ছিল যামিনীদার। কথায়-কথায় তাঁর সেই পল্লীপ্রেম ও প্রকৃতি চেতনা প্রকাশ পেতো। পল্লীর মানুষ ও

নৈসর্গিক চিত্র তাঁর হাতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, সে আজ আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। গ্রামজীবনের ছবির জন্যেই তো তিনি ভাইস রয়েজ গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন ইংরেজ আমলে। আর দু' তিনটি রঙে আঁকা তাঁর আশ্চর্য সব ল্যান্ডস্কেপ অজস্র বিক্রি হয়েছে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাড়ি থেকে, তা আমরা দেখেছি।

ভারতীয় ঐতিহ্যবাদী এই শিল্পীর চিত্রকলা নিয়ে আলোচনার অধিকার আমার নেই। তবে তাঁকে দেখেছি রামায়ণ-মহাভারতের গল্প নিয়ে দিনের পর দিন ছবি আঁকতে। বাইবেলের গল্পও তাঁর ছবিতে স্থান পেয়েছে। দেশী তুলি এবং নানা বর্ণের দেশী মাটির রঙ তিনি ব্যবহার করতেন। তেঁতুল বিচির আঠা তৈরি করতেও দেখেছি তাঁকে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের স্টুডিয়োতে। রঙ-তুলির খেলায় দেশীয় পদ্ধতি প্রকরণে যামিনী রায় যে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিশ্বের শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচকদের নস্যাৎ করে দিয়েছেন শাহেদ সোহরাবর্দী, বিষ্ণু দে, জন আরউইন প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচকেরা। তাঁর বিখ্যাত 'গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' ছবিখানা যখন তিনি আঁকছিলেন সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে।

যামিনীদার এক একটি কথায় অবাক হতাম। ভালোবাসার সমুদ্র ছিল তাঁর অন্তরে। বোধহয় ১৯৪৯-৫০এ তিনি ডিহি শ্রীরামপুরে উঠে যান বাগবাজার থেকে। একদিন আমি কথায় কথায় বলেছিলাম তাঁকে, আপনি চলে যাচ্ছেন আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে, পাড়াটা বড্ড খালি লাগবে।

উত্তরে তিনি আমায় অদ্ভুত একটি কথা বললেন। বললেন, তোমায় আমি স্থায়ী আশীর্বাদ দেবো।

সে আবার কি ?—বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

তিনি বললেন, তোমার একখানা বই এর আমি নিজে কভার এঁকে দেবো।

যামিনীদা পাড়া ছেড়ে, উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণের অধিবাসী হলেন। মাঝে একবার মাত্র তাঁর নতুন বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপর বছরেরর পর বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন তাঁর স্থায়ী আশীর্বাদটুকু কুড়িয়ে আনার কথা মনে হলো। বছর আড়াই আগে তাঁর ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করতেই যামিনীদা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন কিন্তু তিরস্কার করলেন প্রচুর, দীর্ঘকাল তাঁকে ভুলে থাকার অভিযোগে।

কিন্তু আমি যে তাঁকে ভুলে যাইনি, তাঁর স্থায়ী আশীর্বাদ-এর কথা মনে রেখে তা কুড়োতে এসেছি, তা বলতেই শিল্পগুরু চমকে উঠলেন। বললেন ও তুমি তোমার বইয়ের কভারের ব্যাপারে এসেছ। সেতো আমি প্রতিশ্রুত। কিন্তু এখন কি আর আমি তেমনি পারবো ?

তবু তিনি কথা দিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার 'রাত্রিকে দিনকে' কাব্য-সঙ্কলনের 'কভার' এঁকে রাখবেন, আমি যেন গিয়ে নিয়ে আসি।

এক সপ্তাহ পরেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর 'স্থায়ী আশীর্বাদ' আমি নিয়ে এসেছিলাম।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

যামিনী রায়

প্রাচীনেরা রটিয়েছিলেন যে বাস্তবমাত্রই বিরোধাভাসে পূর্ণ ; এবং ইতিহাসের চক্রাবর্তন আমাদের ফিরিয়েছে এমন একটা ডায়ালেকটিকে যা বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপরিচয় দাখিল করলেও আসলে তর্কশাস্ত্রের বিপরীত মেরুর রহস্যময় সমন্বয়নেই বিশ্বাসী। অথচ অভেদতত্ত্বের নিয়মকানুনই আজও সভ্যজগতের একাধিপতি এবং যেহেতু আমরা সেই মধ্যযুগীয় অবসর থেকে নিতান্ত বঞ্চিত, যা তৎকালীন বিদ্বজ্জনকে কোনো প্রচলিত সিদ্ধান্তের নির্বাসন ঘটানোর আগে অন্তহীন বিতর্কে প্ররোচিত করত, তাই প্রস্তাবসমূহ সমার্থবাচক শব্দ দিয়ে রচিত না হলেই আমাদের কাছে স্ব-বিরোধী ঠেকে। ফলে আমাদের বুদ্ধিতে সত্য ও মামুলি চিন্তা সমার্থক এবং অতিসরলীকরণের শ্রমকৃপণ পদ্ধতি আজ এমনই গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে যে যামিনী রায়ের স্পষ্টভাবে ভারতীয় বিষয় ও প্রকরণে রচিত চিত্রাবলীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন শুনতে পাই যে ভদ্রলোক তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেছিলেন একজন য়োরোপীয় রীতির চমৎকার প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে হিসাবে, আমরা বিস্মিত হই। উপরন্তু অজ্ঞতা ও সারল্যই এমন বিস্ময়ের জনক এ-সিদ্ধান্তে সন্দেহ হয়, যখন দেখি যে আমাদের গোনাগুনতি শিল্পসমালোচকরা সকলেই একই লোকপ্রচলিত ভ্রান্তির শিকার। এই মানুষটির জীবনের ঘটনা হয় তাঁরা না জেনে উদ্ভাবন করেন কিংবা জেনেও বিকৃত করেন, পাছে নিষ্ক্রিয় জড়বুদ্ধির নিত্যবিশ্বাসে ঘুণ ধরে।

এটা অবশ্যই ঘটনা যে, তাঁর প্রথমদিকের প্রতিকৃতিগুলিতে হুইসলারের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে স্পষ্ট এবং এই অপ্রত্যাশিত প্রেরণার চুলচেরা ব্যবচ্ছেদই আমাদের যামিনী রায়ের বিচিত্র সাফল্যের অন্তরালবর্তী ঐক্য অনুধাবনে

সাহায্য করতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে উক্ত অনুকরণ ছিল অনিবার্য। কারণ তিনিও সেই দুরন্ত, যদিও কিছুটা বিচারবুদ্ধিহীন যুবসম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন, যাঁরা বিদ্রোহী অসংযমের সম্ভাবনায় সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কিছু বিলম্ব হলেও, আবিষ্কার করে উঠেছিলেন যে প্রতিষ্ঠানটা মমির মতো মৃত; এতই মৃত যে সমকালীন য়োরোপীয় শিল্পের পরিচয় সেখানে অজ্ঞাত, আর মিলে, লেটন কিংবা পয়ণ্টারের নিরেস অনুকৃতিগুলিকে সসম্মানে বসানো হত ধ্রুপদী শিল্পের উচ্চ আসনে। উপরন্তু, থিয়োসফিষ্টদের কল্যাণে এসময় ভারতবর্ষ অকস্মাৎ আপনার রহস্যাবৃত অতীত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং কম্পোজিসান ও ড্রাফটসম্যানশিপের বিসর্জন দিয়ে, জাপানী সূত্রে পাওয়া বলে অনুমিত ওয়াশ-এর ব্যবহারের পক্ষপাতী শিল্পচিন্তা আমাদের কতিপয় শক্তিমান শিল্পীকে বিমূঢ় করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অন্যদিকে আমাদের শাসনকর্তারা তখন প্রাক-যুদ্ধ পর্বের পশমী উদার-নৈতিকতার লীলা চালাচ্ছেন এবং মর্লি-মিণ্টো সংস্কার মেনে পরিশাসনক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের নিয়োগ ঘটিয়ে সৌজন্যবশেই শিল্পবিদ্যালয়ে প্রাচ্যশিল্পের অনুপ্রবেশ রুখতে তাঁদের বাধল। শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে নীতিটা অভ্রান্ত বটে, কিন্তু শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এর নীটফল হল, পিল্পবিদ্যালয়ের পবিত্র চত্বরে যেখানে পরিচ্ছদহীন মূর্তি কোনোদিনই প্রবেশাধিকার পায় নি, এখন মনুষ্যমূর্তির চিহ্নমাত্র রইল না। অন্যদিকে তীক্ষ্ন সচেতন প্রত্যক্ষণের বদলে অস্পষ্ট ধ্যানের মূল্য বেড়ে গেল ড্রইংয়ের ক্লাসে, যেখানে আর যাই শেখানো হোক, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানশিপের চর্চা ছিল নিতান্ত নগণ্য।

এর পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে বক্তৃতার বহ্বারম্ভের আয়োজন এবং সে সব বক্তৃতাসভায় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকতেন সিভিল সার্ভিস এবং সৈন্যদলের লোকজন। পরবর্তী ভিড়াক্রান্ত প্রদর্শনীতে দেখা যেত প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের পক্ষপুষ্ট উৎসাহী জমিদারবৃন্দ, করুণ গোলাপী ও ধূসর আচ্ছাদনের তলায় অবক্ষয়প্রাপ্ত মুঘল, ভ্রষ্টচরিত্র রাজপুত এবং নির্জীব অজন্তার অনুকারী কতকগুলি মাঝারি ধরনের জলরঙের কাজের ওপর তাঁদের নামাঙ্কিত লাল মোহর যদৃচ্ছ আটকে যেতেন।

য়োরোপীয় মিতাচারের সঙ্গে পরিচিত যামিনী রায়ের দৃষ্টিতে এসব ছবির অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য বিকারীর অহিফেনজাত স্বপ্ন বলেই মনে হত। তাঁর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন যে, সব ভৌতিক শরীরীর ছবি স্পষ্টতই মাধ্যাকর্ষহীন, তাদের অদৃশ্য কানের সঙ্গে ফটোগ্রাফিক বিশ্বস্ততায় অঙ্কিত কর্ণভূষণের সম্পর্কটা কোথায়? একদা এক নির্বোধ কাকের চিত্রার্পিত আঙুরগুচ্ছ ঠুকরে প্রকৃত তৃষ্ণা মেটাতে না পারার বহুল প্রচলিত গল্পটা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু তিনি আশ্চর্যবোধ করতেন, যদৃচ্ছ পুষ্পশোভিত কিন্তু

নির্ভাজ স্বেচ্ছাভরণ সত্ত্বেও নিছক আলংকারিক তরঙ্গের ওপর দিয়ে মানবিক পদক্ষেপে সঞ্চরমান কাচের ঘটিকা যন্ত্রোপম মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বাসনার আকর্ষণ অনুভব করতেন না, ঘৃণার বিকর্ষণই তাঁর মধ্যে প্রবল হত। অথচ তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক শিল্পীদের আর্থিক সাফল্য এতই বিপুল যে তাঁর পক্ষে সে অনাদৃত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা ছিল একান্তই দুরূহ। বিশেষত চিত্রাংকণকেই যখন তিনি জীবিকানির্বাহের উপায় বলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন অথচ উড়িয়ে দেবার মত পৈতৃক-সম্পত্তি বা নির্ভর করার মতো আত্মীয় পৃষ্ঠপোষক এ দুয়ের কোনটাই তাঁর ছিল না। ফলে এমন সব ছবি তাঁকে বিক্রয়ার্থে আঁকতে হত যেগুলো তাঁর শিল্পচিন্তায় নিন্দার্হ ছবির চেয়ে কিছু কম অনুকারী ছিল না। যাঁদের তিনি অনুকরণ করতেন তাঁদের ধারা মুঘল বা রাজপুতদের ধারার মতো শুকিয়ে যায় নি বটে, কিন্তু সে ঘটনাটা কোনো ইতর-বিশেষের কারণ হয় না; এ নিয়েও মাথা ঘামানো অবান্তর যে আধুনিক য়োরোপীয় শিল্পেই প্রাচ্য ঐতিহ্য তখনও জীবিত থেকে সম্ভাবনাময় এবং সেখানেই তা এমন সব শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী, সত্যের অপলাপ না করেও যাদের রেনাশাঁসী গৌরবের তুল্যমূল্য জ্ঞান করা চলে। কিন্তু এ তথ্যটা প্রয়োজনীয় যে য়োরোপীয় শিল্পকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখা দৃষ্টিবিভ্রমের পরিচায়ক এবং বিদেশী জমিতে সে প্রাচীন বৃক্ষের রোপণ সম্ভব না হলেও সেখানেই তাকে স্বাদু ফলপ্রসূ করা গেছে। তেলরঙের কথায় যদি ধরা যায়, পাশ্চাত্য চিত্রীর এই মৌলিক প্রকাশমাধ্যম ভারতে কোনোদিনই তৈরি হত না, ফলে আমাদের শিল্পীদের পক্ষে তার ব্যবহার ছিল সুদূর-পরাহত। ভারতীয়

জলবায়ুর চরিত্র বহুদিন পর্যন্ত মাঠে ঘাটে কাজ করার পরিপন্থী, এদেশের নর-নারী এতই বর্ণহীন পরিচ্ছদে অভ্যস্ত যে স্বাভাবিক পরিচ্ছদে তাদের বাস্তব রূপাঙ্কণ আদৌ সম্ভব ছিল না। আমাদের প্রাক্ষোভিক উদ্দীপক ছিল সুস্থির এবং জীবনছন্দে সেই বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য ছিল না যাতে সাহসী তুলির আঁচড়ে ছবিতে তা ফুটবে; আমাদের গৃহাবাস ছিল নিরলঙ্কার পরিচিত প্রকৃতি কঠোর, শতাব্দীব্যাপী সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়নের গুরুভার ব্যক্তিকে একাকার করেছিল সমষ্টির নৈর্ব্যক্তিকে। য়োরোপীয় শিল্পের বিদ্রোহী উদামের প্রবর্তনা এদেশে সঙ্গতভাবেই স্থানানৌচিত্য দোষে দুষ্ট বলে মনে হত; তাকে চিত্রিত করার প্রয়াসটা ছিল বড়জোড় একধরণের ছলনার অভিনয় এবং কোন আত্মবোধ-সম্পন্ন শিল্পীর পক্ষেই সে-নাটে চরিত্রাভিনয়ে বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, নাস্তি থেকে অস্তিজ্ঞানে পৌঁছানোর রাস্তাটা যুক্তিশাস্ত্রবিদের কাছে যেমন সরল, নিষ্ঠাবান, মানুষের কাছে অধিকাংশ সময়েই তা গোলকধাঁধাঁ। প্রায় প্রথম থেকেই কোনগুলি ভারতশিল্পের লক্ষণ নয় সে বিষয়ে যামিনী রায়ের ধারণা ছিল পরিষ্কার, কিন্তু দীর্ঘ পনেরো বছরের ক্লিষ্ট একাকিত্বের মধ্য দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল সে শিল্পের স্থায়ী স্বভাব। কিন্তু শুরু করতে গিয়ে তিনি তাঁর অর্থচিন্তা থেকে অঙ্কিত ছবিতে জনৈক শক্তিমান শিল্পীর পদ্ধতির ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন এবং তার সে হুইসলারপ্রীতি আজকে স্বভাবতই অপরিণতির চিহ্ন বলে মনে হয়, কিন্তু তাতেই তিনি বুঝেছিলেন, যে ছবিতে' তাৎক্ষণিক কম্পোজিশানের প্রযোজনের কাছে মাথা নোয়ায়, সে আত্মঅমর্পণের অনুপাতিক কমবেশিতেই ছবি ও ইলাসট্রেশানের তফাৎ ফোটে

এবং কবিতার উপাদান নাকি ভাবনা নয়, শব্দ ; তাহ'লে ছবির ভিত্তিতে থাকে রেখা আর রঙ, অনুকৃত মডেলের দাবিকে গ্রাহ্যে না এনে যাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতায় রূপ নিতে হয়। এ সন্দেহ অমূলক নয় যে হুইসলার যত তীব্রতায় এ নীতির প্রচার চালান, কাজকর্মে তার প্রয়োগগত অক্ষমতার পেছনে কাজ করে তাঁর দুর্বল ড্রইং, যামিনী রায় তাঁর নাবালক বয়সেও যে দুর্বলতায় কখনও ভোগেন নি। একই সঙ্গে স্মরণীয় যে অর্থহীন পুঙ্খানুপুঙ্খতা এবং স্থানিক ছায়ার বিন্যাসজাত লক্ষ্যচ্যুত চিরকালই তাঁর কাছে সামগ্রিক এফেক্টের প্রতিকূল মনে হয়েছে।

যে-মানুষ রঙকে ছবির মৌল উপাদন মনে করেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের উৎস ভুলতে বাধ্য এবং তাদের আলোর বাহন হিসাবে না দেখে কতকগুলি মোজাইক স্ল্যাব হিসাবে দেখেন। তখন যদি যামিনী রায়ের সঙ্গে সেজানের পরিচয় থাকত, তাহলে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর আত্মার আত্মীয় খুঁজে পেতেন এবং সেই ফরাসী ভদ্রলোকের উদাহরণে নমনীয়তার বর্জন ও ব্যাপকতর সঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে তাঁর কালবিলম্ব হত না, যেখানে আলোকের যথাবিধি স্বীকৃতি সম্ভব এবং শরীর ও পরিচ্ছদ বাস্তব-বিভিন্নতার সংগঠনে সমপরিমাণ প্রতিফলনক্ষম। কিন্তু তখনও তা হবার নয়। চক্রাবর্তন শেষ করে ফিরতে হবে তাঁকে তাঁর অল্পবয়সের মাধ্যমে—অবশ্য এবার তার ব্যবহার সামান্যতম অর্থ-চিন্তামুক্ত হয়ে অনাসক্ত কৌতূহল থেকে হতে থাকবে, যতক্ষণ না একাধিক য়োরোপীয় শিল্পের সঙ্গে আপনার আপাতিক সাদৃশ্য তিনি আবিষ্কার করে ওঠেন। ইতিমধ্যে ভারতশিল্পের সমস্যাচিন্তায় মনোনিবেশ প্রয়োজন,' ধরতাই বুলি কিংবা মহাজনপন্থার অন্ধ অনুসৃতির কবলে না পড়েও ঐতিহ্যের অঙ্গিকার সম্ভব কি-না এ প্রশ্নেও সাধারণ দাবি করছিল, আর স্বাধীনতা কোথায় স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠে উৎকেন্দ্রিকের জাতীয়তা তথা স্বাভাবিকতা বর্জনের সহায়ক হয়, সেটা জানার প্রয়োজনও নিতান্ত কম ছিল না। সমস্ত কিছু স্বীকার করেও বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মানবিক উদ্ভাবনীশক্তি আসলে একটা উপকথা মাত্র ; মানবাচরণের প্রধান গতিপথ প্রাচীন প্রস্তর যুগেই নির্ধারিত হয়ে আছে—জনৈক সচেতন ব্যক্তির দখলে সর্বাধিক স্বতন্ত্র চিন্তাটাও সম্ভবত সীমাবদ্ধতার ভ্রান্ত ধারণা থেকে সুদূর অতীতে বর্জিত কোনো পথেরই পুনরাবিষ্কার।

দুই

কিন্তু এইসব আমার অনুমান-নির্ভর। সেই মুহূর্তে সমসাময়িকদের ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনটা ছিল জরুরী। ড্রইং-এর সুস্থিরতা ও প্রত্যক্ষণের যাথার্থ্য বজায় রেখেও, দৃষ্টিবিভ্রমকেই উচ্চশিল্পের লক্ষণ না মেনে

এবং যুক্তির বিরুদ্ধে জেহাদই কুশ্রীতার বিরুদ্ধাচরণের পথ হিসাবে গ্রহণ না করেও বাজারের চাহিদা মেটানোর একটা আন্তরিক প্রচেষ্টার দরকার ছিল। সাধারণ্যে সেন্টিমেণ্টের দাবিই প্রবল এবং সে দাবি মেটানো সাধ্যের অতীত কিছু নয় বটে, কিন্তু তাদের তো প্রথমেই এশিক্ষাটা অপরিহার্য যে শিল্পের জগৎ মৃত রাজন্য বা পুরাকাহিনীর চিরজীবী চরিত্রের নিরঙ্কুশ জমিদারী নয়। তাদের সতর্ক করাও দরকার যে ছবি বলতে বিচিত্র বর্ণাভার জোড়াতালিকে বোঝায় না, সঙ্গীতময় উপাদান-সমূহের উন্নত বুননকেই বোঝায়। এটাও জ্ঞাতব্য যে স্থানিক বর্ণের কাছে বিশ্বস্ততা প্রশংসনীয় গুণ বটে, কিন্তু ধারণার ঐক্য বিসর্জনে তার উৎসাহ শূন্য। আলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের স্থান পূরণার্থেই সে ধারণাগত ঐক্য অর্জিত হয় সামতলিক বর্ণাভার যৌক্তিক বিন্যাস-পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। আর ছবির বিষয় সম্বন্ধে বলতে হয় যে এই বিপুলা পৃথ্বীর দৈনন্দিন জীবন সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব, সংবেদন বা সৌষ্ঠব কোনোটা থেকেই বঞ্চিত নয়। শিশু তার মায়ের কাছে স্তোত্রের পাঠ নিচ্ছে, কৃষক টোকা মাথায় গনগনে মাঠে হলকর্ষণে রত কিংবা কোনো নিখুঁত কালো মেয়ে দর্পণতুল্য নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে মাথার উজ্জ্বল চুলে লাল ফুল গুঁজে নিতে—এমন সব দৃশ্য, যার সঙ্গে এ বিশ্বের দৃষ্টির সদ্ভাব আছে, তাঁর কাছে আবেদনে তুলনারহিত। ছবির বিষয়কে যদি তার জাতিচরিত্রের নিরূপক বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে যামিনীবাবুর ছবি-গুলি ভারতশিল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। পরন্তু এসব ছবিতে যে শিল্পী আত্মপ্রকাশে ব্যগ্র, নিঃসন্দেহে আপন মাধ্যমে তিনি স্বরাট্, চোখের কব্জির এবং মনের দ্বিধাহীন ব্যবহার তাঁর দখলে এবং প্যালেটে শুধু লাল, নীল, হলুদ কালো এবং কদাচিৎ সাদা রঙ নিয়ে এমন এফেক্ট সৃষ্টিতে তিনি সক্ষম, রঙের ব্যাপারে সবচেয়ে বদান্য শিল্পীরও যা স্বপ্নের অগোচর।

এসব ছবির বিরুদ্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে: এদের শিল্পী প্রতিভা-শালী বটে, কিন্তু দূর-মিল সত্ত্বেও সেই মহৎ ধারার শিল্পী নন, যে ধারায় রেনোয়ার জন্ম হয়েছে, যিনি মননশীল থেকেও সেন্টিমেণ্টের চর্চায় পারদর্শী, চিত্রগত সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখেও যাথাতথ্যে মনোযোগী হতে যার বাধে না। এ পর্যায়ের ক্যানভাস নয়নরম্যতার অতিরেক দোষে এমন একটা অকিঞ্চিৎকরতা পেয়েছে যে, সমুচ্চমানের আলোকে তাদের বিচার চলে না এবং সৌভাগ্যক্রমে এসব ছবির কনটুরে বা দেহরেখায় ঋজু কাঠিন্য ছিল, আর চর্ম বা পেশীর সংস্থাপনে আমাদের ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্ক্ষার প্রতি আবেদন আদৌ ছিল না বলেই রক্ষা অন্যথায় আমাদের অজাত স্থানীয় অ্যাকাডেমির প্রথম সভাপতি যামিনী-বাবুই হতেন, এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়।

মুক্তজগতের বিষয়বস্তুর গুহাভ্যন্তরে বসে রচিত এসব শিল্পরূপ দারুণ সংগঠিত হলেও যাথাতথ্যে কিঞ্চিৎ নিরেস। সেগুলি কোন অর্থেই ইলাসট্রেশান

নয় বটে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে দরিদ্র না হয়েও তাৎপর্যে অগভীর এবং এসব কারণেই ভারতশিল্পের প্রকৃত উদাহরণ থেকে এদের পার্থক্য ঘটে গেছে। ভারতীয় ছবিতে দেখা যায়, অস্বীকার করতে না পেরে ইতিহাসকে সেখানে পুরাণে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য ব্যবহৃত হয় আলঙ্কারিক মোটিভ হিসাবে, দেশকালকে অতিক্রম করে গিয়ে সে চিত্রাবলী মানবিক ভঙ্গুরতাকে বিমূর্ত ফর্মে আকার দেয়।

যামিনী রায়ের সংযম ও মাত্রাজ্ঞানই তাঁকে এ পর্যায়ের বন্ধতা থেকে বাঁচিয়েছে। পূর্বেই, অর্থাৎ এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বে তিনি বুঝেছিলেন যে উত্তেজিত নায়কদের অস্তিত্ব শিল্পজগতের চেয়ে বিয়োগান্তক নাটকেই সমধিক প্রয়োজনীয়। তিনি বুঝেছিলেন যে, তৈরি-রঙের প্রাচুর্য শিল্পীর সহায়ক নয় বরং পিছুটান। এবং এখন চৈনিক উদাহরণে শেখা শুরু হল কীভাবে তীক্ষ্ণ কৌণিকতার প্রয়োগ ছাড়াই দূরত্ব বোঝানো সম্ভব, কোনো ফিগারকে ঘনত্বের সঙ্গে রাখতে হলে তাকে আকারে কমিয়ে আনতেই হবে, এমতও মান্য নয় এবং সে উদাহরণ তাঁকে আরও শেখাল যে, অনুকৃতি-বর্জন করেও মুখমণ্ডলে অনুভূতির ছাপ আনা যায়। তাঁর প্যালেটের রঙের সংখ্যা আরও কমল; ধূসর রঙের প্রাধান্যের সঙ্গে গণ্ডদেশকে জীবন্ত করতে কদাচিৎ লালের ব্যবহার কিংবা কচিৎ চুল বা শাড়ির সীমান্তে ঔজ্জ্বল্য আনতে কালোর টানও দেখা গেল। সুতরাং অন্তত বর্ণের দিক থেকে এই অধিকতর পরবর্তীকালের ক্যান-ভাস নিঃসন্দেহে কোরোর সুভেনিদিতালী কিংবা মানের অলিম্পিয়ার শ্রেণীভুক্ত।

কিন্তু এখানে আবার জোর দিয়ে বলা দরকার যে প্রত্যক্ষ প্রভাব সন্ধান এক্ষেত্রে পণ্ডশ্রম, এরা আসলে একই ধরণের অনুসন্ধানজাত সদৃশ আবিষ্কার মাত্র। এবং এও স্মরণীয় যে মানের সঙ্গে যামিনী রায়ের সাদৃশ্য এখানেই যে তাঁরা উভয়েই নিখুঁত বর্ণনায় পারদর্শিতা নিয়ে লক্ষ্যহীন পুঙ্খানুপুঙ্খতাবর্জনে সমান উৎসাহী এবং সুস্থির সঙ্গতি উপার্জনের জন্য দুঃসাহসিক সরলীকরণে অভ্যস্ত। কিন্তু তবু শিল্পী অতৃপ্তি থেকে নিস্তার পেলেন না। ভারতীয় শিল্পকে এসময়ে সব থেকে সুদূর মনে হল। যদিও এসময়ের বেশ কিছু পরে তিনি কয়েকটি শিশুসহ ম্যাডোনা এবং তিনজন মেরী সম্বলিত একটি বা দুটি ত্রয়ী এঁকে দেখিয়ে ছিলেন যে বিষয় বা তার ট্রিটমেন্ট ছবির জাতিচরিত্র নির্ধারণে অল্পই কার্যকরী বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিজাত টেকনিকই সে চরিত্র লক্ষণের নিরূপক। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা, সেই মুহূর্তেই তো তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, বিশুদ্ধিকরণের চরমে পেঁছিতে হবে এবং সমস্ত বহিরাশ্রয় বর্জন করতে করতেই অর্জিত হবে পূর্বসূরীদের সালোক্য। তখন এ নিরীক্ষাই প্রয়োজনীয় যে রেখার সাহায্যে কতখানি সিদ্ধি সম্ভব, সে-রেখা অবশ্যই সমতলের পরিবর্ত বলে ছায়াময় কিন্তু নম্যতাবর্জনে অনুৎসাহী। যামিনী রায় চিরকালই যুক্তিবাদী, একটু হয়তো বেশিমাত্রাতেই যুক্তি মানেন এবং যেহেতু তিনি এখন স্থানে আবদ্ধ নন, তাই কালকে স্বীকার করার যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না। তাই প্রাথমিক রঙের খাতিরে ধূসরকে ছাড়তে হল, বিশেষত শিল্পী যেখানে ঘনত্বে আগ্রহী ; কিন্তু যেখানে আগ্রহ অন্যত্র, সেখানে পিগমেণ্ট বর্জিত হল বিভিন্নস্তরের কালোরঙের সহযোগে, ঘন স্পন্দমান রেখার ব্যবহার লক্ষনীয় হয়ে উঠল।
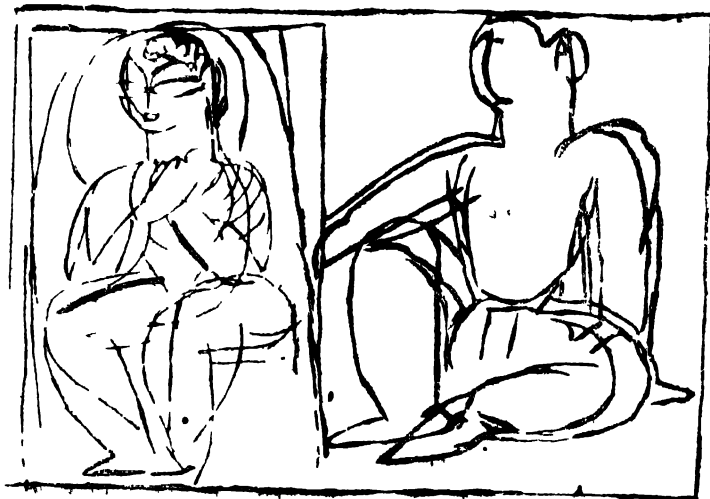
তিন

অতঃপর যখন তিনি আপন প্রগত অন্বেষার পুরস্কারস্বরূপ একনিষ্ঠ ভক্তকুলকে হারিয়েছেন, এমন সময় একদিন বিস্মৃতির কুয়াশা তাঁর স্মরণ থেকে অপসৃত হল, আকস্মিকভাবে মনে পড়ল যে গ্রামীণ পিতার অভিভাবকত্বে থাকাকালে শৈশবে মূর্তি তৈরির সাধ মেটাতে তাঁকে পাঠানো হত গ্রামের কুমোর বাড়িতে, সেখানে তিনি নির্ধারিত রূপের হাত আঁকার কাজ পেতেন, এবং অধুনা-অঙ্কিত বিমূর্ত প্রতিমাগুলিতে রূপভেদ না ঘটিয়েই তাদের প্রয়োগ সম্ভব। এরপর থেকে দেশের লোকশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তায় সন্দেহের অবকাশমাত্র রইল না। কিন্তু সাফল্যের এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও তিনি যে সেখানে আবদ্ধ না থেকে নতুন ভূখণ্ড অধিকারে যাত্রা করলেন, তার আংশিক কারণ হচ্ছে, কালিঘাটের পট ও বিষ্ণুপুর পাটার মত বাঙলাদেশের শিল্পের দুটি সহজলভ্য নিদর্শন তাঁর কাছে জাতীয় শিল্পের বিশুদ্ধ উদাহরণ হিসাবে গ্রাহ্য হল না। প্রথমটির রীতিশুদ্ধ স্বভাববাদের উৎস স্পষ্টতই য়োরোপীয় হওয়ায় যামিনী রায়ের কাছে কালিঘাটের পট য়োরোপীয় প্রভাবের চিহ্নবহ আর দ্বিতীয়টির উৎস স্থানীয় বটে, কিন্তু এর চারপাশেও অবক্ষয়িত রাজসভার আবহ, ডিজাইনের প্রেরণা হিসাবে শৃঙ্খলাবোধের চেয়ে ভোগাসক্তিই সেখানে প্রবলভাবে কার্যকরী। তবে উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানাই অধিক প্রামাণ্য এবং ফেনিল ইন্দ্রিয়-বিলাসটুকু বর্জিত হয়ে সে-ঘরানাই যামিনী রায়ের পরবর্তী কয়েকবছরের অধিকাংশ খোদাই-চিত্রের প্রেরণা হয়েছে—কখনও পুরাণকে প্রসঙ্গ করে, কখনও-বা সেগুলি ঘটনাবর্ণনে উৎসাহী, গোপিনীদের প্রতি দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও ছবিগুলিকে মানবরসে বঞ্চিত বলা চলে না।

বর্ণবাহারও ফিরে এল পূর্ণ ঐশ্বর্যে—ঘন সবুজ এবং ভারতীয় লোহিত, স্বর্ণময় হলুদ এবং মান্দারিণ নীল, প্রগাঢ় পিঙ্গল এবং ভারি কালো, এদের সঙ্গে দেখা দিল এমনকি কপোতধূসর এবং প্রাচীন গোলাপী। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই একটা রঙ্ অন্যের উপর ছায়া ফেলে না এবং সর্বত্রই তাদের জাগতিক বর্ণের সদৃশ হয়ে ওঠার চেষ্টা থেকে নিরস্ত করা হয়েছে। সমতার সঙ্গে তাদের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তুলির দাগটুকুও সযত্নে মিলিয়ে দেওয়া হল বাস্তব-সাদৃশ্যের অণুমাত্র সন্দেহ বা ছায়াটুকুও মুছে ফেলতে। তাই এসব ছবির পীতাভ গাঢ় লাল আকাশে হেলানো থাকে নীলবর্ণ বৃক্ষ এবং শ্যামলরমনীরা ভাস্কর্যভঙ্গিতে বসে বা দাঁড়িয়ে শ্বেতপত্র ও কৃষ্ণকুসুম অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেয়; কিংবা সেই সুনীল বালক স্থানাতীত কুটিরের দ্বিমাত্রিক খোপে সৌর নৃত্যে রত দেখা যায়, তার হাতের পায়ের অলক্তক, কপোতধূসর প্রেক্ষাপটে পার্বত্য দেবদারুর ধাতব বাদামীর পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। রঙের এই অবাস্তবতার জন্যই যে তারা নিগূঢ়ভাবে ভারতীয় তা নয়, আসলে সে চরিত্র ফোটে গুণগত ও

সংযোগগত কারণেই। তাছাড়া এসময়েই যামিনী রায় দু-দশকব্যাপী তেল ও জল রঙ্ দিয়ে কাজ করার পর অকস্মাৎ তাদের বদলে টেম্পেরাকে মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন, এ ঘটনাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই টেম্পেরা তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার সর্বাধিক যোগ্যতাই রাখে না, উপরন্তু এটা ভারতীয় জলবায়ুর তীব্রতা সহনে সক্ষম। সর্বোপরি টেম্পেরা সম্পূর্ণ দেশজ উৎপাদন এবং সস্তা হওয়ায় যথেচ্ছ ব্যবহারে বাদ সাধেনা। ক্যানভাস, কাপড়, কাগজ কিংবা কাঠের ওপর সম-পরিমাণ এফেক্ট ও স্থায়িত্বের সঙ্গে টেম্পেরাই ব্যবহৃত হতে পারে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যাত্রায় তাঁর ছেদ পড়ল না; তখনও বাংলা দেশের চিত্র-রূপের চাবিকাঠি হাতে পাওয়ার তৃপ্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিতই মনে হল। যেহেতু প্রতিকূল জলবায়ু সে চিত্ররূপের অধিকাংশকেই আস্ত রাখে নি, তাই বাঙালী-চারিত্রসন্ধানে তিনি সাহিত্যের দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন, কারণ বাংলাসাহিত্য একই পরিণামী অবলোপ সৌভাগ্যক্রমে এড়িয়েছে। পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি ঐক্যমতে এলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈষ্ণববাদ বাঙালীর নিজস্ব অবদান। প্রত্যহ শোবার আগে বৈষ্ণবগ্রন্থের পাতা ওলটানোর অভ্যাস করার পর একদিন অকস্মাৎ এমন একটা কাহিনীর খোঁজ পেলেন, যা তাঁর মতে শুধু যে আপনার আজীবনের শিল্পসমস্যা সমাধানের দিশারী হল তাই নয়, ব্যাপক ভাবে শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এল। কাহিনীটা হচ্ছে যে, চৈতন্যদেব শেষপর্যন্ত ভক্তিবাদে এমন দিব্যোন্মাদনা পেলেন যে, কৃষ্ণপ্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রহর্ষজাত চেতনালোপ হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। শিষ্যসামন্তেরা সেকারণেই, এমনই নিশ্ছিদ্র সতর্কতায় প্রভুকে পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যে জনৈক কবিযশঃ প্রার্থী এই সন্তের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে একটি পল্লবিত ভক্তিগাথা অর্ঘ্য নিয়ে সুদূর নবদ্বীপে এসেও কবিতা শোনাবার কাঙ্ক্ষিত অনুমতি পান নি। অবশেষে, প্রায় জুতোর শুকতলা ক্ষওয়ালে, শিষ্যপ্রধান স্বরূপদামোদর কবিতাটা শুনতে রাজি হন। কিন্তু সবেমাত্র উৎসর্গবাচক চতুষ্পদী আবৃত্তি শেষ হয়েছে, এমন সময় সমবেত শংসাময় জনমণ্ডলীকে চমকে দিয়ে স্বরূপ গোস্বামী ঘোষণা করলেন যে রচনাটা কাকবিষ্ঠার মতই ন্যক্কারজনক। কারণ রচয়িতা শুরুতেই সংশিলস্ট অবতারের সঙ্গে জগন্নাথের তুলনা করে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। চৈতন্যদেব, হাজার হলেও মরদেহধারী আর জগন্নাথ এ ত্রিলোকের ঈশ্বর। সুতরাং সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রাথমিক নীতিই এখানে লঙ্ঘিত—বাস্তব ও অবাস্তব, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের নির্বিচার সে নীতি দণ্ডনীয় জ্ঞান করে।

কাহিনীটার নীতিকথাটুকু স্বতোপ্রকাশ—আমাদের ঐতিহ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ নয় বটে, কিন্তু উপস্থাপনে তাদের স্বাতন্ত্র্য, অবশ্যমান্য, আর সে উপস্থাপনাও ঘটবে তাদের নিজ নিজ গুণের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানার অধিকারী কে? শতাব্দীব্যাপী

কৃত্রিমতার চর্চায় এবং প্রকৃতির বিচ্ছেদে সংবেদনাভ্রষ্ট একজন সভ্য বয়স্ক নিশ্চয়ই উক্ত ভেদ নির্ণয়ের যোগ্যতা রাখে না। এ যোগ্যতার অধিকারী সেই গুহামানব, যে আলতামিরায় এঁকেছিল, আফ্রিকার নিগ্রো, যে এখনও নিউগিনিতে কাঠখোদাইয়ে রত কিংবা তিন বছরের শিশু, মানুষের রূপ যার কাছে দুটো অসমডিম্বাকৃতি থেকে চারটি প্রসারিত রেখায় প্রতিভাত। নিঃসন্দেহে এতখানি নৈরাত্ম্যদৃষ্টি যে কোনো আধুনিক মানুষের সপ্তমবর্ষের পর নাগালের বাইরে চলে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের সুদূর জেলায় গ্রাম্যশিল্পীরা তাদের সংবেদনাময় অভিজ্ঞতার চিত্রাঙ্কণে এখনও সক্ষম। এখনও তারা ভোলেনি, যেমন আমরা ভুলেছি যে, একটা দূরত্ব থেকেই বস্তুর সামগ্রিকতা স্পষ্ট হয় আর সে দূরত্ব বর্তুলাকারকে থেবড়ে দেয় এবং ঘনক্ষেত্রকে কমিয়ে আনে সমতলে। প্রথমেই

আমাদের চোখে পড়ে বস্তুর বিশুদ্ধ রূপ, পরে দ্রষ্টা সামর্থ্য অনুসারে সে-রূপের খণ্ডিত ছাঁচ বিষয় দিয়ে পূর্ণ করে। প্রত্যেক সৎশিল্পীরই উচিত, যখনই সম্ভব, চিত্রে কতখানি তাঁর নিজস্ব আর কতটুকুর জন্যই বা তিনি বহির্জগতের অধমর্ণ, সে-সত্যের প্রকাশ ঘটান। অশিক্ষিত শিল্পী প্রকাশ করেন তাঁর সম্মানিত মানুষকে বৃহদাকারে এঁকে, আর যার সম্পর্কে তার বিরাগ গভীর, ছবিতে তার মাপ কমিয়ে—যদিও দেখার সময় তিনি উভয়কেই সমান আকারে দেখেন। দৃশ্য চেহারা যেহেতু তাতে বদলায় না, শুধু মাপটাই কমে বাড়ে, তাই আপন দৃষ্টির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত।

এ নীতিকে কার্যকরী করার অন্য যে পথটা আছে, তাকে বলা যায় নিকটদৃষ্টি—যার প্রভাবে বস্তু একদল অসংগঠিত বর্গক্ষেত্র বা উপরিতলে পরিণত

হয়; এবং যেহেতু য়োরোপীয় টেকনোলজির বোলবোলাও-এর দিনে জন্মে একজন কিউবিষ্ট শিল্পী যেমন বস্তুর স্বরূপপরিচয়ের দাবি করতে পারেন, যামিনী রায়ের সে দাবি নেই, অগত্যা দূরদৃষ্টিই তাঁর গতি, আধুনিক য়োরোপীয় শিল্পীর নিকটদৃষ্টির চেয়ে যুক্তিগত প্রামাণিকতায় যার অনুমাত্র ঘাটতি নেই। কারণ আদিম শিল্পীর নম্রতা ও বিনয় কখনই যুক্তিহীনতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারে না। এই যুক্তিসিদ্ধ বিনয়েরই প্রকাশ লক্ষণীয় হত, যখন কোনো নিরক্ষর খরিদ্দারের জন্য তাদের ধর্মীয় কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে হত, যে কাহিনীতে তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় হলেও প্রত্যক্ষ ধারণাজাত জ্ঞান ছিল শূন্য। এ সমস্যার সমাধানে তাঁদের গৃহীত পদ্ধতির সঙ্গে আলোকপ্রাপ্ত রাজন্যবর্গের পক্ষপুষ্ট নাগরিক শিল্পীদের দ্বারা পরিমার্জিত ঐতিহ্যানুসারী

পদ্ধতির স্বাভাবিক সাধর্ম্য আবিষ্কার দুরূহ নয়। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে, বিদগ্ধ নাগরিকশিল্পী তাঁর সংশয়ী চিন্তায় বাস্তবমাত্রকেই প্রচলিত অভ্যাসিকতার রীতিজ্ঞানে এমনই রূপান্তরযোগ্য ও মাননির্ণায়ক বলে মানতেন যে বিশ্বাস করতে তাঁর বাধে নি, তার মধ্যেই অপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা সম্ভব। অন্যপক্ষে, গ্রাম্যশিল্পী বিশ্বাসী প্রবণতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, অতিপ্রাকৃতের জগত ইন্দ্রিয়জগতের চেয়ে কম তো নয়ই বরং সমধিক নিরেট। ফলে দৈনন্দিন মূল্যবোধের রদবদল এবং গূহ্যতান্ত্রিক মুদ্রার প্রাধান্যাতিরেকের প্রয়োজনেই বৃক্ষাবলী হয়েছে খাটো আর নায়ক নায়িকারা নিলেন দীর্ঘ কায়া। সুতরাং এ সকল চিত্রাঙ্কণ কতিপয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিদগ্ধজনের চিত্তবিনোদের উদ্দেশ্যে অলঙ্কৃত দুর্বোধ্য পরীক্ষামূলক রচনা নয়, বরং সমগ্র জাতির অচেতন

জীবনীশক্তির প্রভাবে তারা আশ্চর্য ভাবে জীবন্ত। বলা বাহুল্য অচেতন শব্দটা এখানে ফ্রয়েডের প্রভাবে নয়, য়ুংকে মেনে ব্যবহৃত হল, আর তার প্রভাবেই হয়তো সেসব শিল্পী শ্যামের চেয়ে রামের জীবনচিত্রায়ণে সমধিক দক্ষতা দেখাতেন, কারণ শ্যামের রতিসুখসার ধ্রুপদী ট্রিটমেন্টের পক্ষেই অধিক অনুকূল ছিল।

চার

রুশোর সময় থেকেই আদিম গুণাবলীর প্রতি অন্ধ আসক্তি বৈচিত্র্যময় খেয়ালী চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং যামিনী রায় যদিও কখনই উক্ত বিশ্বাসের শরিক নন, অন্তত যেখানে আত্মাদর ও সংগ্রামবিমুখতাই তার পোষক, কিন্তু শহরের প্রতি যামিনী রায়ের নিতান্ত অবিশ্বাস। শহর, যেখানে ভারতীয় জীবনের ঐতিহ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে জটিলতার উপসর্গ প্রকট হচ্ছে, চিরকালই যামিনী রায়ের সন্দেহ কুড়িয়েছে। আসলে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত শান্তিপ্রিয়তা তাঁকে পলায়নবাদী অপবাদ দেওয়ার অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু তাঁর ছবিতে সমসাময়িকতার প্রকট অভাব কিংবা ক্ষিপ্রতার অনস্তিত্বের জন্যই তাঁর উপরিউক্ত জাতের ছবির প্রথম প্রদর্শনীকালে সহশিল্পীমহলে বিহ্বলতা বা বিদ্রূপের বন্যা বয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত অমূলক। তখনও পর্যন্ত, সহশিল্পীদের সোৎসাহ সহানুভূতি তিনি দৈবাৎ পেলেও, জনপ্রদর্শনীর সংগঠকগণ তাঁর আদরে অকুণ্ঠ ছিলেন শুধু সার্বিক বন্ধ্যাত্বের যুগে তাঁর ছবির ভাসিয়ে-দেওয়া প্রাচুর্যের জন্য নয়, পরন্তু তাঁর পদ্ধতিতে তাঁদের জ্ঞানের অগোচর এমন-একটা-কিছু ছিল, যেটা সর্বজনস্বীকৃতি আনেনি বটে, কিন্তু কতিপয় শিল্পোৎসাহীকে চিরকাল উদ্বেজিত করেছে। এবং এই কতিপয়ের ভূমিকাই শিল্পক্ষেত্রে মূল্যবান। কারণ পূর্বেই আমি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টার ত্রুটি করিনি যে, ব্রিটিশরাজ আমাদের সমাজ সংগঠনে এমনই বিপর্যয়ের জনক যে শিল্পীরা তাঁদের সহযোগী সাধারণের সংযোগ হারিয়ে আপন হিতকর ভূমিকা ছেড়েছিলেন এবং বিদেশী কিংবা সম্পূর্ণ নির্জীব রীতির অনুকরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের চিন্তা ছিল, তাতে অন্তত কতিপয় ধনী-সংগ্রাহকদের স্বত্ববৃত্তির কাছে আবেদন করা যাবে। অবশেষে উঁচু-কপালেদের সাযুজ্য বজায় রেখেও যামিনী রায়ের নিন্দা রটনার সুযোগ এল। নির্দ্বিধায় বলা চলল যে, যামিনী রায় আর পশ্চিমী রীতির দক্ষ অনুকারক বা ভারতশিল্পের একমাত্র নিপুণ প্রয়োগবিদ নন—কৃষককুলের রীতি আত্মসাৎকারী জালিয়াত।

এসব নিন্দুকদের সচেতন জগতেই যে সর্বদা এমন চিন্তার খোঁজ মিলত এমন নয়। এবং যখন তাঁর পূর্বতন শিক্ষকদের একজন এতখানি আত্মবিস্মৃত হলেন যে, তীর-ধনুক নিয়ে ক্রীড়ারত সাঁওতাল বালকদলের একটি সু-চিত্রিত

ছবি সম্বন্ধে সাধারণ্যে হঠোক্তি করে বসলেন যে, ছবিটির ড্রইং একটা অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন বালকের পক্ষেও শোধরানো সম্ভব তখন আসলে তিনি কুৎসায় মেতেছিলেন। কারণ সে-শিক্ষকের নিজের কাজে-কর্মে স্পষ্টতই সুষ্ঠু শিল্পচিন্তার দারিদ্র্য ছিল স্বপ্রকাশ, শিল্পের ইতিহাস জ্ঞান ছিল হতাশাজনক, এবং দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমনই নির্মূল হয়ে ছিঁড়েছিল যে, জীবন্ত ঐতিহ্যের সন্ধান তিনি কখনই জানেন নি। অথচ পূর্বসূরীদের উপাসনার ভৌতিক মহিমায় তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ঈর্ষাযোগ্যভাবে স্ফীত হয়, আর সে স্পষ্টগোচর সিদ্ধির প্রসাদে তাঁর মতামতের মূল্য অন্তত ওজনে বেড়েছিল। ফলে অকর্মণ্য অথচ নিরপেক্ষ সমালোচকদের মনে হল যে, যামিনী রায়কে পটপদ্ধতির যোগ্যতম চর্চাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং শক্তিক্রমক্ষীয়মানতার কারণে তিনি এ পদ্ধতি থেকে সরে আসছেন এমন ইঙ্গিত দিয়ে, তাঁকে তাঁর প্রাপ্যের অধিক মর্যাদা দিয়ে ফেলেছেন। যামিনী রায় যে সে-ধারায় আর ছবি আঁকছিলেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্জনটা ঘটেছিল উক্ত ধারার অন্ত-নির্হিত বিকাশময়তার সঙ্গে সঙ্গীতি রেখে, যাতে তার পরিসর হয় বিস্তৃত এবং ধরা পড়ে জটিল জীবন, এ-ধারার উদ্ভবকালে অস্তিত্বহীন জটিল জীবন। তাঁর ছবির জজসাহেবরা যদি শিল্প ও পুরাতত্ত্বের তফাৎটুকু বুঝতেন, তাহলে তাঁদের আরও বোধগম্য হত যে আমাদের ঐতিহ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব কোনোদিনই অস্বীকৃত নয়। সঙ্গীতকে সমস্ত শিল্পের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলে জেনে কয়েকটি মৌলিক উপাদানের প্রতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে গায়কীর ক্ষেত্রে তা শিল্পীর স্বকীয়তার প্রশ্রয়দাত্রী, এমনকি বলা চলে, শিল্পীকে তা মৌলিকত্বে বাধ্য করে যাতে স্থায়ী ভাবের কাঠামোয় অনুভূতিগুলি নতুন নতুন সম্বন্ধ স্থাপনে অর্থময় হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে যাই হোক, সাধারণ্যে এমন প্রত্যাখ্যান জুটলে জনপ্রদর্শনে আত্মপ্রকাশ অর্থহীন। তাঁর সঙ্কীর্ণ পরিসরহীন গৃহে কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে তিনি নিজে যে, প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন, সেখানে মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর সুহৃদ বন্ধুদের তখনও টেনে আনা যেত। কিন্তু অর্থাভাব এমনই চরমে পেঁছিল যে, প্রায়শই পারিবারিক আলমারিতে হানা দিয়ে ধুতি শাড়ী টানতে হত ক্যানভাসের অভাব মেটাতে আর রঙ্ কেনার খরচ যোগাতে সান্ধ্য জলখাবার বাদ দেওয়া নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য তখনও সঙ্গীতসম্পন্ন গৃহস্থেরা শিল্প হিসাবে অকিঞ্চিৎকর প্রতিকৃতিতে আপন আপন পূর্বপুরুষের চেহারা চিত্রিত দেখতে আগ্রহী ছিলেন এবং যামিনী রায়ের নামের সঙ্গে তখনও তাঁর পূর্বখ্যাতির অবশেষ জড়িত থাকায় তাঁকে দিয়ে সে কাজ করানোয় তাঁদের সোৎসাহ সম্মতি ছিল। কিন্তু যামিনী রায়ের কাছে, যে অনুকারী চিত্রে তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়েছে, তারই চর্চা করে ধনীর উদ্বৃত্ত অর্থগ্রহণ অসততার

পরাকাষ্ঠা বলেই মনে হয়েছিল। সে আত্মবিক্রয়ের চেয়ে নিজের অভ্যন্তরে গুটিয়ে আসাই তিনি শ্রেয় মানলেন। শুরু হল ক্ষুদ্রতম উপকরণে জীবনধারণ; প্রত্যেকটি কাগজখণ্ড, যার ওপর ছবি এঁকে বিক্রয় সম্ভব তিনি জমিয়ে রাখতেন কৃপণের মতো। এবং কঠোর পরিশ্রমে তাঁর নতুন টেকনিকের পরিসর বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু এ শহরের প্রতি নিরতিশয় বিরাগের কারণে তিনি সে-পরিসরে শ্রমশিল্পমুখর নগরকে কখনই স্বীকার করেন নি; তিনি ধরতে চেয়েছিলেন ইংলণ্ডের ছোঁয়াচবর্জিত ভারতের বাস্তব সত্যের চেহারাটাকে।

এ সমালোচনার সত্য তিনি অস্বীকার করতে পারেন না যে, পরবর্তীকালে ফর্মের চেয়ে ফর্মালিটিই তাঁকে পেয়ে বসেছিল আর তার ফলে তিনি বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠলেও অর্থহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁর অধুনা-অঙ্কিত চিত্রাবলীর গভীরতার সংশোধন এবং বিমূর্ত আবেদন বজায় রেখেও তাদের দুর্বোধ্যতার বিসর্জন তখন অবশ্যকরণীয় ছিল। অন্য কথায় তখন নির্জীব রীতি নিয়ে মেতে থাকার সময় নয়; তাঁর আপন বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ যোগানোর দায় ছিল তাঁর নিজেরই অন্যথায় য়োরোপীয় সহ শিল্পীদের ভ্রান্তি এড়ানো যেত না। য়োরোপীয় শিল্পীরা রূপ আর আত্মসর্বস্ব দৃষ্টির পার্থক্য না বুঝে দৃশ্যজগতকে আপন বিশ্লেষণী ক্ষমতার গোলক ধাঁধাঁয় পরিণত করে আশা করেছিলেন যে দর্শকেরা তার সমাধানে পারঙ্গম হবেন। বিচিত্র বর্ণাভার খিচুড়ি, পশ্চাদভূমির তৃতীয় মাত্রার ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও তখনই মনুষ্যাকার নেয়, যখন দর্শক একজন চিত্র-বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যে কোনো দিক থেকেই শুধু বর্ণময় উপরিতলগুলিতেই চোখ রাখেন। আর বাকি আমরা যারা আদৌ বিশেষজ্ঞ নই, বস্তুকে বর্ণের আশ্রয় হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত এবং একই সঙ্গে তারা মানসিক অনুষঙ্গের কেন্দ্রস্থল, যে অনুষঙ্গের কয়েকটি অন্তত অনুবর্তনের সাদৃশ্যে এতই সামান্যতা পায় যে নিরাপদে তাদের নৈরাত্ম্য আখ্যা দেওয়া চলে। ফলে দৃষ্ট জগত থেকে তাদের নির্বাসন নিঃসন্দেহে এমনই প্রাতিস্বিকতার চিহ্নবহ যে শাসনে না রাখলে শেষ পর্যন্ত সেটা বিপর্যস্ত আত্মকেন্দ্রিকতার জনক হয়ে উঠতে বাধ্য।

তাছাড়া, পরিচিতির সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ কখনই অহি-নকুল নয়, বরং পরিচিতিগুণের সম্ভাবেই বিশেষ সামান্যতা পায়। কারণ তখন সে বিশেষ স্বগুণেই সকলের জানা এবং সকলেই তাকে অপরিচিত বস্তুসঙ্গ থেকে পৃথক করতে পারে। এ পরিচিতিগুণের মূল অন্তত মনুষ্যদেহের ক্ষেত্রে, আকার মাপে বা রঙের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে মিলবে না, যেহেতু এদের প্রত্যেকটাই দর্শকের সঙ্গে সে মনুষ্যদেহের দূরত্বের ওপর একান্ত নির্ভরশীল, মুখমণ্ডলের আকৃতি কিংবা মুখভঙ্গিতেও সে মূলানুসন্ধান পণ্ডশ্রম, কারণ তারাও তো ঘন ঘন বদলায় আর দূরত্বে মেলায় অদৃশ্যে। সমগ্র দেহভঙ্গিই পরিচিতিগুণের যথার্থ

আশ্রয়, একবার লক্ষ্যে এলে যাকে পরিচিত বলে চিনতে পলমাত্র দেরি হয় না। অবশ্য দেহভঙ্গিও গতি পেলে প্রায়শই বঞ্চনা করে এবং দৃষ্টিবিভ্রমের সুযোগ ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত যে পরিচিতিবোধ আনে, সন্ধানে তার যাথার্থ্য টেঁকে না। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও দেহভঙ্গিই যেহেতু তার উদ্ভবচিহ্নটুকু বহন করে মাত্র, ঘটনাপরিবেশের প্রভাবে ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না, সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা দেহভঙ্গিরই আছে, শরীরের বর্ণ বা মাপ সে-বিবেচনার দাবি করতে পারে না। অতএব যে শিল্পী বর্ণনার পৌর্বাপর্য থেকে সরে এসেছেন, তাঁর কাছে মনুষ্যমূর্তির ভঙ্গি, যদি ব্যক্তিরূপের নাও হয়, অন্তত তার টাইপ বা জাতিরূপের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায় এবং যামিনী রায়ের ইদানীংকার সমস্যা যেহেতু জন্মকালেই অপরিবর্তনীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশিত, কোনো ক্রোচে-নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার কল্পপ্রতিমা রচনার সমস্যা নয়, বরং কোনো ঘটনার
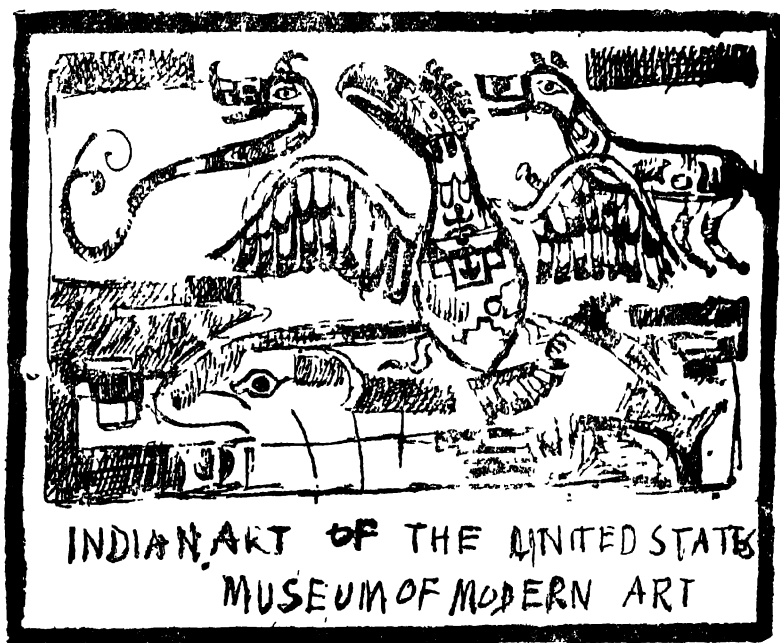
সামান্য লক্ষণগুলির মূর্ত আকার দেওয়ার সমস্যাই তখন তার কাছে জরুরি, তাই তাঁর পরবর্তী বছর দুয়েকের ছবিতে তিনি সমস্ত রিপোর্টাজ বর্জন করেও নিশ্চিতভাবে তথ্যকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছেন। স্পষ্টত এক্সপ্রেসনিজমের সঙ্গে ন্যাচারালিজমের শুভবিবাহ দিয়েই তিনি একাজে সক্ষম হয়েছেন আর পোস্টইম্প্রেসনিজম্ সে শুভকাজের ঘটকের দায়িত্ব পালন করেছে। কারণ এ পর্যায়ের

উদ্দেশ্য রূপায়নে তাঁকে প্রায়শই বৈশিষ্ট্যময় দেহরেখার রূপান্তর ঘটিয়ে বাস্তব মুখাকৃতির যোগ্য করে তুলতে হয়েছে, অথচ সে মনুষ্যরূপের বয়স জীবিকা শ্রেণী ও ধর্মের চিত্রায়ণ তাঁর অনারব্ধ থাকেনি। এ সিদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন প্রতীকের চেয়ে বিশিষ্ট দেহভঙ্গি, ঘনসম্বন্ধ ছন্দবুননের দিকে দৃষ্টি রেখে অঙ্কিত দেহভঙ্গির ভূমিকাই সমধিক কার্যকরী।

পাঁচ

মালাজপরত বিধবাত্রয়ী, একতারাবদ্যরত বাউলপঞ্চক, প্রীতিভোজমত্ত একটি দল, নমাজরত মুসলমান ও মন্দিরগামী নারী, শিশুপরিবৃত জননী ও জমকালো কুলপতিদের ছবিগুলি এমন এক চিরন্তন বাঙলাদেশকে প্রতিবিম্বিত করে, ব্রিটিশরাজ যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। উপরন্তু তাদের মধ্যে দিয়ে যে শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি যে আর্তসুখান্বেষা বিবেচিত, সে প্রমাণ মেলে দেহ-রেখার অমন কঠোর গাম্ভীর্যে, নীল, হলুদ এবং নীলাভলোহিতের অমন আড়ম্বরহীনতায়। অথচ আশ্চর্য, নিয়মে তারা অকৃপণ, এমন একটা প্রাচুর্যের চিহ্নবহ, যা শিল্পীর অভিপ্রেত ছিল না এবং দেহভঙ্গির নিঃসংশয় প্রাধান্য সত্ত্বেও সেখানে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমস্ত প্রকাশব্যাপারটা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে দৃষ্টিবিক্ষেপ ঘটায় এবং রূপগত ঐক্য ক্ষুন্ন করে এ প্রশ্নের অবকাশ আনে যে, প্রতিকৃতি হিসাবে ছবিগুলির ন্যূনতা শিল্পীর অক্ষমতাজাত কিনা। সুতরাং অধিকতর সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা গেল না এই কারণে যে, যদি শুধু দেহভঙ্গিই গঠনহীন বস্তুকে জীবন লক্ষণে সম্পন্ন করে তুলতে না পারে, তাহলে তার জাতিরূপ নির্দেশে কিংবা তার ইতিহাসকে ধরে সে-কাজ সম্ভব কিনা সে পরীক্ষাও করা উচিত; এই পর্যায়েও যামিনী রায়, ইতিপূর্বের অন্যান্য উদ্দেশ্যসাধনের সমতুল সিদ্ধি অর্জন করলেন।

একটি সবুজ উপবৃত্ত ত্রিকোণাকারে স্থাপিত তিনটি সাদা ডিম্বাকার-সহ লোহিতবর্ণের ওপর আভাসিত অবস্থায় অসহায় অন্ধত্বের সমস্ত কারুণ্য ফোটায় অথচ প্রায় একই বর্ণবিন্যাস অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে রাখা হলে শক্তিমান মধ্য-বয়স্কের গর্ব ও পূর্ণতা নিয়ে হাজির হয়। সামান্য একটু বিচিত্রিত লালের কাজ শুধু ভ্রূ ও নাসারেখারটানে স্পষ্টতই কৃষকের আকোমর ঊর্ধ্বদেহের রূপ নেয় কিন্তু লাল হলুদ ও সমভাবে বিচিত্রিত সাদার বিন্যাস এক উৎকট ছলনাময়ী হয়ে ওঠে। এগুলি বিমূর্তিকরণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিমূর্তিকরণে বাস্তব ভিত্তিটার বিস্মরণ ঘটে না বলে আধুনিক সেমাজিওলজিস্টদের সমালোচনার আওতায় পড়ে না। উক্ত বিশারদমহল য়োরোপে প্রচলিত বিমূর্তিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয়াধিক্যে সকলপ্রকার সংজ্ঞাবর্জনে বিশ্বাসী। যদিও নিঃসন্দেহে বিমূর্তিকরণের উদ্দেশ্য উপমা থেকে বিস্তৃততর উপমার দিকে ক্রমাগত চলে

যাওয়া। ভারতীয় ঐতিহ্যে এমন অস্পষ্টতার চর্চা চিরকালই অমান্য, বরং বিপরীত চিন্তায় সে ঐতিহ্য বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংবেদনার মাধ্যমে যেভাবে আসে, তাতে তীক্ষ্নতায় ন্যূন বলে জেনে দ্ব্যর্থহীন রূপগ্রহণে অপারগ বলে মেনেছে, যে রূপগ্রহণ নির্ধারিত সীমায় প্রয়াসমূলক মননচর্চার পুরস্কার হিসাবেই লভ্য। সুতরাং বিশিষ্ট গুণের বিগ্রহস্বরূপ কোনো দেবতার নির্ধারিত মূর্তি মানবমূর্তির চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ততা পেয়েছে, যেহেতু মানুষ, তার সংখ্যাতীত চারিত্রলক্ষণসহ কদাচিৎ ধ্যানরাজ্যে স্থিতিলাভ করে এবং সম্ভবত এবম্বিধ কারণেই যামিনী রায়ের এসব ছবি চিত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেও অমন তীব্রভাবে নাটকীয়, মানবিকতায় ধনী এবং চরিত্রের প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অমন সূচিমুখ।

প্রায় একই সঙ্গে তিনি প্রতিকৃতি অংকনের এক নতুন টেকনিকের চর্চা করছিলেন। বস্তুত রেখা ও ঘনত্বের মধ্যে বিশুদ্ধ রূপগত সম্বন্ধ নিয়ে যখন তাঁর চিন্তাজগত আক্রান্ত, তখনও প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি তিনি একেবারে ত্যাগ করেন নি। কিন্তু তিনি সম্ভবত ভ্রান্তিবশেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, অতিক্রম করে যাওয়া দূরের কথা, য়োরোপীয় কীর্তিমান শিল্পীদের তাঁদের স্বক্ষেত্রে সমকক্ষ হওয়াও তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। সেজন্য তিনি চিরকালই নিজের বাস্তবানুগ শিল্পচর্চাকে অন্তিম লক্ষ্য বিমূর্তিকরণের ভিত্তি হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর এ ধারণা যে আত্মমূল্য বিবেচনায় নিতান্ত অতিবিনয়ের ফল, তার প্রমাণ মিলত তাঁর প্রদর্শিত প্রতিটি চিত্রে। সেগুলির বিষয় যাই হোক না কেন, নিরুম পূর্বাহ্নে রবিবাসরীয় উজ্জ্বল পোষাকে চার্চগামী দুই প্রাদেশিক কর্ত্রী থেকে শরতের বর্ণময় আকাশতলায় চঞ্চল শিশুর সঙ্গে সোহাগরত কোন আদিবাসী নারী পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছবিই ড্রইংয়ের দক্ষতায়, বর্ণদৃষ্টির সুস্থিরতায়, স্থান ও শূন্যতার রূপাংকনে এমন একজন জাতশিল্পীর হাতের ছাপ বহন করত যিনি যে কোন দেশেই গৌরবের বস্তু হিসাবে সমাদৃত হতেন। পরন্তু ছবিগুলি তাঁর নিজস্ব মিতাচার ও কম্পোজিশানবোধের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত ছিল না।

এতৎসত্ত্বেও, কোনো অর্থেই ছবিগুলিকে প্রতিকৃতি বলা চলে না এবং এ-পরীক্ষা তখনও বাকি যে পুঙ্খানুপুঙ্খতা বর্জন করেও সাদৃশ্য অর্জন সম্ভব কি-না। সে অর্জন যে সম্ভব, তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে তাঁরই সবুজ ও কমলারঙের পটে গাঢ় পিঙ্গল, সাদা ও কালোয় অঙ্কিত মধ্যবয়সী বাঙালিনীর ছবিতে। বহুপূর্বে অঙ্গীকৃত চৈনিক পদ্ধতির সামান্য প্রসারিত প্রয়োগ তাঁকে জীবন্তসাদৃশ্য অর্জনে বিশেষ সহায়তা করেছে। কারণ এখানেও তিনি আলোছায়া বা বর্ণের স্তরভেদ রাখেন নি, পিগমেন্টের খাঁটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তলভেদ দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য পিগমেন্টের সে পরিবর্তন বর্ণের স্বরৈক্যে বিঘ্ন আনে নি এবং যেমন তিনি তাঁর চরম বিমূর্ত ছবিতেও দর্শকের কল্পনামুক্তির প্রয়াসে বিশেষ যত্নবান, তেমনি চিত্রধর্মের বিন্দুমাত্র রদবদল না ঘটিয়েও তিনি একটি উপবিষ্ট

মনুষ্যদেহে প্যারানোইয়া বা বিরাটত্বের আভাস আনেন নীলাপ্লুত স্কন্ধের দৃঢ়তায় যা একই সঙ্গে মুসোলিনি ও মদিল্লিয়ানির স্মৃতিরেশবহ। কিন্তু এসব সফল চিত্রাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হলুদ প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত একটি কালোমাথার ছবি, যেখানে শারীরস্থান এবং ডিজাইন এমনভাবে সম্বন্ধ যে ছবির প্রতিনিধিমূলক চরিত্র প্যাটার্নের বিরুদ্ধাচরণ করে না, যে প্যাটার্ন কিউবিষ্টিক হয়েও শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পোষক।

অবশ্য এই ঘন আকৃতির চর্চাও যামিনী রায়ের মানসিকতার নতুন ব্যত্যয় বলে মনে করার কারণ নেই এবং আমি পূর্বেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি যে, এমনকি তাঁর বিশুদ্ধ রেখাচর্চার যুগেও দেহরেখা তাঁর কাছে ফর্মাল উপরিতলের সীমারেখা হিসাবেই গণ্য হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও এতকাল এই উপরিতলের প্রতি দৃষ্টিটা ছিল বহুমুখী, বাইরে থেকেই শুরু করে সে দৃষ্টি ক্রমে অন্তর্মুখী হয়ে নাক মুখের মত মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হত। কিন্তু যেখানে দৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য নাকমুখের মত উপাদানের অভাব ঘটত, যেমন পুরুষ-শরীরের নিম্নভাগে, সেখানে আবার বহির্মুখী প্রবণতাই প্রবল হত। বিষয়ের চারিত্র্য যাতে ক্ষুন্ন না হয়, সে-বিষয়ে অবশ্য তিনি সজাগ থাকতেন, কিন্তু বিষয়টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এ দৃষ্টিতে সম্ভব ছিল না। এখন আকস্মিক-ভাবে প্রতিকৃতির প্রয়োজন মেটাতে সে ব্যবহারের অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করে তিনি
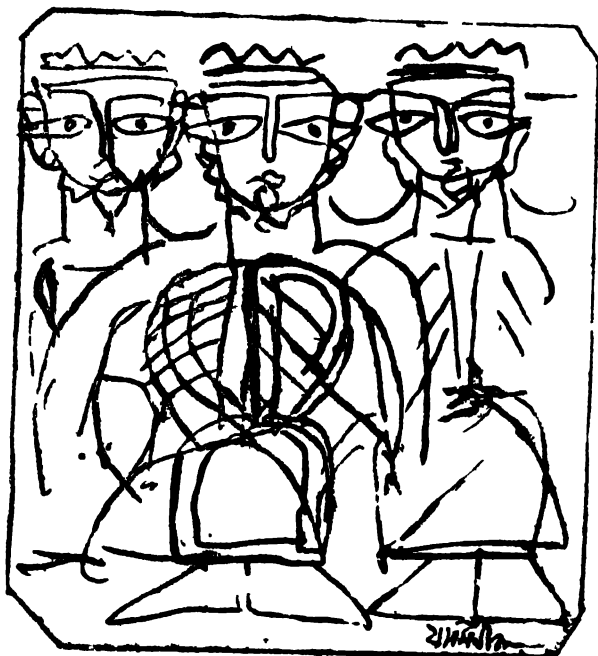
মনুষ্যরূপ সৃষ্টিতে ভিতর থেকে ক্রমাগত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তনের পারস্পরিক সম্বন্ধপাতের মধ্যদিয়ে বাইরের দিকে আসতে লাগলেন। তাছাড়া, ইতিমধ্যে রেখার ওপর তাঁর অধিকার এমনই বেড়েছে যে এই যান্ত্রিক মাধ্যম নিয়ে কাজ করার সময় নিজেকে আর সৃষ্টিশীল মনে হয় না। ছবি-আঁকা ছেড়ে দিতে না চাইলে বা তাকে অর্থোপার্জনের নিমিত্তমাত্র না মানলে নতুন পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ ছিল অনিবার্য। অর্থোপার্জনের কথা এজন্যই উঠল, কারণ ইদানীংকার অর্ধবাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনীগুলিতে সামান্য হলেও আর্থিক লাভ কিছু হচ্ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন বলেই তাঁর কাছে তিনটি অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি, যথাক্রমে একটি কৃষক, এক বাউল এবং প্রার্থনা নামক ছবি পাওয়া গেল, যেখানে দেহভঙ্গিও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হয়েছে, যেহেতু সে মানবদেহের জাতিরূপ নির্দেশে এবং তাদের মধ্যে নাটকীয় তীব্রতা আনার পক্ষে শুধু আদল ও উপরিতলের পুনর্বিন্যাসই যথেষ্ট বলে বুঝেছেন।

ছয়

ভাষান্তরে বললে দাঁড়ায় যামিনী রায় কখনই কোন বিশেষ রীতির দাসত্ব মানেন নি। এবং পূর্বসূরীদের পদ্ধতিতে ছবি-আঁকার যত ইচ্ছাই তাঁর থাক না কেন, সে-ইচ্ছার সচেতনতাই যামিনী রায়কে তাঁদের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে দেয় নি। কারণ তাঁদের কাছে স্বাভাবিক এবং সুলভ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশটাই

সর্বাগ্রগণ্য, সেক্ষেত্রে যামিনী রায় এমন একটা টেকনিকের অঙ্গীকার চেয়েছিলেন, যেটা আপন বলিষ্ঠ যাথাথ্যে ভাব-জ্ঞাপক চরিত্র ত্যাগ করে ভাবসম্মিলনে অধিকতর নির্ভরশীল, যেখানে অপ্রাকৃতের অনুধ্যান অবান্তর। অন্যভাবে বলা চলে যে যামিনী রায়ের শিল্পজীবনে প্রায়শই এমন সময় এসেছে, যখন মনে হয়েছে যে তাঁর মধ্যে শিল্পীসত্তার চেয়ে অনুসন্ধিৎসু প্রবণতাটাই প্রবল। তাঁর সর্বাধিক অনুকৃতিপ্রবণ পর্যায়েও তিনি মানের চেয়ে অধিক অনুকারী নন, যিনি অলিম্পিয়ার মোটিভ সন্ধানে তিশানের ভেনাসে ফিরে তাকান। ঘটনাক্রমে, এমন সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিকর যে যামিনী রায় আমাদের লোকশিল্পীকুলের শেষপ্রদীপ ; যদিচ তাঁদের কাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ থেকে আমি মাতিসেই তাঁদের তুলনা খুঁজি, তাঁদের শিল্প প্রেরণার বিশুদ্ধি মাতিসের সমধর্মী নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে বিশুদ্ধি পিকাসোর ক্ষেত্রে বুদ্ধির সাহচর্যে অধিকতর পরিমার্জনা পায় এবং বর্তমান শিল্পীকুলের মধ্যে যামিনী রায়ের সঙ্গেই সে-শিল্পীর আত্মীয়তা সমধিক।

যে কোনো অবস্থাতেই অনুসন্ধিৎসু পরীক্ষায় যামিনী রায়ের আগ্রহ সমান দুর্দম এবং একটি বিষয়কে নির্বাচিত করার পর তিনিও সেটাকে ভেঙে, দুমড়ে বিবিধ সংস্কার ঘটিয়ে একটির পর একটি পুনরাবৃত্ত রূপান্তরের পথে কয়েক মাসের মধ্যে যেন একটা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শেষ করেন। কিন্তু এসব সাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয়ের আত্মীয়তা এর বেশি টেনে যাওয়া সঙ্গত নয়। এবং সংখ্যাধিক সাদৃশ্য সন্ধান ব্যতীত যদি সমালোচনার উদ্দেশ্য রসাতলে যায় বলে ধারণা জন্মে থাকে, তাহলে টি এস. এলিয়টের একটি উক্তির শরণ নিয়ে আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে হয় যে, আমি যামিনী রায়কে একজন মহৎ শিল্পী বিবেচনা করি বলেই তিনি আমার মনে যে সংখ্যক পূর্বসূরীর স্মৃতি জাগান, তাঁদের তালিকা দীর্ঘতায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে। তবু রুয়াল্টের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য অবশ্য উল্লেখ্য, আর প্রায়শই তিনি দেরায়াঁর স্মৃতিরেশ আনেন এবং জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যেভাবে তেলরঙ ও তুলির ব্যবহার করেন এবং যে ধরনের পুরুষ মুখ চিরকালই তাঁকে টেনেছে, তাতে ভান গখের সঙ্গে তার কোথায় একটা মিল পাই, যদিও উভয়ের কল্পদৃষ্টির পার্থক্যটা মৌলিক। কিন্তু স্মরণীয় যে, এসব সাধর্ম্য আপতিক মাত্র, বিধেয়ের চেয়ে উদ্দেশ্যগত সমতাই এ সাধর্ম্যের জনক এবং যামিনী রায় এমন একটা সহরের অধিবাসী, যেখানে সমকালীন য়োরপীয় শিল্পের সামান্যসংখ্যক নিদর্শনের দেখা মিলত শুধু তাই নয়, পরন্তু যে কোনো য়োরপীয় ভাষায় তাঁর অজ্ঞতা এতই বিপুল যে, আধুনিক পশ্চিমী কোনো শিল্পমতবাদের সঙ্গে নির্বিচার পরিচিতিটুকুও তাঁর পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব।

যামিনী রায়কে কোনো শিল্পীকুলের সম্ভাব্য শরিক হিসাবে চিহ্নিত না করে ব্যক্তিগত মন্তব্যে এই নিবন্ধ শেষ করব। সে মন্তব্যে তাঁর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগের বিস্তারিত আলোচনাই লক্ষ্য হবে। তাঁর সংগ্রামী জীবনের নিরন্তর বিকাশময়তা সত্ত্বেও এখনও তিনি সেই আভিজাত্যের প্রাচীরে বন্ধ, যে প্রাচীর এখনও তাঁকে সমকালীন আবহ থেকে সরিয়ে রাখে এবং আমার বিবেচনায় এ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, এ বিযুক্তি তিনি বেছে নেন নি, বরং পশ্চাৎমুখী দৃষ্টির আন্তর প্রবণতা থেকেই এর জন্ম—নব্য হিন্দুবাদের স্বপ্নপুষ্ট গান্ধীবাদে যে প্রবণতা স্বপ্রকাশ। ছবির বিষয় নির্বাচনে এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব সর্বাধিক কাজ করে বলেই সেইসব বিষয়ে তাঁর পক্ষপাত, যারা স্বভাবেই ছন্দময়। কিন্তু ইচ্ছার চরম ব্যবহারে উপপ্লবের মধ্যে থেকে শৃঙ্খলাসৃষ্টিতে তিনি নিরুৎসাহ। অন্যথায় নৃত্যরত সাঁওতালদের সাবেকী গাম্ভীর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাদের মত্তাবস্থা ও বিপর্যস্ত জীবনাংশে তাঁর বিরাগ অমন তীব্র হত না। সে কারণেই আদিম কৃষক তাঁর মুগ্ধ বিস্ময়ের বস্তু অথচ শিল্প শ্রমিকদের প্রতি তাঁর অনীহা প্রবল, নমাজরত মুসলমানদের প্রতি কাব্যিক মোহের অভাব ঘটে না অথচ তাদের দাঙ্গার উন্মাদনায় তিনি বিরূপ। এখন তিনি এমন একটা টেকনিকের ঈশ্বর, যার সর্বগ্রাসী স্থিতিস্থাপক চরিত্রে যে কোন প্রসঙ্গের স্বীকরণ সম্ভব, সমবেদনার প্রসার সম্ভব হলে সংগঠিত শ্রমিক মিছিল নিঃসন্দেহে অতিরেকযুক্ত কীর্তনীয়া দলের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক কম ফর্মাল সমস্যা নিয়ে আসত।

সর্বোপরি, বিকাশময়তাই শিল্পীর অপরিহার্য গুণ নয়। বিশেষত ধ্রুপদী যুগে দেখা গেছে, মহৎশিল্পীগণ দীর্ঘ জীবন ব্যাপী সমান গৌরবের সঙ্গে বিরাজ করেছেন এবং যামিনী রায়ের সমস্ত ঐতিহ্যপ্রীতি সত্ত্বেও পরিমার্জনার তাগিদই তাঁকে পর্যায় থেকে পর্যায়ে ছুটিয়েছে, তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, বিষয় নির্বাচন থেকে তাঁর মানসিক স্থৈর্যের যে প্রতীতি জন্মে, প্রকৃতপক্ষে ততখানি স্থৈর্য তাঁর ছিল না। আত্মিক অস্থিরতা নিয়েও শান্তিতে কাজ করে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক অবদমনের, এমন কি অবচেতন অসততারই লক্ষণ। সবকিছু মেনেও নির্দ্বিধায় বলা চলে যে আমাদের মাটিতে সমতলের শান্তি এবং পার্বত্য গাম্ভীর্যের শিকড় যত গভীরে, ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধ নাগরিক অস্থিরতা ঠিক সে-পরিমাণেই শিকড় চালিয়েছে এবং যামিনী রায়ের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেহেতু দেশের সাধারণ্যে আত্মবিসর্জন, তাই যখন দেশের মানুষ তাদের নির্ধারিত গতি-পথে অগ্রসরমান, তখন তাদের দিক থেকে তাঁর মুখ ফেরানো কাঙ্ক্ষিত নয়। তাদের প্রতিনিধিত্ব করার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলার যোগ্যতা আমার চিন্তায় যামিনী রায় ছাড়া আর কারো নেই। এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস

যে, তিনি যদি তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করে যেতে পারেন, তাহলে দেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত নিরাশ হবে না। একথাই সর্বাধিক সত্য যে আমার পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক চরিতার্থ ; আমাদের উভয়ের পশ্চাৎদৃষ্টি একই অতীতে এবং একই ভবিষ্যের সম্মুখীন আমরা উভয়েই।

ভাষান্তর ঃ আশীষ মজুমদার।

জি. ভেঙ্কটচলম

যামিনী রায়

সমস্ত সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে, যামিনী রায়ই একমাত্র শিল্পী যাঁর সঙ্গে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমি কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করিনি, যদিও দু-দশকেরও বেশী সময় যাবৎ আমি তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বাস্তবিকপক্ষে, সুখের কথা—তাঁর আগেকার একটা কাজ আমার কাছে অনেকদিন ছিল, গ্রামবাংলায় ধূসর সবুজে এক কুমারী, হাতে পাত্র—উচ্ছল লাল ফুলের হাসি, সেই গ্রাম্য মেয়ের আঁধার প্রচাপ থেকে। লাজুক, এবং অসহায়, বিস্ময়বিলাসিনী অথচ নিরীহ, যেন মনে হয় এক প্রাকযুবতী বালিকা থাকার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আইরিশ এক বান্ধব তার পড়ল প্রেমে, তাই সে এখন বিপুল সুদূরে পান্না-দ্বীপের প্রবাসী।

সেই ছবিটা ছিল যামিনী রায়ের প্রথম দিকের মেজাজের ছবিগুলোর একটা, (দ্বিতীয় পর্যায়ের, তিনি যা বলতে ভালোবাসতেন) যখন তিনি সহজ সরল চাষীদের ও ছলনাবোধহীন নির্মল গ্রাম্য মানুষদের ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। আমি শিহরিত হয়েছিলাম আমার ছবির একটা অসমাপ্ত স্কেচ দেখে, যেটা এখনো তাঁর কাছেই আছে—তাঁর অন্যান্য আগেকার কাজের সঙ্গে। এই সময়েই তিনি দারিদ্র্য পীড়িত বঙ্গদেশ, ভিখারী, অমল শিশু এবং বেদের ছবি এঁকেছিলেন। নির্বাচিত ও দরিদ্র জীবনে সান্ত্বনার সমবেদনার আশ্রয় খুঁজেছিলেন ওই সমস্ত সৃষ্টিতে। সেই সব ছবির গীতিকাব্যময় মিষ্টতা, যেমন আবেদনময় তেমনই বিশ্বাসযোগ্য কারিগরি কুশলতা।

কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে যামিনী রায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অন্য সব চিত্রকরদের মতই পোর্ট্রেট-পেন্টারের মত জীবন শুরু করেছিলেন, শুধু তফাৎ

এই যে তাঁর পোর্ট্রেটগুলি হুইসলারের মত দর্শনীয় ও তীব্র, সজীব গুণাবলী-সমন্বিত হত। তিনি যে এই আমেরিকান শিল্পীকে সচেতন ভাবে নকল করেছেন তা নয়, চীনের বড় বড় শিল্পীদের নকলনবিশীও নয় তাঁর ছবি, যাদের রেখার সূক্ষ্মতাময় কারুকার্য যামিনী রায়ের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; তাঁর ছবি ছিল নিজের কাছে নিজের আত্মপ্রকাশের সেরা পদ্ধতিটি আবিষ্কার করে নেওয়ার পরীক্ষা। আর তার যৌবনের দিনগুলির এই অস্থিরতা প্রকাশের ভাবভঙ্গির আরও বিচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ পথ খুঁজে পাওয়ার এই আকুলতা, সবরকম কায়দাকানুন নিয়ে সীমাহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর শিল্পবোধের একটা দৃঢ় অঙ্গ, তাঁর চরিত্রের একটা শক্তিমান ধারা।

শিল্পের কোনো তীর্থক্ষেত্রেরই তিনি কোনো পূজারী ছিলেন না, কোনো ঘরানার নকলনবীশ ; কোনো ঐতিহ্যের ধারক, অথবা রীতির—যে ভাবে খুশি তিনি ছবি করেছেন সেইভাবে, যে ধারায় ইচ্ছে হয়েছে। যে ভাবে চেয়েছেন আঁকতে সেই ভাবেই, এবং যে কোনো মাধ্যম দিয়ে। এমন দুঃসাহসিক ভাবে ও স্বাধীন ভাবে তিনি তেলরঙ নিয়ন্ত্রন করেছেন, যেমন তিনি এখন করেন টেম্পেরায়। যখনই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, বিজ্ঞানসমত সমতা ও বাস্তব-সম্মত পারিপার্শ্বিকতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি, ঠিক যেমন পরিশোধিত করেছেন, খেলা করেছেন প্রাচীন রীতির সঙ্গে ; যখনই নিজের কল্পনাশক্তিকে মুক্তি দেবার দরকার হয়েছে—নবীন, নতুন বিষয়কে ছুঁতে অথবা ব্যাখ্যা করতে। এবং আমার মনে হয়, সুন্দর ব্যাপার এইটে যে তিনি এ সমস্তই করেছেন নিজের ওপর তত্ত্বের বোঝা না চাপিয়ে।

শিল্পী হিসেবে তাঁর বিবর্তন অনেক বিস্ময়কর ধাঁধার সৃষ্টি করে। বিনম্র পরিস্থিতিতে তাঁর জন্ম, বিস্তৃত যোগাযোগের কোনো সুযোগই তাঁর ছিল না, আগ্রহও যে ছিল তা নয় ; নিজের বলতে যামিনী রায়ের ছিল শুধু তাঁর ছোট্ট দুনিয়া ; যা তাঁর জীবন ও শিল্পকে অনুপ্রাণিত করেছে। ব্যাপক কোনো ভ্রমন তিনি করেননি, বিদগ্ধ কোনো পড়ুয়া মানুষও ছিলেন না তিনি পৃথিবীর মাংসাশী কোনো আধারের দিকে তাঁর ছিল না ছুটে যাওয়া ; অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কারণে ; খ্যাতি বা প্রতিপত্তি খুঁজে পাবার চেষ্টায় ; স্বতস্ফূর্ত ভাবেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সহজ সরল গৃহবাসীর এক ভূমিকা স্বাভাবিক, অনভিজাত এক জীবনে যা তাঁকে ঘিরে থাকলে সবসময়, তিনি খুঁজে পেতেন তাঁর আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। কলকাতার যে জনবহুল অংশে তিনি থাকতেন, সেই সময়কার জীবন তাঁকে দিয়েছে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং রঙের সমৃদ্ধি ও সপ্রাণতা, যা তাঁর শিল্পের জন্য প্রয়োজন। নিজের ঘরের ফাঁকা মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে, দরকারী তুলিটুকু শুধু নিয়ে, রঙ, কাগজ বা ক্যানভাস, টুকরো কাপড়—যেটুকু ছবির জন্য দরকারী, তিনি উৎপন্ন করে গেছেন অবিরত—তাঁর

শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলি, ছোট কিংবা বড়, ম্যুরাল কিংবা মিনিয়েচার, পোট্রেট কিংবা পট।

এটা ঠিকই যে চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা তাঁকে খুব সামান্যই প্রভাবিত করেছিল, ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্টে শেখা ইউরোপীয় পদ্ধতির চেয়ে অল্প বেশী পরিমানে, সম্ভবতঃ। এই দুই ধারার বিরুদ্ধে খোলাখুলি প্রতিবাদ ক'রে, একজন নীরব কঠিন ও সমর্পিতমন ছাত্র—তিনি তাঁর মৌলিকত্ব বা ব্যাক্তিত্বের প্রকাশ দেখাননি, অনেকেই যা করেছেন; তিনি তাঁর নিজের পথে শান্তভাবে এগিয়ে গেছেন, একটি ধারায় আদর্শবাদ, অন্য ধারায় বাস্তববাদ সংযুক্ত ক'রে, অন্ধ অনুকারক না হ'য়ে। ভাবলে অবাক হতে হয়, তিনি কোন পথে চলেছেন, কোন্ নির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গিতে পেঁছিবার লক্ষ্যে, যদি তিনি নিজে তা জানতেন। তাঁর শিল্পচর্চার ক্রমোন্নতি পর্যবেক্ষনের পর একথাই মনে হয় যে তিনি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অজানা বা অনভিপ্রেতের দিকে এলোমেলোভাবে এগোচ্ছেন না; বরং অজানিভাবে অবচেতনের মধ্যেকার এক সুনিয়ন্ত্রিত পূর্ণতার দিকে পা বাড়াচ্ছেন।

ছেলেবেলার পুতুল-গড়া কারুকলার স্মৃতি, তার ছন্দ বিশবাসের আকার আর পদ্ধতি নিয়ে, তার কল্পনা প্রবণ নক্সা এবং রঙ—তাঁকে নাড়া দিয়েছে সারাজীবন গভীর এক অন্তঃস্রোতের মত; প্রচলিত শিল্পকলা বা অন্য ধারার রহস্যময় পলায়নবাদের দৃঢ় আকারসর্বস্বতায় যখনই তিনি ক্লান্তি বোধ করেছেন, তখনই শান্তি ও আনন্দের এক স্বর্গ খুঁজে পেয়েছেন তিনি এই বালক বেলার স্মৃতির পৃথিবীতে। কারণ, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যামিনী রায় কেবল তখনই ওই প্রকাশ পদ্ধতির দিকে ফিরে গেছেন যখনই তিনি সাজানো শৌখিন শিল্পকলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, যে শিল্পকলায় তিনি প্রাথমিক ভাবে শিক্ষিত; অথবা প্রাণধারনের জন্য যখনই তাঁর দরকার হয়েছে টাকাপয়সার। পৌনপৌনিক প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার পর তিনি দেখেছেন যে, এই পুরনো বাংলার গ্রাম্য শিল্পকলা, নতুন নক্শায় এবং চমকপ্রদ রঙে—যে ভাবে তিনি চালু করেছেন তাকে, হুকুমমাফিক প্রতিকৃতি আঁকার চেয়ে বা ধনী বদখেয়ালীদের জন্যে সূক্ষ্ম রেখায় স্বপ্নকুমারীদের ছবি এঁকে দেওয়ার চেয়ে—অনেক বেশী ফলপ্রসূ।

তাঁর নিজস্ব প্রতিভা এই গ্রাম্য পদ্ধতিতেই তার সর্বোত্তম বিকাশ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয়; এবং তাঁর রেখা-সম্পর্কে অনুভূতি, তাঁর কারিগরি কুশলতা, তাঁর সুস্পষ্ট কল্পনাশক্তি, তাঁর এইধরনের লোকশিল্প জাতীয় চিত্রকলাকে যথেষ্ট এগিয়ে নিয়ে গেছে, বাংলার এই পটচিত্রের গ্রাম্য সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী তিনিই যে প্রথম আবিষ্কার করেছেন তা নয়। কলকাতার শিল্পপ্রেমিকদের বিস্মিত ও আনন্দিত করেছেন সুনয়নী দেবী, প্রায় বছর পঁচিশেক আগে, এই ধারায় ছবি এঁকে, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টে

প্রদর্শনী করে। কালিঘাটের কাছেই তিনি থাকতেন, পটচিত্রের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন তিনি ; নতুন প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি এই ধারাকে, নতুন মূল্য, শহরের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষজনকে সেইসব ছবি বুঝিয়ে ছেড়েছিলেন তিনি এবং তাঁরা সমাদরও করেছিলেন খুব।

ভারতে এই ধরনের লোকশিক্ষা বেশ সর্বজনীন এবং অনাদিকাল ধরে অনুশীলিত। বৃহদাকার ধর্মীয় কাজ হিসেবে মন্দির গাত্রে এই শিল্পের ফ্রিজ ও ম্যুরাল-জাতীয় ব্যবহার দেখা যায়। সেসব কাজের মধ্যে গল্প বলার একটা প্রত্যক্ষ মেজাজ থাকে। এইসব গ্রাম্য চিত্রকরেরা অধিকাংশই শিক্ষাহীন ও অপরিশীলিত নারী-পুরুষ, উচ্চকিত রঙের ব্যবহার করে ওই ধাতের ছবি এঁকে গেছেন নির্ভুল আবেগ ও উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত দক্ষতা দিয়ে। তাঁদের রেখাঙ্কন ছিল স্বাধীন ও জড়তাহীন ; কোনো বিষয়কে প্রতিফলিত করার ভাষা ছিল সরল ও প্রত্যক্ষ ; অকৃত্রিম, কায়দাবিবর্জিত। তাঁদের অনুভূতি বোধ ছিল সতর্ক, তাঁদের সামনে শিল্পের কোনো বিস্তারিত তত্ত্ব ছিল না। পট কিংবা কাগজের ওপর তারা যা দেখেছেন তার বর্ণনা করতেন না, বর্ণনা করতেন তাই যা ভেবেছেন তাঁরা, কিংবা যা হওয়া উচিত ছিল বলে জেনেছেন।

তারা যেসব দেব দেবীর পূজা করতো, মা কালী কিংবা হনুমান, সে সব দেব দেবীর ছবি আঁকতে চাইলে, তারা তাদের মুখগুলো পুরান কথায় বা ইতিহাসগত তথ্যে কেমন আছে তা না ভেবে ওইসব ঠাকুর দেবতা সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতির কথা ভাবতো বেশী। স্বাভাবিকইভাবেই, যেহেতু দেবতা, তারা ভাবতো তাদের মাথাগুলো বড় বড়ই হবে, বর্ণনা করতে গিয়ে তাই তারা মাথাগুলো বড় বড় করেই আঁকতো ; ছবিতে তাদের স্থান যেখানেই হোক কিংবা তাদের চারপাশে যাই যাক না কেন। এমনকি পাশে হিমালয় থাকলেও তা তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয়, আঁকা হয় ছোট করে, সামনে বা পেছনে যেখানেই থাকুক। প্রাচ্যের শিল্পকলায় এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেখানে মানসিক মাত্রা বস্তুগত পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে থাকে। রঙের বোধ যদিও তাদের সীমাবদ্ধ, বাদামী, কালো, হলদে নীল এবং লাল—তাদের সুপরিকল্পিত রঙের ব্যবহার ছিল কলরবমুখর এবং উজ্জ্বল। যামিনী রায়ের পটচিত্রে এরকমই দেখা যেতো, কেবল পরের দিকের সাম্প্রতিক পটে, বিস্তৃতভাবে রঙ ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছেন, যে কোনো ইম্প্রেসনিস্ট ছবির মতনই বর্ণাঢ্য।

যামিনী রায়ের এই শেষ পর্বের ছবি সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলছেন : ছবির বিষয় যদি তাদের জাত ঠিক করে দিতে পারে, ভারতীয় শিল্পেই তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া যাবে। আরও বলা যায় ছবি একজন শিল্পীকে প্রকাশ করে দেয়, তার মাধ্যমের অধিকর্তা সে, তার চোখ ধ্রুব ক'রে তোলে, মন এবং হাত, যার কাছে রঙপাত্র—যেখানে শুধু লাল, নীল, হলদে,

কালো এবং একটা সামরিক সাদা, তবু স্বপ্নাতীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম, একজন দলছুট শিল্পীর পক্ষেও। একমাত্র সমালোচনা যা করতে পারি আমি তা হল, এইসব শিল্পীরা—যদিও প্রতিভাবান, তবু রেনোয়া বা রাফায়েলের মত বুদ্ধিদীপ্ত হয়েও আবেগপ্রবণ হতে পারে, মূল্যবোধকে বাদ না দিয়েও।" আর একটু এগিয়ে গেলে, বিমূর্ত শিল্পের দিকে, ব্যক্তিগত রঙের বোধ আবিষ্কার করার দিকে, যামিনী রায়ের পরিবর্তন ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে, আলোচনা করার পর মানেতের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন সেই সমালোচক: "অবশ্য রঙও তার পূর্ণ গৌরব নিয়ে ফিরে এসেছিল—গভীর সবুজ ও ভারতীয় লাল, সোনালি হলুদ এবং মায়াময় নীল, উজ্বল বাদামী ও হাতির দাঁতের কালো, এমনকি ঘুঘুপাখির ধূসর আর প্রাচীন গোলাপী,

কিন্তু একে অন্যের ওপর ছায়া ফেলে না কখনোই, বাহ্য পৃথিবীর কোনো প্রাকৃতিক স্বাভাবিক রঙের সঙ্গে ন্যূনতম সংযোগ না রেখেই। তাদের প্রয়োগ করা হয়েছে সমান বিভজনে; ত্রাসের চাপকে সতর্কভাবে বাদ দিয়ে, সবরকম সন্দেহ নিরসন করার উদ্দেশ্যে, কিংবা সম্ভবতঃ বাস্তবতার ছায়াকে ধ্বংস করার কারণে; আর এভাবে নীল গাছ ঝুঁকে থেকেছে ঘন লাল আকাশের গায়ে এবং সবুজ মেয়েরা বসে বা দাঁড়িয়ে থেকেছে স্কালপচারের ভঙ্গিতে; সাদা পাতা এবং কালো ফুলগুলি অনুপস্থিত ঈশ্বরের দিকে অর্পণ করা; অথবা নীল বালক তাঁর ছোট্ট কুঁড়েঘরে দ্বিমাত্রিক খাটিয়ায় বসে ঐশ্বরিক নাচ নেচে যাচ্ছেন—তার হাত-পায়ের উজ্জ্বল লাল, ঘুঘু-ধূসর রঙের দেয়ালের হিমালয় চূড়ার বন্ধ বাদামীকে অভিনন্দন জানাতে জানাতে।"

তাঁর শিল্পকলার আভ্যন্তরীন সমৃদ্ধি ও চূড়ান্ত গুণগুলি এমনই যে, আকার ও বিষয় দু-দিক থেকেই, কেউ তাকে সেজানের সঙ্গে ছবির মধ্যেকার শক্তির বৈচিত্র্যের ব্যাপারে, কেউ তাকে ভ্যান গগের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির গভীরতার কারণে, কেউ পিকাশোর সঙ্গে রেখার প্রত্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে, ডিরেন বা রাউল্টের সঙ্গে স্বাভাবিক আবেদনের কারণে—তুলনা করেছেন। তাঁর শিল্পে হুইসলারিয়ান পর্ব সম্পর্কে এবং মানেটের সঙ্গে রঙের বোধ বিষয়ে তাঁর একাত্মতা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এইসব আধুনিক শিল্পীদের নানারকম ধারনা ও কায়দা তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, যতটা একজনের পক্ষে তার স্টুডিওতে ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব; তবে এ কথার মানে এই নয় যে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নকল করেছেন তাদের কিংবা প্রভাবিত হয়েছেন কোথাও। এটা তাঁর একটা আনন্দ, তাঁর দক্ষতাকে নতুন এবং বিস্ময়কর পদ্ধতিতে কাজে লাগিয়ে দেখা, অনুভব করার আনন্দ, এবং যাকে তাঁরা ঐতিহ্য-বাহী বলেন সেটাকে জানার চেষ্টা। যাই হোক, এটা লক্ষ্য করা খুব আগ্রহজনক ব্যাপার যে তাঁর এই চেষ্টার মধ্যে শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক দিকটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে, যামিনী রায়ের অনেকরকম পর্বের (সতেরোটি পর্ব, তিনি হিসেব করেছেন) মধ্যে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, এই ধাঁধা ও বিস্ময় নির্মান করার জন্য।

পটশিল্পের এই বর্ণবহুল চিত্রন গুলিই তার সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ, যে কাজের তিনি একজন উৎসাহী ছাত্র, তাঁর সংগ্রহও ছিল ভালো। তিনি এত বেশী পট এঁকেছেন যে তার চাহিদা জ্যামিতিক প্রগতিতে বেড়েছে গত শেষ কয়েক বছরে। তিনি তাঁর কাজ প্রদর্শনীর জন্য পাঠাতেন খুব কম, প্রচারও তিনি পছন্দ করতেন না তাঁর শিল্পের।

তাঁর নিজের বাড়ি, উত্তর কলকাতার একটা ছোট্ট সরু গলিতেই, তাঁর স্টুডিও এবং গ্যালারি যেখানে ধেয়ে আসে শিল্প প্রেমিকেরা, প্রশংসা করে তাঁর ছবির। ছোট্ট ঘর থেকে যে সব ছবি তিনি কিংবা তাঁর ছেলে সরিয়ে সরিয়ে রাখেন; কেউ কেউ একটা বা দুটো বা আধডজন ছবি সংগ্রহ করে নেন, কোনো আলোচনা বা দরদস্তুর না করেই। দাম তাদের খুবই কম, বাস্তবিকপক্ষে শস্তাদরেই পাওয়া যেতো সেগুলো যেহেতু তিনি ছিলেন জনপ্রিয়, এবং চাহিদা খুব বেশী। তাঁকে প্রায়ই একই কাজ অনেকবার করতে হত; তিনি তা করেও দিতেন এবং এতে কোনো দোষ খুঁজে পেতেন না।

আমি জানি যে তাঁর বিরুদ্ধে এরকমই করা হত। এই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক কারি-গরি কুশলতার জন্য তাঁকে ভীষণভাবে দোষ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁর মৌলিক চিন্তার কিছু-না-ভেবেই পুনরাবৃত্তি করতেন কেবলমাত্র টাকা ও

জনপ্রিয়তার জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, এই সমালোচনার স্বপক্ষেও কিছু বলার আছে। যতটা ভাবা হয় ব্যাপারটা ততটা দোষনীয় নয়, এবং এই পথের যামিনী রায়ই একমাত্র পথিক নন। তাঁর পূর্বসূরী মহৎ শিল্পীরা যেমন তিসিয়ান, এরকম কাজ আগেও করেছেন।

এবং প্রাচ্য শিল্পে এই ধরনের ব্যাপারগুলো খুবই প্রচলিত, খাঁটি বলে স্বীকৃত, বৈধ বলেও মেনে নেওয়া হয়েছে। কারিগরি কুশলতা ভারতে দোষনীয় কিছু নয়, সমস্ত মহান শিল্পীকেই কুশলী কারিগর হতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে যামিনী রায় একজন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বিষয়ানুগত্য, দক্ষতা, কল্পনাশক্তি, এবং মৌলিকতা সমস্ত মহান শিল্পেরই বৈশিষ্ট্য। সুদক্ষ শিল্পীদের কাজে এই ধরনের গুণাবলী অনেক দেখা যায়।

"আপনার নতুন কাজ কি মি. রায়?" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। ঘরের চারপাশে ছড়ানো রাধা ও কৃষ্ণের ক্ষেত্র, মা ও শিশুর ছবি, বিশেষ ভঙ্গিতে মেয়েরা, বৈষ্ণব সাধু, ম্যাডোনা ও শিশু, লাস্ট সাপার, খুব ঐতিহ্যবিরোধী ভঙ্গিমার যিশু, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ—খুব কায়দা করে আঁকা, তাঁর হাতে ছিল ছোট একটা মাটির কারুকার্যময় পাত্র, তিনি আমাকে সেটা দেখিযে বললেন—এই আমার নবতম এবং শ্রেষ্ঠ।

"কিন্তু ওখান থেকেই তো আপনি শুরু করেছিলেন মি. রায়?" আমি

সপাটে জবাব দিলাম তাঁর উন্নাসিকতায় অভিভূত না হয়ে। "শুরু ও শেষ কি একই কথা নয়?" তিনি দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, মনে মনে ভাবলাম, এই মানুষটিকে তাঁর অনুজ শিল্পীরা যেমন নিরক্ষর যন্ত্রমানব বলে ভাবেন, তিনি কিন্তু তা নন, তিনি ছিলেন সংবেদনশীল, আক্রমনাত্মক স্বাতন্ত্র ছিল তাঁর, আর ছিল আহত গৌরব।

হ্যাঁ, তাঁর আত্মায় প্রবিষ্ট ছিল লৌহশলাকা। বহু বছরের নিরন্তর সংগ্রাম, দেশবাসীর নিষ্ঠুর উদাসীনতা তাঁর হৃদয়কে তিক্ত করে তুলেছিল, এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিষ্ঠুরমনা। তাঁর এখনকার যাবতীয় সাফল্য, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, অর্থ তার হৃদয়ের তিক্ততা কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি। তিনি সবসময় আত্মরক্ষার আবরণের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখতেন, এমন কি, সঠিক প্রশংসাও তাঁর আবরণের বর্ম ভেদ করতে পারতো না। তাঁর সমকালীন শিল্পীদের ও ভ্রাতৃপ্রতিম শিল্পীদের ঈর্ষা ও অবহেলা, তাঁকে আহত ও বিষন্ন করতো। তাঁর সমকালীন শিল্পীরা কেন কেউ খোলাখুলি বা কেউ গোপনে, তাঁর শিল্পকলাকে হেয় প্রতিপন্ন করতো বা ধারাবাহিকভাবে বিরুদ্ধ প্রচার চালাতো। তা তাঁর বোধের অগম্য ছিল।

"আমার পুরনো বন্ধুরা আমার বিপক্ষে চলে গেল কেন? আমি তো তাদের কোনো ক্ষতি করিনি। আমি আমার বাড়ীর বাইরে পর্যন্ত যাইনা, আর বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—আমি, আজ প্রায় দশবছর হল, কোনো শিল্পপ্রদর্শনীতে বা অনুষ্ঠানে যাইনি। অন্যদের ছবির সমালোচনা করার মত চালাক আমি নই, এবং নীতিগতভাবে আমি তা করিও না।" এবং এইভাবে এই ছোট কাজের ঘরটিতে বসে অনবরত সিগারেট খাবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মেলে ধরলেন তাঁর হৃদয়।

শিল্পীদের মধ্যে এই চিরকালীন ঈর্ষাপরায়নতা, এবং নোংরামি, আদৌ আশ্চর্যজনক কিছু নয়। এভাবেই তারা তৈরী।

হঠাৎ যখন একজন শিল্পীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, যখন অল্পেই পাওয়া যায় সাফল্য, যখন পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আসতে থাকে পরিচিতি ও স্বীকৃতি; এমনকী রাজ্যপালের স্ত্রী বড় বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা, আপ্যায়িত না হয়েই শিল্পীর দরজায় আসে যায়, এবং ভীষণভাবে প্রশংসা করতে থাকে তাঁর কাজের; অন্য শিল্পীদের তখন বিদ্বেষ ও অসূয়া বাড়তে বাধ্য। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া তিনি, এইসমস্ত তুচ্ছ অনুভূতি তাঁর মনে ঢেউ তুলতে পারে না, তিনি তাঁর আনন্দময় বর্ণিল সৃষ্টির জগতে সমাহিত ভঙ্গিমায় এগিয়ে যান।

ভাষান্তর: সোমক দাস।
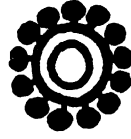
প্রণব রঞ্জন রায়

যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত ড্রইং ও স্কেচ

যামিনী রায় এর প্রয়ানের পর পুত্র অমিয় রায় যামিনীবাবুর কিছু অনবদ্য ছোট ড্রইং আর স্কেচ জনসমক্ষে আনেন। এগুলি সবই সাদাই অথবা সাদাটে কাগজের উপর কাল কালি দিয়ে আঁকা। কয়েকটিতে অবার হালকা জলরঙের বা অস্বচ্ছ রঙের ছোঁয়া দেখা যায়। এসব ড্রইং আর স্কেচের কোনটিতেই পুঞ্জ বা ম্যাস গঠনের কোন চেষ্টা দেখা যায়না। চোখে পড়েনা আলো-ছায়ার বর্ণান্তরমূলক তারতম্য ঘটিয়ে ঘনত্ব বা দূরত্বের মায়া সৃষ্টির প্রয়াস। ফলতঃ প্রতিটি ড্রইং আর স্কেচ অত্যন্ত রেখাভিত্তিক ও রেখামাত্রিক। অর্থাৎ বিশুদ্ধ রেখাঙ্কন। মনে হয় এগুলি মূলত বড় ছবির খসড়া হিসাবে আঁকা হয়েছিল।

মকসো করার মতন করে বা নোট রাখার জন্য চিত্রকর-ভাস্কররা যেসব রেখাঙ্কন করেন অনেক সময়েই সেসব তাঁদের আনুষ্ঠানিক বা প্রদর্শনার্থে করা ছবির চেয়ে বেশী তৃপ্তিকর হয় এমন একটা ধারণা শিল্পীবেত্তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ধারণাটির মধ্যে একটা সহজ সরলীকরণ-ঝোঁক আছে। অনতিসচেতন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও অনুভূতির অভিব্যক্তিমূলক ছবির গুণাগুণ বৃদ্ধির সহায়ক হলেও, তা চিন্তাভাবনাঋদ্ধ ছবির দৃশ্যকল্প মিটানোর পক্ষে বাধাস্বরূপ। তবু, স্বীকার করতেই হয়, উল্লেখিত প্রচলিত ধারণাটি খুব যুক্তিসিদ্ধ না-হলেও তার পিছনে সাধারণ অভিজ্ঞতার একটা সমর্থন রয়েছে। কোন শিল্পী যখন প্রদর্শিত হতে পারে, সংগৃহীত হতে পারে এমন ছবি আঁকেন বা ভাস্কর্য গড়েন তখন তিনি অজ্ঞাতসারে হলেও সম্ভাব্য দর্শকের / সংগ্রাহকের প্রত্যাশার মুখোমুখি হন। যৎকিঞ্চিৎ হলেও সেই সম্ভাব্য প্রত্যাশাকে মূল্য দেন। ফলে সম্ভাব্য দর্শকের কল্পিত প্রত্যাশা তাঁকে সৃষ্টি মুখের উল্লাসে নির্বাধ হতে দেয়না।

একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আঁকা রেখাচিত্র আর খসড়া রেখাঙ্কনে শিল্পী তাঁর নিজস্বতাকে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলতে পারেন তেমনভাবে কোন প্রদর্শনযোগ্য মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পকর্মে পারেননা। যে-সব শিল্পী কল্পিত দর্শকের কল্পিত চাহিদা পূরণ করার দায় নিয়ে শিল্পকর্ম করেননা, যাঁরা দর্শকের চাহিদাকে নিজেদের সৃষ্টিক্ষমতার নিয়ন্ত্রনাধীন বলে মনে করেন তাঁরাও কিন্তু নিজেদের শিল্পকর্ম দিয়ে একধরণের প্রত্যাশা তৈরীকরেন এবং পরবর্তীতে সেই দর্শক প্রত্যাশার ধারণা দিয়ে অল্পবিস্তর চালিত হন। তাঁদের ধারণামত দর্শক প্রত্যাশা অতঃপর তাঁদের নির্বাধ কর্মে লিপ্ত হতে দেয়না। কিন্তু ব্যক্তিগত রেখাঙ্কন বা খসড়া-আঁকা তো এ নিয়মের বাইরের জিনিষ।

যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত রেখাঙ্কন ও খসড়া রেখাচিত্রের বিশ্লেষণ করে আমরা শিল্পতত্ত্বের উপরোক্ত ব্যাপারটাকে একটু যাচাই করে নিতে পারি।

যামিনীবাবুর আনুষ্ঠানিক ছবি গঠনগতভাবে দ্বিমাত্রিক। ছবিতে রঙের কোন বর্ণান্তর থাকেনা, আলো ছায়ার তারতম্য থাকেনা। রঙ সমতলক্ষেত্রের উপর লেপা। চিত্রিত রূপবন্ধ রেখামাত্রিক। সীমা বা সংজ্ঞারেখার পারস্পরিক অবস্থান রূপবন্ধের ঘনত্ব যতটুকু প্রকাশ করে তা ভিন্ন রূপবন্ধগুলি হয় ঘনত্বশূন্য। এমনকি রেখাছন্দের পৌণঃপুনিকতা অনেক সময়েই সীমারেখার ঘনত্ববোধিক শক্তিকে খর্ব করে ছবিকে এক ধরনের আলঙ্কারিকতায় ভূষিত করে। তাছাড়া আমরা যামিনীবাবুর ছবিতে যখন কৃষ্ণ, রাধিকা, গোপিনী, ধেনু, কামধেণু, ঘোড়সওয়ার, দক্ষিণরায়, বেড়াল, চিংড়িমুখে বেড়াল, ম্যাডোনা, যীশু এসব দেখি, তখন তাদের বস্তুপ্রতিভাসগত এবং প্রতিমাগত পার্থক্য সত্বেও, গড়ন ও গঠনগত এক ধরনের সাদৃশ্য আমাদের বলতে থাকে বস্তুর প্রতিভাস হিসাবে নয়, নির্মিত রূপবন্ধ হিসাবেই এরা মূল্যবান। বস্তুর অনুষঙ্গ, প্রতিমার অর্থময়তা, দৃশ্যের বিবরণ, ঘটনার বর্ণনা, প্রতীকী তাৎপর্য কোন কিছুই যামিনীবাবুর অনিবৃষ্ট নয়। যামিনীবাবুর রূপবন্ধের একটা বস্তু প্রাতিভাসিক চেহারা, বিন্যাসের একটা ঘটনাবিবরণী সত্তা থাকা সত্ত্বেও কেন এ ঘটনাটা ঘটে? যামিনীবাবুর ছবির নারী, পুরুষ, পাখি, গাছ, পাতা, কলস, ঘট ইত্যাদির চেহারা অত্যন্ত সাধারনীকৃত, তারা কোন বিশেষের বিবরণ দেয়না। দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিক চেহারার পার্থক্য সত্ত্বেও গড়ন ও গঠনের দিক থেকে তারা এক ও অভিন্ন হবার কারণে তাদের সামগ্রিক চেহারার চেয়ে তাদের গড়ন ও গঠনগত আকার, আকৃতি, আয়তনই মুখ্যত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। সীমারেখা বা সংজ্ঞারেখার চরিত্র, তাদের ছন্দ। সীমারেখাধৃত অঞ্চলের আকৃতি। বিভিন্ন রৈখিক অঞ্চলের রঙ। রেখার পারস্পরিক অবস্থান, পারস্পরিক অবস্থানজনিত ছন্দ। রেখার দ্বারা বিভাজিত চিত্রক্ষেত্রের আকার, আয়তন। রৈখিকসীমায়-ধৃত আয়তনিক আকারের পারস্পরিক বিন্যাস। এসবই যামিনীবাবুর ছবির আসল

ব্যাপার। এসব বিশুদ্ধ রূপতাত্ত্বিক উপাদান মিলে যামিনীবাবুর ছবিতে যে নকশা গড়ে তোলে, সে নকশার বৈভবই যামিনীবাবুর ছবির সম্পদ। বস্তু-সাদৃশ্য, প্রতিমার-আভাস, ঘটনার ভঙ্গি যামিনীবাবুর ছবির গৌন ব্যাপার। শুধু বহিরঙ্গাশ্রয়ী অবলম্বন।

তা'বলে, যামিনীবাবুর ছবি নিছক আলঙ্কারিক নকশা নয়। প্রবন্ধের গড়ন-গঠন, রূপবন্ধের আকার, আয়তনিক বিন্যাস, রঙের বিন্যাস কিছু অনুভব সঞ্চার করে, কিছু অনুষঙ্গের ইঙ্গিত দেয়, কিছু অর্থপূর্ণ তাৎপর্যের ব্যাঞ্জনা বহন করে। তাঁর ছবির সুনির্দিষ্ট ছন্দোবদ্ধ ক্রমান্বয়ী বঙ্কিম রেখা, রূপবন্ধের বর্তুলতা, বিন্যস্ত রূপবন্ধেব আয়তনিক ভারসাম্য বর্ণের উজ্জ্বলতামূল্যের ভারসাম্য ইত্যাদি আমাদের ক্রমশ এক শান্ত সমাহিত পূর্ণতার অনুভব সঞ্চার করে যা একমাত্র রুশো-কল্পিত প্রাকৃত-রাষ্ট্র বা টমাস মুর কল্পিত 'ইউটোপিয়া

অথবা গান্ধীজীর 'রাম রাজ্যোই' সম্ভব। কিন্তু যামিনীবাবুর ছবির এই দিকটি বোধহয় সচেতন চিন্তার ফসল নয়, গ্রামীনজীবন উদ্ভূত পটচিত্রের উত্তরাধিকার। যাহোক, আপাতত সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

নির্মিতির দিক থেকে যামিনীবাবুর আনুষ্ঠানিক বা প্রদর্শনার্থ বা বিক্রয়যোগ্য ছবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত খসড়া রেখাচিত্রের পার্থক্য খুবই কম। চিত্রক্ষেত্রের চরিত্রভাবনা ও জমির ব্যবহার,-ছবিতে রেখার ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা ও রেখার ব্যবহার, রূপবন্ধের ও রূপবন্ধাংশের আকার ও আকারগত পারস্পরিক সম্বন্ধ, রূপবন্ধের চেহারার সঙ্গে জাগতিক বস্তু ও প্রতিমার সম্পর্ক ইত্যাদি বিচারে যামিনীবাবুর ছবি আর স্কেচ একই গোত্রের। অর্থাৎ তারা একই নান্দনিক ভাবনার ফসল। কিন্তু বিশদে তাদের তফাৎ কম নয়। রেখা অংকন-ক্রিয়ার ভিন্নতার কারণে যামিনীবাবুর এসব স্কেচের ছবির চরিত্র রেখার চরিত্র থেকে আলাদা। রেখা চরিত্রের ভিন্নতার কারণে সংজ্ঞারেখার দ্বারা চিহ্নিত আকারের চেহারা আলাদা। সমতল চিত্রক্ষেত্রে বিন্যস্ত হলেও স্কেচের রূপবন্ধগুলি ছবির মতন নিয়মিতভাবে একই আনুভূমিক চিত্রক্ষেত্রে ন্যস্ত হয়না। ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ছবির মতন অতটা আলংকারিক হয়না এসবের ফলে যামিনীবাবুর আনুষ্ঠানিক বা প্রদর্শনার্থ ছবির সঙ্গে ব্যক্তিগত রেখাচিত্র বা খসড়া রেখাংকনের পার্থক্যটা বেশ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

সাদা জমির উপরে কালো রেখার টানে আঁকা এসব স্কেচের রেখা কোন আয়তনিক পুঞ্জকে বেড় দিয়ে আকারে পরিণত করে না। অর্থাৎ এসব স্কেচের রেখা আকারের সীমাকে চিহ্নিত করলেও যামিনীবাবুর ছবির সীমা রেখা যেমন করে আকারকে সংজ্ঞায়িত করে, স্কেচের সীমারেখা তা করেনা। স্কেচের রেখা আকারের বোধকে সংকেতচিহ্নে ধরে রূপবন্ধের আভাসকে প্রতিষ্ঠা করে। স্কেচের রেখা ছবির রেখার মতন রূপবন্ধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। স্কেচের রেখা আদিতেও মুক্ত। অন্তেও মুক্ত। বোধ তার অঙ্গে যুক্ত। যামিনীবাবুর ছবির রেখা

কিন্তু মুক্ত নয়। যামিনীবাবুর ছবির রেখা সযত্নে গড়া শ্লথ গতিসম্পন্ন নির্দিষ্ট মাপের ছন্দোবদ্ধ রেখা। কিন্তু ড্রইং আর স্কেচের রেখা দ্রুত হাতে টানা, অনির্দিষ্ট মাপের মুক্তছন্দ রেখা। যদিও এসব রেখা অত্যন্ত সুচারুভাবে চিত্রক্ষেত্র বিভাজন করে, তবুও দেখে যেন মনে হয় এসব রেখার টান যেন মেপে দেওয়া হয়নি। রেখার টান অত্যন্ত সাবলীল কিন্তু ছবির রেখার মতন অহেতুক লীলায়িত নয়। এসব রেখা সচ্ছন্দ কিন্তু ছবির রেখার মতন ছন্দোবদ্ধ নয়। যামিনীবাবুর ব্যক্তিগত ড্রইং আর স্কেচের রেখার চরিত্র অনেকটাই যেন আপাতিক ও লঘু। তার ফলে এবম্বিধ রেখারদ্বারা চিহ্নিত আকার, রূপবন্ধাংশ, রূপবন্ধ, রূপবন্ধাংশের সমাহার বা রূপবন্ধের সমহারের চেহারায় আসে এক-ধরণের চলিষ্ণুতা যা যামিনীবাবুর প্রাতিষ্ঠানিক ছবিতে দুর্লক্ষ্য। কখনও সখনও মুক্ত-অন্ত কোন একটি রেখার অন্তভাগ তির্যকভাবে দিক নির্দেশ করে রূপবন্ধকে গতিময়তা দান করে। যামিনীবাবুর আনুষ্ঠানিক ছবিতে জীব-দেহের বিম্ব যা দেখি তা প্রায় সব সময়েই স্থানু বা জঙ্গম। এমন কি তাঁর বিভঙ্গ দেহও রূপায়নজনিত কারণে স্থানু বলেই মনে হয়। শুধুমাত্র রেখার চারিত্রিক ভিন্নতার কারণে যামিনীবাবুর এই স্কেচগুলিতে অঙ্কিত ভঙ্গিমায় জীবদেহের বিম্ব অদ্ভুত গতিময়তা লাভ করে।

যামিনীবাবুর আনুষ্ঠানিক ছবির সঙ্গে তাঁর ব্যাক্তিগত স্কেচের দৃশ্যগত চরিত্র ও তাদের তফাৎগুলির পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু এ-তফাতের তাৎপর্য কি? আনুষ্ঠানিক ছবি হোক বা স্কেচই হোক যামিনীবাবুর ছবির প্রাথমিক

দৃশ্য-অবলম্বন গ্রাম-বাংলার লৌকিক জীবন। পুরাণ, কিম্বদন্তি ইতিহাস যা কিছুই তাঁর ছবির প্রাথমিক দৃশ্য অবলম্ব হোক না কেন, চরিত্র পরিবেশ সব চেহারার আদর্শই গ্রাম-বাংলার লৌকিক জীবন থেকে পাওয়া। আর গ্রাম-বাংলার পটচরিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির শৈলীগত সাদৃশ্যও অন্যভাবে আবার সেই গ্রাম-বাংলার লৌকিক জীবনের অনুষঙ্গ বয়ে আনে। কিন্তু ছবি নির্মাণের উপাদান গুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপর, গড়ন গঠনের উপর আর নকসার আলংকারিকতার উপর জোর আর ঝোঁক যামিনীবাবুর ছবির প্রাতিভাসিক সত্তাকে গৌণ করে দেয়। প্রতিভাত জগৎ শুধুমাত্র দৃশ্য-অবলম্ব হিসাবেই ছবিতে উপস্থিত হয়।

অন্যনিরপেক্ষ স্বনির্ভর বিশুদ্ধ শিল্প তখনই মহত্ত্বের দাবীদার হয়, যখন শিল্পবস্তুর শরীর কোন অমূর্ত আবেগ বা অনুভবকে ব্যক্ত করে অথবা কোন বিমূর্ত ধ্যান-ধারণার ইঙ্গিতবাহী হয়। পক্ষান্তরে, দৃশ্যজাগতিক বস্তুর আলংকারিক রূপায়ণ, তা যতই চাতুর্যপূর্ণ হোক-না-কেন, একান্তভাবেই সব প্রতীকীসম্ভাবাবিনাশী। যামিনীবাবুর ছবির অলংকার-প্রবণতা বিশুদ্ধ স্বনির্ভর শিল্পের শর্ত পূরণ করলেও তাই মহত্ত্বের পরিপন্থী।

কিন্তু যামিনীবাবুর ব্যক্তিগত স্কেচগুলি বোধ হয় মহৎ শিল্পের সীমা ছোঁয়। এই সব স্কেচে আমরা গ্রাম-বাংলার লোকজীবনের যে টুকরো টুকরো সংকেত-চিহ্ন দেখি সেসব শুধুমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পীত সত্য নয়। এই সব স্কেচের সচল রেখা, সজীব আকার, ইতস্ততঃ বিন্যাস, রূপবন্ধের চেহারা সংকেত একদিকে যেমন আহত লৌকিক জীবনের অসম্পূর্ণতা, অসংলগ্নতা, বিচ্ছিন্নতাকেই রূপ দেয়, অন্য দিকে আবার তেমনই বস্তুসত্তার বিস্বায়নের মধ্য দিয়ে, রেখা আকার আর রূপবন্ধ বিন্যাসের চারুতার মধ্য দিয়ে যামিনীবাবু গ্রামীণ এমন এক নান্দনিক উত্তরণের ইঙ্গিত দেন, যা তাঁর সম্পূর্ণ ছবিতে আমরা কদাচিৎ পাই। তখন মনে হয় এই অসম্পূর্ণ কলাকৈবল্যবাদীর মধ্যে যে ক্রান্তদর্শী সুপ্ত ছিলেন খ্যাতি তা জাগ্রত হতে দেয়নি। এটা আমাদের বড় ক্ষতি।
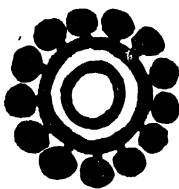
বিষ্ণু দে

বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি

ছবির সার্থকতা মূলত তার দ্রষ্টব্যতায়, ছবির পরোক্ষ আলোচনা গৌণ তো বটেই, এমনকি শিল্পীর চিত্রাবলী বেশ কিছু দেখার পরেই তার যৎসামান্য কম-বেশী সার্থকতা। কারণ দৃশ্যবস্তুর তুলনায় কথা একদিকে জটিল অন্যদিকে অনেক বেশী অনির্দিষ্ট, পিচ্ছিল। আমাদের চোখের অভিজ্ঞতা সচরাচর প্রত্যক্ষে স্পষ্ট হয়, কারো কারো অবশ্য তাও হয় না। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম এতই চাক্ষুষ শুদ্ধিতে ও প্রত্যক্ষতায় স্পষ্ট এবং অধিকন্তু অক্লান্ত প্রেরণার পর্বে পর্বে এতই বহুধাবিচিত্র যে কলমের কথায়, বিশেষ করে কয়েক পৃষ্ঠায় তার পরিচয় দেওয়া যায় না। তবু বিষয় মর্যাদার অনুরূপ লেখার যোগ্যতা না থাকলেও যামিনী রায়ের শিল্পসাধনার ঐশ্বর্য-বিষয়ে লেখার সুযোগ সর্বদাই আনন্দকর।

যামিনী রায়ের চিত্রের চিত্রধর্মনির্দিষ্ট শুদ্ধতাই বোধহয় তাঁর চিত্রসাধনার সবচেয়ে বড় কথা। আর তাঁর কাজের অবিশ্রাম বৈচিত্র-বিস্তার। তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফূর্তি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে দৈনিক একনিষ্ঠ কর্মব্রতে প্রকাশ পেয়েছে, ক্রমান্বয়ে এবং কখনো কম কখনো বেশী আর্তির যন্ত্রণাময় স্বপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে।

যামিনীবাবুর জন্ম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, বোধহয় ১১ই এপ্রিল, বাংলার পশ্চিমভাগে আমাদের লৌকিক ও সামন্ত-সংস্কৃতির দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে। বেলেতোড়ের রায়েদের পূর্বপুরুষেরা যশোরের প্রতাপাদিত্যের আত্মীয়-পরিবার থেকে মল্লভূমিতে চলে আসেন এবং প্রথমে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে আশ্রয়ানুকূল্য পান, তারপর রাজকীয় ব্যাপারের

অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে বেলেতোড়ে জাগির বাছাই করেন।

যামিনীবাবুর পিতা নিশ্চয়ই তাঁর মানসলোকে একটি বড় প্রভাব। সেকালের শিক্ষিত বাবু-সমাজের মধ্যে থেকেও তাঁর জীবনদর্শন অসামান্য ছিল। আমাদের ইংরেজিযুগের আধাসভ্য বা বিকৃত শহরের জীবনযাত্রা এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রণালী বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তার কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে। অবশ্য একালের বিজ্ঞানেই বা সমাজ-পরিকল্পনার কর্মকাণ্ডেই এই স্বয়ং সম্পূর্ণ সরল, কিন্তু সংহত, জীবনের তত্ত্ব বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে, যেমন হয় তলস্তয়ের ধ্যানধারণা বা গান্ধীজির এবং বৃহৎ আধুনিক মননে রবীন্দ্রনাথের। শিক্ষার কথাই ধরা যাক, যামিনী রায়ের পিতা নিজে ইংরেজি ভালই জানতেন, বাংলা সংস্কৃতির প্রাগ্রসর মানসলোক তাঁর চেনা ছিল, ব্রহ্মসংগীত তিনি নিজে করতেন, তবু যেদেশে শতকরা পঁচানব্বই জন গ্রামীন, সে দুঃস্থ দেশে পরদেশী শাসনের বিকলাঙ্গ শহরে তিনি নড়বড়ে আত্মস্থতার গলিপথ খোঁজেননি, তিনি মুখে এবং কাজেও বলতেন আমাদের শিক্ষা সার্থকতা পাবে এক হাতে বই আরেক হাতে লাঙলের সমন্বয়ে।

যামিনী রায়ের জীবনদর্শনে তাঁর এই শৈশবের অভিজ্ঞতা ও তাঁর পিতার ভাববীজের অগোচর প্রভাব। তিনি নিজেই বলেন যে, আজ তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেন ; কারণ শৈশবে মানুষ খেলে বেড়ায়, মানুষের যৌবন যায় আশা, আকাঙ্ক্ষায় আবেগের অস্থিরতায়, পরিণত বয়সে কর্মক্ষেত্রে ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় সে ব্যস্ত থাকে। পল্লবিত বার্ধক্যে অর্জিত মানসিক স্বচ্ছতাতেই মানুষ বুঝতে পারে তার মূলের অভিজ্ঞতার প্রাজ্ঞ তাৎপর্য।

যামিনী রায়ের জীবনদর্শনের আলোচনা এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু বিষয়টি মনে রাখা দরকার, তাঁর শিল্পসাধনার প্রসঙ্গেই। যামিনী রায়ের মতো শিল্পীর মানস তাঁর চেতন ও অবচেতনের, নন্দনতত্ত্বের ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে সামগ্রিক ব্যাপার, কারণ যামিনী রায়ের মতো শিল্পী মহত্ত্ব অর্জন করেছেন শুধুমাত্র হাজার হাজার উৎকৃষ্ট চিত্ররচনার কৃতিত্বেই নয়। যদিও নিছক শিল্পবিচারে তাঁর মহত্ত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাঁর বিরাট চিত্রসাধনার নিত্য নব এক চিরসত্য রূপদর্শী মুক্তচক্ষুর আনন্দকর বিস্ময় তো বড় কথা বটেই। অধিকন্তু তাঁর প্রতিভার আধিদৈবিক শক্তির ও তাঁর বিকাশের পুরুষার্থ আরেক গভীরতা পেয়েছে তাঁর এই সমগ্র ব্যক্তিগত ঈস্থেটিক বা নন্দনতত্ত্বের অক্লান্ত সন্ধানে ও আবিষ্কারে। এইখানেই একজন নিপুণ চিত্রকর এবং একজন স্বকীয় দৃষ্টির ও হাতের কর্তৃত্বে অনন্য-মৌলিক আর্টিস্টের মধ্যে তফাৎ। যামিনী রায়ের অর্ধশতাব্দীব্যাপী চিত্রকর্মে দেখা যায় এক প্রতিভাধৃত শিল্পীর একক তীব্রতায় একটি ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পরিণতির পর্বে পর্বে দীর্ঘ ইতিহাস, যে শিল্পী তাঁর

টেকনিক বা কলাকৌশল এবং তাঁর স্বকীয় রূপদ্রষ্টা ব্যক্তিত্বকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে চান নি। তাঁর ইস্থেটিক অর্থাৎ নন্দনপ্রেরণা সর্বদাই দাবি করেছে সংহতি ও সংলগ্নতায় স্বীয় একাত্মতা। যে-সব দুর্লভ শিল্পীর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য, তিনি নিশ্চয়ই সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে একজন। তার কারণ তিনি অনেক চিত্রকরের মতো তথাকথিত স্বকীয়তার পিছনে মরিচিকা সন্ধান করেন নি, কারণ তিনি সমানে ছবি এঁকে গেছেন, প্রয়োগ পরীক্ষা করে গেছেন প্রকৃত নন্দনশিল্পীর বা জাত-আর্টিস্টের ব্যক্তিস্বরূপের গভীর উৎস থেকে। এ রকম জাত-আর্টিস্টদের চৈতন্য ভর ক'রে থাকে কিন্তু দুর্নিবার, এমনকি নির্মম, এক সৌন্দর্যের দর্শন, তার সমস্ত রকম আকার-প্রকার সমেত, যাতে আর এ-রকম শিল্পীদের মনে কখনো স্থিতির শান্তি থাকে না। এবং এই সংগ্রামসাধনায় যামিনী রায়ের মনে তাঁর চিত্রধর্মের অন্বিষ্ট তাঁর জীবনদর্শনের ছন্দে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রবাসীর সাবেক পাঠকদের কাছে বোধহয় নিম্নোক্ত উল্লেখ মনোজ্ঞ হবে।

এ প্রবন্ধের নির্দেশ পাবার পরে সম্প্রতি একদিন রায়মহাশয়ের বাড়ীতে ১৩১৬ সালের বাঁধানো জীর্ণবস্থ একটি "প্রবাসী"তে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'তপোবন' নামে প্রবন্ধটি। দাগ-দেওয়া অংশের তলায় ও পাশে দেখলুম যামিনীবাবুর মন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ সে অংশে বলছেন ঃ

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছে করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্রের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজু রেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।......

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিষ নয়। বাজারে কোনো বিশেষ-কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশংবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশী করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

'ছোট পা সৌন্দর্য বা অভিজাত্যের লক্ষণ এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায়নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষেও হঠাৎ জবর্দস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

'এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়; আদান প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিষের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার

আর অদলবদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না ; তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না……'

যামিনীবাবুর হাতে লেখা মন্তব্যটিতে তাঁর সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর আগে চিত্রসাধনার সেই পর্বে তাঁর সংকটের নিশানা মেলে :

'আমার মনের কথা আজ লিখায় পড়লাম।…ঠিক আট মাস পূর্বে এই কথা উপলব্ধি হয়েছে—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল—।'

তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি আবার দাগ দিয়েছেন :

'এইজন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই ক্ষুব্ধ করে—আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে।'

'হতে পারি দীন, তবু নাহি মোরা হীন'—এই বৃহত্তম অনুভূতিই যামিনী-বাবুকে তাঁর অসামান্য অংকননৈপুণ্যের সাফল্যে সন্তুষ্ট রাখতে পারেনি, পণ্যযুগের ঐশ্চর্যময় ইওরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রমূলক অংকনরীতি অর্থাৎ রিয়ালিস্‌মের ভেদাত্মক যোগফলমার্কা রীতি তাই আর তাঁকে তৃপ্তি দিচ্ছিল না এবং তিনি জীবিকা বিপন্ন করে প্রচণ্ড আকুতিতে এঁকে যাচ্ছিলেন ছবির পরে পরীক্ষার্থী ছবি। খুঁজছিলেন ভিন্ন ভিন্ন রূপাকৃতির গোটা চেহারা, খুঁজছিলেন সেই সেই রঙের ও রেখার সরল শুদ্ধি ও স্বভাবের গভীরোৎসারিত সততা, যাতে তাঁর জীবনের বোধ ও শিল্পীর রূপদর্শন একতায় সহজ হয়ে উঠতে পারে। ঐ রকম সময়েই যখন তিনি ভারতের রৌদ্রে এবং ভারতের নববাবুসমাজের প্রতিধ্বনিত চাহিদায় রিয়ালিস্‌মের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়ে মর্মে মর্মে বিচলিত অথচ তাঁর স্বকীয় মার্গ বিষয়ে তাঁর হাত ও মনের অভ্যাস তখনো নিঃসংশয় নয়, এ-রকম সময়েই তাঁর-চার-পাঁচ বছরের বালকপুত্রের অপটু কিন্তু প্রকৃত শিশু-চিত্রকরের আঁকা ছবিতে স্বকীয় সমাধানের আভাস পান। যামিনী রায়ের শিল্পীজীবনে দেখা যায়, বার বার এই যন্ত্রণাময় সন্ধান ও বিশিষ্ট রূপ অর্জনের মুখে বা সঙ্গে সঙ্গেই অথবা হয়তো অব্যবহিত পরেই তিনি সমর্থন পান দেশের বা বিদেশের লোকশিল্পী বা কারিগরের বা শিশুদের কাজে এবং এটা প্রায়ই ঘটে আকস্মিক যোগাযোগের সুযোগে। আর তখন শিল্পী খুশীতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বাইজান্তীয় পর্বে এটা স্পষ্ট দেখেছি।

এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব তাঁর পঞ্চাশ বছরের চিত্রসাধনার চাক্ষুষ ইতিহাসের একটা ধারণা করা। এই ধারণাটা করতে পারলে বোঝা যায় যে, সৌন্দর্যের কী নির্দেশে, যার কথা সক্রেটিস ডিওটিমা আলোচনা করেছিলেন, বাংলার এই চিত্রকরকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সাংসারিক সাফল্যের নিরাপত্তার কুলত্যাগ

করিয়ে নামিয়েছিল আপন শিল্পীসত্তার সম্পূরণের দুর্গম সাধনায়। সন্ধানের সেই যুগটি কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্টে বস্তুত এক বীরত্বের ইতিহাস। বাধা যে কী কঠিন ছিল আজকের নবীন পাঠকের পক্ষে তা কল্পনাতেই জানা সম্ভব। কারণ যামিনী রায় আজ দেশ বিদেশে ও সারা বিশ্বে আদৃত শিল্পী। কিন্তু তখন তাঁকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সেই ভালবাসা দিয়েছেন, তাঁরাও দ্বিধান্বিত হয়েছেন, তাঁর শিল্পসাধনার নতুন মার্গকে গ্রহণ করতে। যেমন ধরা যাক শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাত্রাবস্থা থেকেই স্নেহের চক্ষে দেখতেন, কিন্তু সে তাঁর ইওরোপীয় মার্গে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য। তাই অবনীন্দ্রনাথের কথায় ছাত্রাবস্থাতেই যামিনীরায় জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকেন। যামিনী রায়ের প্রথম পরীক্ষার যুগের ছবি অর্থাৎ যখন তিনি ছবিতে

তেলরঙের কাজেও রেখার স্পষ্টতা ও রঙের স্বরসমতায় মন দিয়েছেন, সে যুগের ছবি দেখে গগনেন্দ্রনাথও খুশী হয়েছেন ও কিনেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়—এঁরাও নবীন শিল্পীকে দিয়ে পোর্ট্রেট করিয়েছেন এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকর তো বহুকাল ধরে যামিনী রায়ের ছবির গুণগ্রহণ করে যান। প্রবাসীর শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে যামিনী রায়কে চিনতেন ও স্নেহ করতেন। কিন্তু দেশের তদানীন্তন শিল্পতত্ত্বের আবহাওয়ায় তিনিও কখনো প্রবাসীতে বা প্রবাসী-প্রকাশিত অ্যালবাম-মালায় যামিনী রায়ের ছবি ছাপতে পারেননি।

এই রকম কঠিন বাধার মধ্যে যামিনী রায়ের একাকী অভিযান চলল রঙের ও রেখার বা রূপের শুদ্ধির পথে। রিক্ত নিছক রূপের ধূসর ছবির পর্বে পৌঁছে যামিনী রায় বোধহয় প্রথম তৃপ্তিলাভ করলেন। কিন্তু জীবন্তস্বভাব শিল্পস্রষ্টা তো কখনো নিজের সিদ্ধিতে স্থাবর হতে পারেন না, তাই যামিনী

রায়ও রূপের এই ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধ পর্বে আবদ্ধ হতে পারেননি। তাঁর অশান্ত অন্বেষা চলল আরেক রকম রঙের ইন্দ্রিয়ময়তার সামাজিকতার গার্হস্থ্যে; এল রামায়ণের মানসিকতার, কৃষ্ণলীলার আনন্দবেদনার মাতৃরূপের রেখায় আধৃত সমন্বর বর্ণাঢ্যতা। যামিনী রায়ের মতো ক্রমান্বয়ে আতত শুদ্ধ অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীর উত্তরণ বা ক্রান্তি গন্তব্যের স্থিতিতে নয়, গমনাগমনের আন্দোলনেই তাঁর শিল্পীস্বভাবের স্বরূপ প্রকাশিত। শান্তির প্রসাদ তাঁর ছবির লক্ষ্য, কিন্তু তাঁর নিজের শান্তি কোথায়?—তিনি বলেন, সুখাদ্য সুপাচ্য জিনিস তৈরী করে যে সে তো আগুনের কারবারী, আর যে খাবার খেয়ে আমরা তৃপ্ত পাই, ক্ষুধা শান্তি পায়, সে খাবার তো আগুনে পোড়া বা ভাজা বা সিদ্ধ হয়ে তবে তৃপ্তিকর, শান্তিদায়ক। এই শিল্পীর জঙ্গমতার জন্যই বোধহয় যামিনী রায়কে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তাঁর কোন্ ছবি বা কোন্ পর্ব তাঁর নিজের প্রিয়—তখন তিনি বিড়ম্বিত বোধ করেন, তাঁর মনে হয়, গাছ কি তার কোনো বিশেষ ফলকে পক্ষপাত দেয়? গাছ তো শুধু মাটি কাদা জল রৌদ্র হাওয়ায় কাজ ক'রে—ক'রে ফল ফলায়; আর ফল বাছে পাড়ে তো অন্যেরা, যার যা রুচির প্রয়োজন সেই অনুসারে।

তাই এই খ্যাতির শীর্ষে তিয়াত্তর বছর বয়সেও যামিনী রায় তৃপ্তিহীন। তার মানে এ নয় যে, তিনি তাঁর নিজের কাজ দেখে কখনো খুশী বোধ করেন না বা দর্শকের চোখে-মুখে প্রসন্ন বা উত্তেজিত নন্দিতভাব দেখে খুশি হন না। কিন্তু এর মধ্যে একটা ব্যাপক নিরাসক্তিও স্পষ্ট, শিল্পী হিসাবে তাঁর স্বকীয় উত্তম পুরুষ তাই প্রথম পুরুষে সংস্থিত। তাই তাঁর শিল্পীর প্রেরণা ও প্রয়াসের অশান্ত প্রাবল্য অংশ্য তার চিত্রধর্মে রূপান্তরিত হয় ধ্রুপদি মনের ও অংকনের প্রক্রিয়ায়। ছাপ রেখে যায় শুধু একটা জ্যাবদ্ধ আর্তির, যাতে একালের আত্মসচেতন ও আত্মসচেতনতার দ্বান্দ্বিক ঐক্যে বিশ্বাসী মানুষ বারংবার তৃপ্তিলাভ করে। তাই তাঁর চিত্রকর্মের একাধারে বিশিষ্টভাবে বাংলা ও ভারতীয় ও বিশ্বজনীন অথচ স্বপ্রতিষ্ঠ সুস্থ শান্ত জগতে নানান ভিন্নদেশী মানুষ—মার্কিন শিল্পানুরাগী বা চীনের শিল্পানুরাগীদের সন্দেহ একত্রে সহ-অবস্থিত হতে পারেন।

বর্তমান লেখকের পক্ষে এখানে আবার যামিনী রায়ের চিত্রসাধনার ভিন্ন ভিন্ন পর্বের আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অথবা কী ভাবে ছবির আঁকা সংক্রান্ত নানাবিধ কাজের অভিজ্ঞতা সবকিছুই যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করছে সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে, উপসংহারে প্রবাসী-পাঠকদের জন্য লেখকের উপহার হোক বরঞ্চ একজন বিদেশী সমালোচকের একটি সংক্ষিপ্ত লেখার অনুবাদ। সচিত্র লেখাটি 'মহান্ শিল্পী' যামিনী রায়' নামে কয়েক বছর আগে 'লার্' নামক ফরাসী শিল্প-সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল। তাতে এরুডে মাসন্—আ লেখেন:

চিত্রশিল্পের কথা বলতে গেলে বাধ্য হয়ে ইওরোপের কথা এবং বিশেষ করে ফ্রান্সের কথাই ভাবতে হয়। কিন্তু যদিও আমরা সর্বদা অন্যান্য মহাদেশের কথা মনে রাখি না, অন্যান্য দেশেও গুরুস্থানীয় এবং শিল্পকর্ম সে-সব দেশেও শিল্পজীবন কর্মময়। আমি এক ভারতীয় চিত্রকরের কথা বলতে চাই, ভারতের অগ্রগণ্য নতুন একজন চিত্রকরের কথা।

'উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা দেশে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর জন্ম, শৈশব থেকেই যামিনী রায় তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ও বহু সমৃদ্ধ জটিল সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের যোগাযোগ চর্চা করেন। বেলেতোড় বাংলার সেই অংশ যে অঞ্চলের একদিকে বিহারের পাহাড়ে প্রান্ত ও অপর দিকে গঙ্গা-ভূমির উর্বর ব-দ্বীপের সবুজ ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে বহু জাতির মিশ্রণ ঘটেছিল অতীতে এবং সেই মিশ্রণের ফলে এক সংস্কৃতির তীব্র ও দুর্মর রূপ নিয়েছিল, যার পুষ্টি আঞ্চলিক, যার বিকাশ হিন্দু আচারের এই অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষত্বে। কয়েক শতাব্দী ধরে এই সংস্কৃতির প্রধান বিশেষত্ব দেখা গেছে আর্য ধর্মগত চাপের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহের একটা প্রয়াস এবং আজ সেখানে হিন্দু-ধর্মের যে প্রাধান্য তা সম্ভব হয়েছে নানা অনির্দিষ্ট বা অবিভূতবাদী ও বৌদ্ধস্মৃতি স্বীকার করেই।

'যামিনী রায়ের সমগ্র শিল্পকর্ম তাঁর এই উৎসের দ্বারা সঞ্জীবিত। পশ্চিম থেকে আমদানি শিল্পশিক্ষার বিষয়ে তিনি কোনো আপসই করেন না, এক শুধু সেই জ্ঞানের সাহায্যে সাবেক কোনো অধ্যাত্মপুরাণ ও আবেগবান প্রতীকময়

ভারতীয় শিল্পের প্রত্যয়গুলি সহজে উন্মোচিত করা ছাড়া ; এবং এইখানেই যামিনী রায় নবপথ-রচয়িতা ঃ এই কারণেই তাঁর প্রতিভা তাঁকে এক প্রাদেশিক শিল্পগুরু মাত্র না ক'রে বরঞ্চ করে তুলল জাতীয়-শিল্পী।
'নবীন যামিনীর পিতা প্রগতির হাওয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ষোলো বছরের পুত্রকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন চিত্রকলা শিখতে, আত্মীয়-কুটুম্বদের মন্তব্য সত্ত্বেও। প্রবল উৎসাহী, নিজের মধ্যে অধিষ্ঠিত, চিত্রকলার রহস্যোদ্‌ঘাটনে উন্মুখ, ভাবীকালের এই সিদ্ধাচার্যের দ্রুত উন্নতি চলল। একুশ বছর থেকেই তাঁর সুনাম। ইওরোপীয় রীতিতে দক্ষ ভারতীয় চিত্রকর তাঁর অধিকাংশ সমকালীনদের তুলনায় তাঁর উৎকর্ষ স্পষ্ট বোঝা গেল। এ চললো তেরো বছর।

'তারপর এল সেই যুগ, যখন যামিনী রায় উপলব্ধি করলেন যে, তিনি সিদ্ধহস্তে আঁকছেন যা তিনি চোখে দেখলেন, কিন্তু যা তিনি অনুভব করেছেন তা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা হয়নি। সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিজিতের বংশধর, এবার তিনি হতে চাইলেন স্বাধীনতার সন্তান। তিনি আঁকতে চাইলেন তাঁর রক্তের ইতিহাস, চাইলেন তাঁর দেশের লোককে রূপ দিতে এবং সেই লক্ষ্যে পেঁছিতে কোন আত্মত্যাগই তাঁর কাছে তিক্ত লাগে নি, কোনো বিপদের ভয়ই তাঁকে নিবৃত্ত করে নি। শিল্পের উপায় উপকরণ? ইওরোপীয় দীক্ষায় দীক্ষিত পশ্চিমা উপকরণে অভ্যস্ত যামিনী রায় এইসব সুবিধা বিসর্জন দিলেন। তাঁর বর্ণফলক তিনি পরিমিত করলেন সাতটি রঙে এবং এই রঙ তিনি প্রস্তুত করেন স্থানীয় মাটি-রঙ চুর্ণ করে তেঁতুল আঁঠায় বা ডিমের সাদায় মিশিয়ে। ধূসর তিনি আনেন নদীর পলিমাটি থেকে, সিঁদুর-রঙ পান মেয়েদের পুণ্যাচারের সিঁদুর থেকে, নীল তো চাষের নীল, আর শাদা হচ্ছে সাধারণ খড়ির রঙ এবং কালো তিনি মেশান সুলভ ভুষো থেকে। সর্বোপরি, জমি তৈরির জন্য তিনি গোবরের সদ্ব্যবহার করেন, দেশের প্রাচীন পুরুষদের মতোই শুধু কার্যকারণের পূর্ণজ্ঞানে।
'পরীক্ষায় অপরিহার্য' দ্বিধায় অন্বিত অভিযানের শেষে তিনি অর্জন করলেন তাঁর সব পরিশ্রমের পুরস্কার, এল এক নতুন চিত্রশিল্প। নিশ্চয়ই নতুন পরন্তু তাঁর স্বদেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অস্থিমজ্জায় প্রাণবন্ত। এক হিসাবে ভারতীয় শিল্পই, সবদিক দিয়ে ভাবলে কিন্তু গভীরভাবে মানবিক শিল্পও বটে।
'এমনকি তাঁর ধর্মনির্ভর চিত্রাবলীও, তাঁর বিচিত্র "কৃষ্ণ-বলরাম"। এক জীবন্ত শক্তিতে স্পন্দমান। তাঁর ছবি দেখে অনুভবে আসে ভারতীয় জনসাধারণের জীবনের গভীর নাড়িস্পন্দন, যে জনসাধারণের প্রাতিবেশিত্বে এই শিল্পের জীবন। তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর দেশের লোকের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম, ধর্মগত

দৃশ্যাবলী, বিচিত্র আনুষ্ঠানিক নৃত্য, কর্মরত সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। রং দিয়ে, রূপ দিয়ে সর্বত্রই তাঁর চিত্রলোকে পুনরাবিষ্কৃত হয় চৈতারূপ বিরাট ভারতবর্ষ, অধ্যাত্মজীব্য, দুজ্ঞের্য়, ইন্দ্রিয়জীব্য, লালিত্যে প্রায় নারীস্বভাব।

'অবশ্য যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম ভারতের রূপেই ক্ষান্ত হয় নিঃ কখনো কখনো তিনি পশ্চিমের প্রান্তেও প্রেরণা খুঁজেছেন। তাই খৃষ্টের এমন সব অপরূপ আলেখ্য তাঁর কাছে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে বাইজানতীয়া চিত্রে সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এ সাদৃশ্য আরেকবার প্রমাণ করে এই ভারতীয় শিল্পীর স্বকীয়তা। বস্তুতঃ বাইজান্তিয়ুমের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং সেই কারণে যে-সব প্রভাব সেখানে শিল্পীরা পেয়েছিলেন সেই উৎসেই বাইজান্তীয় শিল্পে পূর্ব ও পশ্চিমের মনোরম মিশ্রণ। পূর্বদেশীয় যামিনী রায় যখন পশ্চিমে তার প্রেরণা চান তখন সমতুল্য মিশ্রণ ও তার সমতুল্য ফলাফল আশ্চর্য কি?

'ভারতের বাইরে যামিনী রায় নিঃসন্দেহে একালের মহত্তম শিল্পাচার্যদের মধ্যে গণ্য। কোনো কোনো দিক থেকে, যথা, তাঁর নিটোল নিশ্চিত নক্সা বাহারের রমণীয়তায়, তাঁর চিত্র দেখে মাঝে মাঝে মাতিসের ছবি মনে পড়ে। প্রসঙ্গত এটা লক্ষ্য করবেন:

'মাতিসের কাছে পূর্বদেশ একেবারে অনাত্মীয় নয়; এবং সম্ভবত দুই সভ্যতার পূর্ব-পশ্চিমের উদ্বাহের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় দুই শিল্পীর এই সাদৃশ্য, যদিও তাঁদের উৎসক্ষেত্র অত ভিন্ন। সে যাই হোক, যামিনী রায় প্রামাণ্য প্রকাশ দিলেন ভারতবর্ষকে, প্রমাণ করে দিলেন এক শিল্পী ভারতের জীবন, তীব্রতা যার প্রবল এবং যার আত্মপ্রকাশ দিনে দিনে আরো এগিয়ে চলবে।'

অস্টিন কোটস

যামিনী রায়

সর্বাধিক ভারতবিশ্রুত চিত্রশিল্পী যামিনী রায় বিশ্বখ্যাতিও লাভ করেছিলেন। প্রায়শই এশিয়ার পিকাসো বলে অভিহিত এই চিত্রশিল্পী স্বদেশেই প্রবল বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। চল্লিশ দশকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীগুলি নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমনও হয়েছিল যে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলির অকুণ্ঠ প্রশংসা বা তীক্ষ্ম সমালোচনা করে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা ব্যয় করতে থাকে। শিল্পী ১৯৫০ থেকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করা বন্ধ করে দেন। এই বছরেই তিনি দক্ষিণ কলকাতায় নিজের অঙ্কিত নক্সা অনুকরণে নির্মিত একটি বাড়িতে বসবাসের উদ্দেশ্যে উঠে আসেন। এই বাড়ির একতলায় খুবই সাদামাটা কয়েকটি প্রদর্শনী কক্ষ থাকায় বহিরাগত দর্শকদের পক্ষে এখানে শিল্পীর শিল্পকর্ম দিনের যেকোন সময় দেখে নেওয়া সম্ভবপর হল। প্রত্যেক বছর পৃথিবীর সকল স্থান থেকে তাঁর কাছে নিয়মিত দর্শককুলের আগমন হ'ত। শিল্পী নিজে কদাচিতও তাঁর জন্মভূমি বাংলা ছেড়ে বাইরে যাননি, কখনও তিনি ভারতের বাইরে পা ফেলেননি। বাংলার বাঁকুড়া জেলায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। কলকাতার সরকারী কলা বিদ্যালয়ে তাঁর কলাচর্চার শিক্ষালাভ। তাঁর এই শিক্ষালাভ ছিল ইউরোপীয় সারস্বত ঐতিহ্য অনুসারী। অন্যান্য বহু তরুণ চিত্রশিল্পীর মতো তিনিও বিক্ষুব্ধ বোধ করতেন। অভারতীয় এই উপস্থাপন আঙ্গিকের দরুণ যথাযথ আত্মপ্রকাশের পথটি খুঁজে পেতেন না। অন্যদিকে সম্প্রতি প্রচলিত দেশজ বিকল্পটি ছিল মূলত এক নীরস, নকল-ভারতীয় চিত্রশৈলী যাবিনা সর্বৈব ভাবালুতা দোষদুষ্ট ও প্রাণ প্রাচুর্যহীন।

তিনি এই চিত্রশৈলীর শিল্পকর্মে নিরত থেকেও প্রতিকৃতি অংকনে মনোনিবেশ করলেন এবং এই পথেই তিনি দ্রুত সাফল্য লাভ করলেন। ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিকৃতি অংকনশিল্পী।

যামিনী রায়ের প্রধান কাজটি ছিল ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পত্নীদের প্রতিকৃতি অংকন করা, কিন্তু সেকালের প্রথা অনুসারে কোন পুরুষ চিত্রশিল্পীর সম্মুখে কোন সম্ভ্রান্ত নারী দূরের কথা, তাঁদের সহচরীদেরও বসবার অনুমতি দেওয়া হ'ত না।

ফটোগ্রাফ দেখেই প্রতিকৃতি অংকন করতে হত। এই প্রাণহীন শিল্প আঙ্গিক হতাশা আরও বাড়িয়েই তুলত। যে সময় তাঁর জনপ্রিয়তা শীর্ষে সেই সময় তিনি সপ্তাহে দুইটি করে প্রতিকৃতি অংকন করতেন। সময় যত যেতে থাকে তাঁর সৃষ্টিকার্যের গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হ'য়ে আসে। শেষে দেখা গেল তাঁর ইজলে একটি প্রতিকৃতি ছয় মাসেও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তিনি সেই প্রতিকৃতি আর সম্পূর্ণই করলেন না এবং আর কখনও অন্য প্রতিকৃতি আঁকলেনও না।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে যামিনী রায় ১৯২০ নাগাদ পশ্চিমি শিল্পরীতির প্রয়োগ বর্জন করলেন, এবং বাংলার গ্রামীন চিত্রশিল্পীদের ঐতিহ্যের অভিমুখী হ'য়ে উঠলেন। এই গ্রামীন চিত্রশিল্পীরা মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ও গ্রামীন মেলাগুলিতে তাঁদের এই নিরহংকার, পরম্পরা লব্ধ শিল্পকর্মের নিদর্শন রাখতেন, যে কলানৈপুণ্য বুদ্ধিজীবি মহলে ছিল অবহেলিত এবং কলাজগতের কাছে অপাংক্তেয়। এই শিল্প উপাদানগুলি থেকে যামিনী রায় এক নূতন ও অদ্বিতীয় অংকনরীতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

সাত বছর তিনি প্রায় কোন ছবিই বিক্রী করেননি। এই পর্যায়ে তিনি বড় শহরে জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে মনে করা হ'ত তিনি বোধহীন একপেশে এক শিল্পী যাঁর শিল্প কর্ম সর্বৈব মূল্যহীন। তথাকথিত আধুনিক ভারতীয় কলারসিকদের দৃষ্টিতে তাঁর এই নূতন চিত্রাংকনরীতি নিতান্তই অপরিণত মানসের ও বয়স্কের কাছে অবজ্ঞেয় বিষয়সুলভ বলে বোধ হ'য়েছিল। তিনি এমন দরিদ্র ছিলেন যে ক্যানভাস কেনবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না; এই পর্যায়ে তিনি প্যাকিং বাক্সের কার্ডবোর্ড, বই, রেলের টাইমটেবল ও টেলিফোন ডাইরেক্টরীর নরম মলাটের উপর আঁকার কাজ চালাতেন। রঙ কিনতে পারতেন না বলে মৌল উপাদানগুলি থেকে নিজের হাতে রঙ প্রস্তুত ক'রে নিতেন, এবং তদবধি তিনি এরকমই করে এসেছেন।

তথাকথিত আধুনিকেরা তাঁর শিল্পকর্ম অনুধাবন করতে পারছিলেন না, কেউ কেউ কোনদিনই বুঝতে পারেননি। তার কারণ হ'ল তিনি তথাকথিত আধুনিকতার বিপরীত মেরুতে পৌঁছেছিলেন। তাঁর চিত্রকলার লক্ষ্য হ'য়ে

উঠেছিল তাঁরই প্রদত্ত অভিধা অনুযায়ী শিশু মনস্কতা। যামিনী রায়ের এই অনুভাবনার মূলে তাঁর চতুর্থ সন্তান অমিয়র (যিনি পটল বলে পরিচিত) বিশেষ অবদান ছিল। সে পেনসিল ধরবার দিন থেকেই ছবি আঁকতে শুরু করে। তার পিতা তার অংকনরীতির উপর নজর রাখতেন। অন্যান্য সবকিছুর সাথে তার চিত্রাংকনে এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হ'য়েছিল যেটি যামিনী রায়ের চিত্রকলায় এক সুবিখ্যাত বিশিষ্টতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পটল লক্ষ্য করে দেখেছিল বাঙ্গালীদের আঁখিদুটি বিশাল, সে ছবিতে এই

অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করতে যতই প্রয়াসী হ'ত, ততই দেখা যেত তার অংকিত চিত্রে আঁখিদুটি মুখাবয়বের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে না। আঁখির কিছুটা অংশ বারবারই বাইরে প্রসারিত হ'য়ে পড়ছে। যামিনী রায় আমাকে বলেছিলেন "পটলের কাছ থেকে আমি শিখলাম। ও যে কাজই করত তার ওপর লক্ষ্য রাখতাম এবং সবকিছুই মনে থাকত।"

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে এক পরিবর্তন এল। এঁদের একটি ব্যাপক অংশ যামিনী রায়ের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। নামীদামী ভারতীয়

লেখকবৃন্দ ও কবিরা, সমালোচক ও কলা রসিকেরা আন্তর্জাতিক মানের এক শিল্পীর আবির্ভাবকে স্বীকৃতি জানালেন। বলা হতে থাকল পিকাসোর মত যামিনী রায়ও পাশ্চাত্ত শিল্পশৈলীর ব্যতিক্রমী এক খাঁটি ভারতীয় শিল্প আঙ্গিকের অনুভাবনা প্রবর্তন করেছেন। ঐ একই দশকে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর শিল্প কর্মের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং অনেকগুলি চিত্র সমুদ্র পাড়ের দেশগুলির বিশেষত ব্রিটেনের বেশকিছু লোকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে পেঁাছে যায়।

এরপর শুরু হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাথে সাথে ভারতবর্ষে এলেন সাময়িক ভাবে সামরিক পোযাকধারী বহু পশ্চিমী শিল্প-প্রেমী ও কলারসিক। তাঁরা যামিনী রায় যে আন্তর্জাতিক মানের একজন খাঁটি ভারতীয় চিত্র শিল্পী এই অভিমতকেই জোরালোভাবে সমর্থন করলেন। ভারতীয় শিল্প জগতে ইতি-মধ্যেই তিনি সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হ'তে থাকেন। তাঁর প্রতি বিদেশীদের মাত্রাধিক্য অভিনন্দন জ্ঞাপন শিল্পীর বিরোধীদের কাছে কুৎসা রটনার পথ খুলে দিয়েছিল। তাঁরা সদর্পে বলতে থাকলেন যে যেহেতু বিদেশী শিল্প রসিকদের কাছে লোক শিল্পের একটি আবেদন আছে, যামিনী রায় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে এই লোক শিল্পকে তাঁর চিত্রাঙ্কনের উপজীব্য করেছেন। অথচ তাঁরা এই বিষয়টি সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেলেন যে যামিনী রায়কে ভারতীয় কলারসিকেরাই প্রথম অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের বার্লিংটনে অনুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে সমসাময়িক চিত্রকলার প্রতিনিধিত্ব করবার বিরল সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম জীবিত শিল্পী যাঁর চিত্রকলা ভারতের ন্যাশানাল গ্যালারীর স্থায়ী সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। অঙ্কনশৈলীর বিচারে যামিনী রায়ের শিল্প কর্ম এগারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেকটি পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে এইটি লক্ষ্য করা যায় যে বস্তুভাবনায় তিনি 'শিশুমনে'র অভিমুখী হওয়ার প্রয়াসে তথাকথিত আধুনিকতা থেকে দূরভিগামী হওয়ার অবিরত সংগ্রামে রত।

তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন "সকল শিল্পেই শিশুমনটি অপরিহার্য। যদিও সেটি অসচেতন শিশুর নয়। একটি শিশুই শিশুশিল্পের যথার্থ স্রষ্টা। কিন্তু তাকে হ'তে হবে সচেতন শিশু'..."

ভাষান্তর : সত্যব্রত সান্যাল

একালের শিল্পীদের চোখে যামিনী রায়

অজিত চক্রবর্ত্তী

মূর্তিকার যামিনী রায়, শতবর্ষ-আলোচনা

যামিনী রায়ের জনপ্রিয় পরিচয় চিত্রকর হিসাবে। তিনি যে মূর্তি গড়েছেন, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ভাবে কাঠ খোদাই করেছেন—এ ঘটনা অনেকেরই গোচরে নেই ; কিম্বা খেয়াল থাকলেও যামিনী বাবুর মূর্তি নিয়ে আলোচনা সাধারণভাবে উপস্থাপিত হয় না। অথচ, ত্রিমাত্রিক কৌশলে তাঁর সক্রিয়তা বেশ স্পষ্ট। সমসাময়িক ভাস্কর্যে যামিনী রায়ের কথা মূল শিক্ষা বিচারের বাইরে ফেলে রাখা যায় না।

আমাদের চারুকলার ক্ষেত্রে ইংরেজের ভাববাহী একটা ভূমিকা আছে। বাঙলার স্বয়ং সৃষ্ট শিল্পজাগরণের প্রয়াস ইতিহাসের পাতায় তার পাশাপাশি রয়েছে, যদিও ঐ সচেতন প্রচেষ্টা অনেকের মতে অসার্থক। যামিনী রায় এই দুই অবস্থার মিশ্রিত পরিমণ্ডলের বাইরের। তাঁর কাজ সম্পর্কে স্বাধীন মূল্যায়ন সহজ হবে যদি অতীতের চৌহদ্দিতে পেঁছে একবার আগের ইতিবৃত্ত কিছুটা পর্য্যালোচনা করা হয় ;

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ সহরের পরিবর্ধনের যুগে পাশ্চাত্য শিল্প উপকরণের আকর্ষণ সাধারণের শিক্ষা এবং রুচির অলি গলি ধরে জন জীবনে স্থান করে নিয়েছিল। সে ছিল বহির্ভিত্তিক শাসন ও চিন্তনের এক যুগ। তখন থেকে আজ অবধি যে সব উপায়ে শিল্প শিক্ষা, মূর্তি নির্মান রীতি এবং ত্রিমাত্রিক সচেতনতা সচল রাখা হয়েছে তাতে ভারতীয় মূর্তি পরম্পরার বর্তমান স্বকীয় রূপ স্পষ্ট হয় না। বিবর্তনের ইতিহাসে আমাদের চিত্র এবং ভাস্কর্যের গতিধারা ভিন্ন। দুই শৈলী নির্দেশিত দুইজন চালক—ভাস্কর আর চিত্রকর। তাদের কাজ আপন আপন উদ্দেশ্য

নিয়ে। উভয়ের গতি, পরিচিতি, বিবর্তন এবং বৃদ্ধি একই ভাবে চলবে এমন একটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হতে পারে না। দেখা গেছে, অনেক সভ্যতাতেই শিল্পের উৎকর্ষতা, কি ছবিতে কি মূর্তিতে, আলাদা ভাবে ভিন্ন তাগিদের দরুণ সম্ভব হয়েছে। অতীতের ভারতবর্ষ এর উদাহরণ। মূর্তি নির্মানের অপরিসীম প্রাচুর্যে এদেশের পূর্ণ অবগাহন যে অতীতে সম্ভব হয়েছিল সেখানে চিত্রের যোজনা ছিল গৌণ। যদিও ছবি ছিল সামগ্রিক সৌন্দর্য সন্নিবেশের অনেকগুলি কারণের একটি, ব্যাপকতার বিচারে মূর্তির স্থান থাকত সবারা আগে। সাম্প্রতিক কালের কথা কিন্তু বিপরীত। এ যুগের চিত্র নিয়ে যতটা প্রচার বা পরিচিতি দেশের বাইরে ইদানীংকালে হয়েছে ভাস্কর্য প্রসঙ্গে ততটা হয়নি। তার মানে এই নয় যে তারতম্যের পেছনে দুই শৈলীর পরস্পরছেদী কোনো কারণ আছে। আসল কথা, দেশের পৃষ্ঠ পোষকতার ধারা যখন হয়ে পড়ে অসমান, যখন তত্ত্ব শুভার্থ সূচক প্রচেষ্টা সমূহ শীতল পদক্ষেপে চলে তখন যে কোন গৌরবোচ্ছল কৃষ্টি-স্রোতস্বিনী ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হয়ে আসে। আমাদের অতীত ভাস্কর্য নিয়ে প্রাচুর্যের যে উল্লেখ করেছি তার শামিয়ানায় আজকের ভাস্কর আজ নিবেদন করছেন ভগ্নদূতের মতো। ভাস্করের দৈন্যদশা নিয়ে উক্তি করছি না। এর চর্চা বছরের পর বছর বিঘ্নিত হয়ে এসেছে, এটাই বলবার উদ্দেশ্য। পৃষ্ঠপোষকতার প্রবল দীনতা সব চেষ্টাকে টেনে এনেছে বিপত্তির মূলে।

১৯৬০ এর দশকে কবি বিষ্ণু দে প্রায়ই বলতেন,—সমসাময়িক ভারতীয় ভাস্কর্যের পরিচয় অপ্রচুর। তাঁর মতো পণ্ডিত রসিক যে কারণে দেশের মূর্তি মূল্যায়ণের বিচারটি করেছিলেন কালের ঐ পর্যায়ে তা অমূলক ছিল না। তখন গুনে কয়েকজন মাত্র ভস্করের নাম করা যেত। আজ পঁচিশ বছরের বেশী সময়ের ব্যবধানে বহু শিল্পী পেশাগত ভাবে মূর্তি রচনায় তালিম নিয়েছেন। এছাড়া কোনো কোনো চিত্রকর ভাল কিছু ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন। একই প্রতিভার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন হতেই পারে। চিত্র শিল্পী দ্বিমাত্রিক সমস্যার বাহুপাশ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে অন্য কিছুর মাধ্যমে পুনরায় প্রকাশিত হন, এতো বার বার দেখি ইউরোপের ক্ষেত্রে। ইউরোপে দ্য মীয়র, রেনোয়া, মোদিল্লিয়ানি, গগ্যাঁ, দেগা, মাতিস এবং পিকাসো মূর্তি গড়ার যে পরিসর রচনা করেছেন তার মাত্রা আমাদের দেশের আনুপাতিক অর্থে কম হলেও যামিনী রায় উৎসারিত পূর্ব্বাভাষ দৃপ্তভাবে সামনে রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূর্তিকার এবং আঁকিয়ে-মূর্তিকার মিলে আমাদের সাম্প্রতিক মূর্তি-উদ্যোগ অনেকটা পরিচ্ছন্ন করেছেন। এর পরিচয় বিশীর্ন আর নয়। আবার এও নয় যে ভারতীয় আপন পরিবেশের মানানসই চেহারা রক্ষা করে এবং যুগের উপযুক্ততা ধারণ করে সৃষ্ট সকল ভাস্কর্যই নিষ্পত্তির দিকে এগিয়েছে। বিশেষ

শিল্প কর্মগুলি যুগে যুগে অনন্য। কিন্তু আধুনিক সাফল্যের দিনে দুর্ভাগ্য এই যে বর্তমানের প্রতিনিধিত্ব করবার মত অনন্য মূর্তি সমষ্টি ভারতবর্ষে এখনও কম।

অতীতের প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা করা গেল। এর পর বলা দরকার যে ছাত্র যখন মূর্তি রচনায় শিক্ষা পায় তখন তার মৌলিক কতকগুলি প্রয়োজন থাকে। যেমন—রেখাঙ্কন, গড়বার ঝোঁক, উপাদান ব্যবহার এবং রচনা বিন্যাস। প্রায়ই দেখা যায় শেষের তিনটিকে আয়ত্ত করা রীতিমত কষ্টসাধ্য। এই ত্রিবিধ অভ্যাসের জ্ঞান বিদ্যালয়ে কেবল পূর্ণ হয় না। আবার এমনও নয় যে তিনটি দিকের মূল কথা বইতে সবটা সরবরাহ করা আছে। প্রক্রিয়াগুলি বিক্রী-বেসাতির সুলভ উপকরণও নয়। শুধু নির্বাধায় কাজ করে আয়াসসাধ্যতায় এদের আয়ত্তে আনতে হয়। শৈলীগত হলেও এই প্রযত্ন সাধনার খুব বাছের।

যামিনী রায় আর্ট স্কুলের মূর্তিশিক্ষাতে তালিম নেন নি। সুতরাং মূর্তিগড়াতে আবশ্যিক হিসেবে যে যে উপায়ের উল্লেখ করা গেল তার কোনো-টাই শিল্পী পান নি। অথচ দেখা যাচ্ছে মূর্তির আঙ্গিক এবং শৈলীগত বিকাশে অসাধারণ প্রত্যয় তিনি পেয়েছেন। এর পেছনে কি কারণ তাহলে আছে? উত্তর হিসেবে যে সত্যটি পরিষ্কার মনে হচ্ছে তা হল এই :—বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে লোক পারিপার্শ্বিকের চতুঃসীমায় তিনি ছেলেবেলা থেকে অনেকদিন ছিলেন। বস্তুত মনেমনে গভীর অনুশীলন তাঁর হয়েছে ঐ গণ্ডীতেই, —সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কারিগরী সামগ্রীর স্রষ্টাদের সান্নিধ্যে। সব অনুভূতিশীল মানুষের গভীর ভাবে দেখবার মত স্বচ্ছ একটি ক্ষমতা থাকে। যামিনী রায় সে ক্ষমতা ধারণ করতেন। এছাড়া তাঁর ছিল গ্রামমুখী সরল অন্তরঙ্গতা। দুয়ের সমাবেশে তিনি উপাদানের ব্যবহারগত জ্ঞান এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা মনের আধারে একত্র করেছিলেন। গ্রামে কাঠের কারিগর কাজ করেছে নিজ পরিবারলব্ধ পটুত্বে। কাঠে সে তৈরী করেছে বিশিষ্ট গড়নের পিলসুজ, পিঁড়ি, চৌকি, মুড়ি ভাজবার চেপটা টানা আকারের খুন্তি, গৃহদেবতার আসন, দরজায় খোদাই করা নকসা, কাঠের আম, পাল্কি, রথ, পুতুল ইত্যাদি। ব্যবহারিক অথবা অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় এই জিনিষগুলির প্রতিটিতে আছে আঙ্গিকের খোলাখুলি প্রকাশ, আকারে বিশেষত্ব কোণ-এর যোজনা এবং জ্যামিতিক আকর্ষ। কারুসামগ্রীর প্রত্যক্ষ অবলোকন প্রথমে ঘিরে ধরেছে তাঁর আবেগকে, সেইসঙ্গে জড়ো হয়েছে তৎক্ষণাৎপন্ন প্রতিক্রিয়া এবং সকলের শেষে স্বচ্ছন্দানুবর্তী হয়ে দেখা দিল মূর্তি,—দস্তুরমতো সিদ্ধ হাতের কাজ। দেখা—শুধুই যে রূপসৃষ্ট সামগ্রী দেখা এবং তৃপ্তি পাওয়া তা নয়। দৃষ্টির আরেক পাশে আছে তীব্রতর চেতনা। তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন শিল্পীর চিত্তকে নিরন্তর সে জাগ্রত রাখে। এ প্রসঙ্গে যামিনী রায় মহাশয়কে

লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭।৬।৪১ তারিখের একখানি পারমার্থিক তথ্যপূর্ণ পত্র রয়েছে। মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল আগে কবি চিঠিখানি লিখেছিলেন শিল্পীকে। মৌলিক সত্যে পর্যবসিত চিঠি খানি দুই রচয়িতার মাঝে সেতুবন্ধন।

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় কল্যাণবরেষু, ৭।৬।৪১

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতু আনন্দ আছে। চোখে দেখি—সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুসী হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম—কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়তো, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখতো। এই হ'ল ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না; ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝবো। দেখবার জিনিস সে আমাদের দেয়—না দেখে থাকতে পারিনে; তাতে খুসী হই।
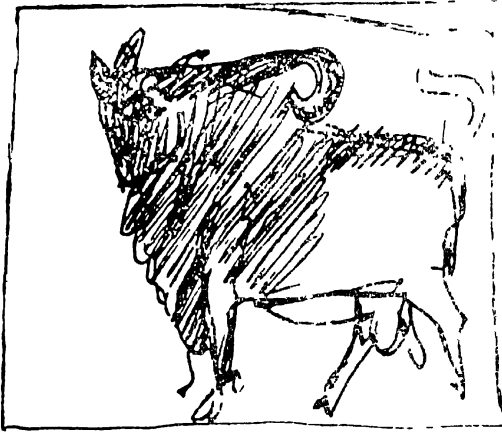
মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে—নানা রকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোন একটা বিশেষত্ব বশতঃ—সুন্দর হোক বা না হোক: মানুষ তা'কে আদর করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই—দেখতে ভালবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোন তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি

আছি—আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তা'তে আমি আছি—এই অনুভূতিকেও কোনোও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে—সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয় যতই সে হয় একান্ত ততই সে হয় ভাল। তার ভালমন্দের আর কোনোও রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু—সে অবান্তর—অর্থাৎ যদি সে কোনোও বাণী আনে তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগতো কানে, ভাবের রস আসতো মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানলো তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগলো। তখন রেখার রঙে সৃষ্টি করতে লাগলো যা প্রকাশ হ'য়ে উঠছে। এছাড়া অন্য কোনোও ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করলো। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি—যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন ব'লে আমার বোধ হয় নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না; ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে 'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুভূতি নিয়ে যেকথা বলা হল তার আরও উদাহরণ রয়েছে; যেমন হেনরী মুরের জীবনী থেকে একটি ঘটনা। হেনরী বয়সে তখন ছোট, স্কুলে যান। স্কুল থেকে ফিরে এলে তাঁর অসুস্থ মা প্রায়ই বলতেন,—'পিঠে বড় ব্যাথা হেনরী, মালিস লাগিয়ে হাত বুলিয়ে দাও, বাছা।' সযত্নে নিরলসভাবে হেনরী মায়ের সেবা করতেন। পরিণত বয়সে দিনপঞ্জীতে ঐ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবন্ধ করে তিনি বলেছেন,—'আমায় তৃপ্তি দিয়েছে আমার যে সব ভাস্কর্য তাদের গায়ে যখন হাত বুলোই তখন উপলব্ধি করি মায়ের পিঠের ডোল, ছেলেবেলায়

স্পর্শ দিয়ে যা পেয়েছি মায়ের সেবা শুশ্রূষাতে। যামিনী এবং হেনরী—সূক্ষ্ম বোধ শক্তির দুই কিশোর ধারক। স্রষ্টা ও সৃষ্টির উজ্জ্বল দুটি দিক। প্রণালী আলাদা হলেও রূপের বিকাশে উভয় ভূমিকা এক। ছবি-মূর্তির দরিয়ায় অনুরূপভাবেই আরও অনেক শিল্পী পাড়ি জমিয়েছেন। লোকজীবনের পেশা এবং পল্লীর সৃজনশীল নানা কাজের চমৎকারিত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে অন্তরে স্থান দিয়ে যামিনী রায় পেলেন তক্ষণ-দক্ষতা। তাহলে মূর্তি তাঁর অন্তরিন্দ্রিয়ের ফলাগম; প্রহেলিকা মাত্র নয়।

ষোল বছর বয়সে কলকাতায় সরকারী আর্ট-স্কুলে তিনি পড়তে আসেন। 'এখানকার শিক্ষা শিল্পীর অপরিণত অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছিল। এছাড়াও এখানেই মজবুত হয়েছিল বিদেশের কেতাবী (Academic) শিক্ষায় তাঁর চর্চা ও মতি। কিন্তু মধ্য বয়সের অনেকটা আগেই তিনি স্থির করেছিলেন যে পশ্চিমী আঙ্গিকে আর ছবি আঁকবেন না। সুতরাং সমসাময়িকদের পথ ছেড়ে তিনি এগোলেন একা। যে লোককলা কিশোর যামিনীকে নিরন্তর কাছে টানতো পরিণত চেতনায় সেই চিত্র-আদর্শ থেকে অবিনশ্বর রত্ন পাবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি সাহসিক যাত্রা করলেন। আর্থিক অভাব তাঁর কাছে ছিল তুচ্ছ। সামনে ছিল কালের অনুদারতা; মাথার উপরে ছিল ভাগ্যের নির্দ্দয় তর্জনী। আজ তাঁকে লোকশিল্পের কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত এক বৃহৎ প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

যামিনী রায়ের ছবির লক্ষণ যতটা ছড়িয়ে আছে ভাস্কর্য ততটা নয়। প্রথম দিকে পশ্চিমী ঢঙে তিনি কাজ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে জল রং মিশ্রিত উপায়ে ব্যবহার করে এবং সঙ্গে অবনীন্দ্রোত্তর ঐকতানে ভাবুকতা যুক্ত করে ছবি এঁকেছেন। সে সব ছবিতে বাংলার নবযুগের থিতোনো পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। তারপর এল পট থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণার কাল। একে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, শুরুতে এঁকেছেন কালীঘাটের পটচিত্রের রীতি ধরে এবং চিত্রার্পিত দেহাবয়বের ভারীভাব বা ঘনত্ব রক্ষা করেছেন রং এবং রেখার উপর জোর দিয়ে। এরই পরের পর্যায়ের ছবি হয়েছে পটচিত্র সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অল্প সচেতন হয়ে এবং পূর্বরীতির কিছুটা বাইরে সরে গিয়ে। গঠন, বুনোট প্রমাণ প্রভৃতি একটু বেশী পরিমাণে রক্ষা করা হয়েছে এই সব ছবিতে।

ভাস্কর্য অন্যদিকে প্রমাণ করে কেবল স্পষ্ট দুটো ধারা। ১৯৪২ সালে কাঠখোদাই তিমি প্রথম আরম্ভ করেন বেলিয়াতোড় গ্রামে। কাঠের অনভীষ্ট অংশ কেটে কমিয়ে উপাদান পিণ্ড থেকে কল্পিত আকার বের করা হয়েছে। স্বভাবতই ভাস্কর তক্ষনী বা বাটালি চালনার জন্য এতে তিনি পরোক্ষ উপায়ের অনুকারী। শিল্পীর উপাদান এবং সরঞ্জাম সম্বন্ধীয় অসামান্য প্রতীতী এসময়ের মূর্তিতে লক্ষ্য করবার মতো। অনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাসের

পরিবর্তে উল্লম্ব (Vertical) রচনায় তাঁর রুচি বেশী, দেখি। তিনি কাঠ নির্বাচন করেছেন স্তম্ভের মতো আকারের। অল্প খোদাই করা উপাদানের বেশীটা অংশ রচনার খাতিরে ব্যবহার করেছেন এবং বিষয় নিয়ে তিনি কেবল মানুষের অবয়বই রচনা করেছেন। কল্পিত প্রতিকৃতির মাথায় কাঠ জুড়ে টুপি দেখানো অথবা মুখে সিগারের অবস্থান সমাবেশগত (Assemblage) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। দু'একটি রচনায় আছে বাঙ্গলার তিন কোণ বিশিষ্ট কাঠের পুতুলের গায়ের মতো খাঁজ ;—সহজে সুকৌশলে সাজানো। কাজগুলির চিন্তাগত এবং কৃত দু'দিকই চিরকালের জন্য যেন চূড়ান্ত ;—সেই অর্থে যামিনী রায়ের ভাস্কর্য (Monumental) এবং তাঁর ছবির

কমনীয়তার বিপরীত অভিব্যক্তি। প্রায় দশ বছর পরে ১৯৫৩ সালে কিছু সংখ্যক মূর্তি তিনি মাটিতে গড়েছেন। এগুলির সরলতা মাটিরই সানুকূল এবং সহজ গঠনক্ষম। মাটির কাজে নরম মৃত্তিকাংশ একের উপর এক রেখে আকার ক্রমশঃ বাড়ানো বা আকারান্তরে যাওয়ার অনায়াসকৃত উপায় থাকে। মাটি নিয়ে মূর্তিকার সম্পূর্ণ স্বাধীন। পরিচালনশীল মন এবং দুই হাতের অঙ্গুলিগুচ্ছ শিল্পীর মূল সরঞ্জাম। মাটির সঙ্গে তার স্পর্শ নির্ণীত সম্পর্কের একটা গভীর দিক যেমন আছে, সুবিধাও আছে তেমন। সুতরাং মাটি কাঠের মূর্তিগুলি উপাদান বিভিন্নতার জন্য দুই ধরণের হয়েছে এবং যামিনী বাবুর

ছবির মতো পরিবর্তনের বিবিধ দিকে যায় নি। ছবি, রেখাঙ্কন এবং মূর্তি এই তিনের সমষ্টিতে তাঁর যাবতীয় কাজ। মূর্তির সঙ্গে বেশীটা সঙ্গতি রয়েছে রেখাচিত্রের। তার কারণ ড্রইংগুলি সবই অবয়বভিত্তিক এবং তাতে ছোটো খাটো বস্তুগত ব্যাখ্যা বিবরণ যুক্ত নেই। রেখায় অঙ্কিত আভাস ভাস্কর্যের আদল সদৃশ হওয়ার দরুণ সহজেই ত্রিমাত্রিক স্তরের তৃপ্তি দর্শককে দিতে পারে। এই তৃপ্তির দিশা আপনা থেকে আসে না হয়ত বা। দর্শককে খুঁজে নিতে হবে, কোথায় রেখা নিবিষ্ট বস্তুর আয়তন মূর্তিগত ঘনত্বের বা আঙ্গিকের কাছাকাছি। যামিনী রায়ের ড্রইং এবং মূর্তির মিল নিয়ে একসময়ে অনেকটা কৌতূহলী

ছিলাম ; এমন কি তাঁর ড্রইং-এর রেখার জোড় হাল্কা ধূসর রং-এর আঁচে ভরে দিয়ে ভাস্কর্যের ছায়ামূর্তি (Silhouette) অনুভব করবার চেষ্টা করেছি। আমার জানবার উদ্দেশ্য ছিল কোথায় দুই মাধ্যমের নিকটতম সম্পর্ক।

পরিশেষে আসা যাক শিল্পীর ভাস্কর্য সম্পর্কে গড়পড়তা দুর্বল মূল্যায়নের কথায়। ১৯৪৩ সালে জন আরউইন এবং বিষ্ণু দের দ্বৈত চিন্তা মথিত যামিনী রায় নিয়ে লেখা খানি শিল্পীর নানা দিকের কথা মূল্যবান তথ্যের মত সযত্নে ধরে রেখেছে। তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে সমাজ তথা ইতিহাসের দৃষ্টি-কোণ থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা আমাদের দেশে বেশী হয় নি। সব

লিখেও দুই টীকাকার শিল্পীর মূর্তি রচনার উদ্যোগ নিয়ে লেখেন নি, এটা বিস্ময়ের। পরিশিষ্টে আরও কথা আছে। পঞ্চাশ দশকের প্রথমে হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে লেডী রাণু মুখার্জি'র বাড়ীতে 'রসিক সভা' বসতো। 'রসিক সভা'র উদ্দেশ্য জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাসভার মতো ছিল কিছুটা। ছাত্র জীবনে 'রসিক সভা'র সুবাদে হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে কয়েকবার গিয়েছিলাম। সভাতে আসতেন ও সি গাঙ্গুলী, যামিনী রায়, অতুল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীহার রঞ্জন রায়, যামিনী গাঙ্গুলী, ক্যালকাটা গ্রুপের কোনো কোনো সদস্য এবং কলকাতার আরও অনেক রসামোদী জ্ঞানিগুণী মনীষীরা। বৈঠকে যামিনী রায়ের শিল্প প্রসঙ্গে আলোচনা শুনেছি মনে পড়ে। কিন্তু তাঁর ভাস্কর্য তাতে আলোচিত হতে শুনিনি কখনো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পীর মূর্তি বিষয়ক তথ্য চল্লিশ বছরের বেশী সময় পর্যন্ত অনুচ্চারিতই আছে। ঘটনাটি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ঘটে আসছে।

কেউ খুব ভাল শিল্পকর্ম করেন, কেউ সংকল্পে দৃঢ়, কেউ-বা নানা উপায়ে এঁকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন, কেউ আবার প্রতিভার বিনিময়ে প্রচার কিম্বা অর্থের দিকে ঝোঁকেন। এঁদের নানা সংশ্লিষ্টতা নিয়ে শিল্প পরিবেশ। সেখানে প্রয়োজন ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ, তথ্যানুসন্ধান ইত্যাদি। সতর্ক না হলে সামগ্রিক অন্বেষণে ঘাটতি থাকতে পারে। আমরা নিদ্রায় ডুবে আছি, এ নিন্দাও আসতে পারে। মূক ভূমিকাতে যে কোনো যথার্থ শিল্পীকে অনুজ্জ্বল রেখে প্রগতির সরস, সতেজ পূর্ণতা আশা করা যায় না। শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে পরিবেশবাদ মানতেই হয়। তাতে সফলতা বা ঘাটতি থাকবে না এমন নয়। পরম্পরাগত নানা ঘটনা, এমন কি ছোটো খাটো বিষয়গুলিও, অগোছালো থাকলে তা হয় যুগের ঘাটতি। সব আলোচনা বিশ্লেষণ এবং জ্ঞান প্রস্তুত থাকলে তাতে আসে সুস্থিতি। যামিনী রায় সেই ব্যাপ্তের শিল্পী সুস্থিতির যিনি ভূষণ হবার মতো।

ইন্দ্র দুগার

নতুন ফর্ম ও ডিজাইনের উদ্ভাবক

১৯৩৭ সাল। জিয়াগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসে ভর্তি হলাম কলেজে। কলেজে যাতায়াত করেও হাতে অঢেল সময়। যখন যেখানে খবর পাচ্ছি ভাল ভাল প্রদর্শনী দেখে বেড়াচ্ছি। একাডেমী অব ফাইন আর্টসের বাৎসরিক প্রদর্শনী তখন অনুষ্ঠিত হতো ভারতীয় জাদুঘরে—বড়দিনের সময়। এ ছাড়া আরও অনেক প্রদর্শনী হতো বড় বড় শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায়। খবর পেলেই ছুটে যেতাম এই সব প্রদর্শনী দেখতে। এই সময়—সাল তারিখ ঠিক মনে নেই, কয়েকবার গিয়েছি আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যামিনী রায়ের প্রদর্শনী দেখতে। সে এক চমক—অন্য অনুভূতি; ছোট ছোট নীচু নীচু ঘরে ছবিগুলো সাজানো। প্রত্যেকটি ঘরের মাঝখানে সুন্দর সুন্দর আলপনার উপর বসানো বড় বড় চিত্রিত জালা। আরও সুন্দর করে চিত্রিত জানালায় এপাশে ওপাশে ছোট ছোট মাটির পাত্র নানান্ সাজে সাজানো। এই সময়েই যতদূর মনে পড়ে তাঁর প্রথম দিকের ছবির সঙ্গে দৃশ্যচিত্রও বেশ কিছু দেখেছিলাম। আলাপ হয়েছিল শিল্পীর সঙ্গেও। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর সান্নিধ্যে বহুবার এসেছি। আর ও ঘনিষ্ঠ হয়েছি। শিল্পী এর কিছুদিন পরে সেই পুরোনো বাড়ি ছেড়ে তাঁর নিজস্ব নতুন বাড়ি বণ্ডেল রোডে উঠে এসেছেন। সে অন্য পরিবেশ, অন্য জগৎ। এখানেও বার বার গিয়েছি নানা উপলক্ষে, কিন্তু আজও আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সেই প্রদর্শনী গুলো পরিবেশের কথা ভুলতে পারিনি। সেই সময়ের প্রদর্শনীগুলো যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা যামিনী রায়ের আর একটা দিক দেখতে পাননি। প্রদর্শনীর ছবি এবং ঘরকে সম্পূর্ণ দিশী প্রথায় কি করে সাজাতে হয়।

যামিনী রায় সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তা হলো যে তিনি নাকি বাংলায় পটশিল্পকে অনুসরণ করে তাঁর শিল্প রচনা করেছেন। ধারণাটি আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। বাংলার পট শিল্পের সঙ্গে যামিনী রায়ের ছবির একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর ছবির রীতি পদ্ধতি এবং ছবির মেজাজ একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া শিল্পীজীবনের শুরু থেকে তিনি ট্র্যাডিশনাল য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন এবং সে-সব ছবিতে তাঁর দক্ষতাও খুব সুস্পষ্ট। অবশেষে উত্তর-তিরিশে পৌঁছে এই উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল যে এ পথ তাঁর নয়। নতুন করে তিনি শিল্পের ভাষা, পদ্ধতি ও প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য শিল্প আন্দোলনের প্রথম উত্তেজনা যদিও তখন অনেকটা কমে এসেছে, তিনি তার মধ্যেও কোন শিল্পের প্রেরণা খুঁজে পেলেন না। রাজপুত মোগল কোন শিল্পকলার মধ্যেই তাঁর অতৃপ্ত মন কোনো আশ্রয় পেল না। অবশেষে পেয়ে গেলেন তাঁর প্রার্থিত শিল্পের ভাষা, একেবারে আপন ঘরের মধ্যে, বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভাষা থেকে। বাংলার মাটির পুতুলে, পটে, কুমোরের কাজে, প্রতিমা তৈরীর কারিগরিতে, পোড়ামাটির মন্দিরে, লোকশিল্পের এই সমারোহ থেকে যামিনী রায় তাঁর শিল্পরচনার প্রাথমিক উপাদান পেয়ে গেলেন। এই প্রাথমিক উপাদান হলো লোকশিল্পের বাহুল্যহীন নিরাভরণ রূপকল্পনা এবং ছবিকে নিছক ছবি হিসেবেই দেখানো অর্থাৎ কোনরকম বাস্তবধর্মী (realistic) না করে কেবলমাত্র সুনিপুণ রেখা এবং সহজ বর্ণের ব্যবহার করে ছবির বক্তব্যকে ব্যঞ্জনা দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে একে অনুসরণ না বলে লুপ্ত পথের পুনরুদ্ধার বলাই শ্রেয়। কারণ এই লোকশিল্প ফটোগ্রাফিগুণবিশিষ্ট সমগ্র শিল্পরচনা থেকে এত স্বতন্ত্র, অথচ মৌল শিল্প-আবেদনে পরিপূর্ণ যে সেই আকর্ষণই তাঁকে শিল্পরচনার নতুন পথের সন্ধান এনে দিলো।

ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর থেকে য়ুরোপীয় শিল্পকলায় যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে তা হলো বাস্তবধর্মী শিল্পকলাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ফর্ম ও ডিজাইনের নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যামিনী রায় য়ুরোপের এই শিল্প-বিপ্লবের কথা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, তাই পটের শিল্পরীতিকে তিনি নতুন ফর্ম ও ডিজাইনের উদ্ভাবনের বাহন করে শিল্পরচনার সূত্রপাত করলেন। এই ধারার কাজে প্রথম দিকে তাঁর ছবিতে দেখা দিল মোটা অথচ সুদৃঢ় রেখা, অংকটা কালীঘাটের পটের আভাস, রূপরচনায় (Composition) বাহুল্য-হীনতা এবং দেশীয় প্রাথমিক রঙের ব্যবহার। সাধারণতঃ এই রঙ সাতটি বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন Indian Red, Yellow Ochre, Cadmium Yellow, Green, Vermillion, Grey, Blue, এবং White; রেখা

রচনায় যেখানে কালো রঙ ব্যবহার করেছেন তা এসেছে প্রদীপের ভুষো কালি থেকে। ছবির চিত্রপট তৈরী হয়েছে ঘরে বোনা কাপড় দিয়ে—তার ওপরে লেপে দিয়েছেন মাটি ও গোবরের প্রলেপ, কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন হাতে তৈরী কার্ডবোর্ড অথবা চাটাই। ছবির বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে প্রথম যুগে গ্রামের মানুষ বাউল কীর্তনীয়া অথবা বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন রূপারোপ। এই সব ছবিতে ডিজাইনের সুষম ব্যবহার ছাড়াও ছন্দ ও ভঙ্গিমার আশ্চর্যজনক বিশেষত্ব আছে। শুধু অকল্পিত রেখা রচনা নয়, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমতা রেখে রঙের ব্যবহারও অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে।

কিন্তু যামিনী রায় এর মধ্যেই থেমে যাননি। রেখা ও রঙকে আরো কীভাবে সহজ করা যায়, চিত্রপটের মধ্যে ছবির ডিজাইন আরও কীভাবে ব্যঞ্জনাময় হয় তারই অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। এ পর্যন্ত ছবিতে রঙ, রেখা ও রূপ রচনার (composition) সরলতা থাকলেও কোথায় যেন একটা sophistication-এর ছায়াপাত ছিল। এই পর্যায়ে যে ছবি আঁকতে শুরু করলেন তাতে চিত্রপট ও রূপ রচনায় ছন্দ ও ভারসাম্য বিশেষভাবে প্রাধান্য পেল। রূপরচনা চিত্রপট ও ফ্রেমের মধ্যে আর আবদ্ধ হয়ে রইলো না। ফ্রেমকে অতিক্রম করে ছবি যেন অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হলো। চিত্ররচনার এই বাহাদুরি তাঁর ছবিতে এক নতুন প্রসাদগুণ এনে দিয়েছে এবং দর্শককে এক অদৃশ্য রূপজগতের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সুদীর্ঘ শিল্পীজীবনে তিনি অবিশ্রান্ত কাজ করে গিয়েছেন। কেবলমাত্র শিল্প আবেগের উপর নির্ভর করে তিনি ছবি আঁকেননি, চোখ ও মন একসঙ্গে খোলা রেখে তিনি ছবি এঁকেছেন। শিল্পরচনার সময় শিল্পীকে যে সব নতুন

নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, শিল্পীমনের দিক থেকে তা বিচার করেছেন এবং ছবির মধ্যে সে সমস্যার সমাধান করেছেন। এই করতে গিয়ে একই বিষয়ের ছবিকে তাঁকে বারংবার আঁকতে হয়েছে অথচ কোন ছবিই মূল ছবির হুবহু নকল হয়নি। তাঁর বিশ্লেষণী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল এই ছবিগুলি।

তাঁর প্রথমদিকের আঁকা ছবিগুলি মূলতঃ রেখাপ্রধান, যদিও তা পটের ছবির রেখা নয়। রঙ সেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পরবর্তী যুগে রঙের ব্যবহারে তিনি অনেক মনোযোগী ও সতর্ক। ইম্প্রেসনিস্ট পদ্ধতিতে তিনি কিছু দৃশ্যচিত্র রচনা করেছিলেন। দূরের দৃশ্য, রঙ ও আলোর মধ্যে সম্বন্ধটি তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে চিত্রে রূপায়িত করেছেন। ফলে ছবিগুলি রঙ প্রয়োগের এক আশ্চর্য নিদর্শন হয়ে আছে।

চিত্রসমালোচক শ্রীঅশোক মিত্র তাঁর শেষের দিকের ছবিতে রঙ ব্যবহার সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—গত পাঁচ বছরের কাজে পাওয়া যায় তাঁর রঙ সম্বন্ধে নতুন করে সচেতনতা। এতদিনের কাজে বর্ণ শিল্পী হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যেত না। রঙকে তিনি প্রতিমা (image) ও ভাবাবেশ আমেজের কাছে গৌণ করে দিতেন। কিন্তু গত কয়েক বছরের কাজে দেখা যায় রঙ ও আলো সম্বন্ধে অদ্ভুত তাগিদ, দেশী রঙের ব্যবহারে মনে হয় যেন তিনি ইউরোপীয় মহারথীদের চিত্রের স্নিগ্ধ, স্থির উজ্জ্বল অনুভূতি, বনেদী কমনীয়তা ও ইংরেজীতে যাকে বলে প্যাটিনা আনতে চান।

ভারতবর্ষের শিল্পসরস্বতীর দুই রূপ। একদিকে তাঁর রাজেন্দ্রাণী, তাঁর গাম্ভীর্য ও বহু বিচিত্র মহিমা নিয়ে ধরা দিয়েছেন আমাদের মাটির ঘরে মায়ের মূর্তি নিয়ে। প্রদীপের স্নিগ্ধ প্রভায় বিকীর্ণ হচ্ছে তাঁর মুখমণ্ডলের ধৈর্য, স্নেহ ও প্রশান্তি।

যামিনী রায় এই প্রান্তীয় শিল্পীকুলের শেষ মহত্তম প্রতিনিধি।

পরিতোষ সেন

যামিনী রায় এবং ক্যালকাটা গ্রুপ

আমার এ ছোট্ট নিবন্ধটি এমন একটি সন্ধিক্ষণের কথা বলে শুরু করব যখন পরপর কয়েকটি ভুবন-কাঁপানো ঘটনা প্রত্যেক বাঙালীর চেতনায় এক নিদারুণ আঘাত হেনেছিল, যে-আঘাতের ফলে এখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল যে, এ-জগৎ কি আর কোনোদিন আগের মতো দেখাবে? বাস্তবে ঘটেছিল তাই-ই। তখন চারিদিকে দাউ-দাউ করে জ্বলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল। গান্ধিজীর "কুইট ইণ্ডিয়া"র ডাকে সারা ভারতে ভীষণ তোলপাড়। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ আসামের মণিপুর অঞ্চল দখল করে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে আসছে। এই সময় ব্রিটিশ শাসকবর্গের নির্মম চক্রান্তের ফলে এমন ভয়ানক এক মন্বন্তর দেখা দিল যার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলার গ্রাম-গঞ্জে এবং এই মহানগরীর পথেঘাটে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ অভুক্ত লোক অযথা প্রাণ হারাল। কল্লোলিনী কলকাতার আকাশে বাতাসে তখন একটিই রব, একটিই আর্তনাদ, "ফ্যান্ দাও ফ্যান্ দাও"। এই ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক মুহূর্তটির কথা এ-জন্যেই পড়ছি যে এমন সব মুহূর্তেই মানুষের মূল্যবোধের ওলট-পালট ঘটে সামাজিক এবং সংস্কৃতিক জীবনে অবশ্যাম্ভাবীভাবে আনে পরিবর্তন। উনিশ'শ চল্লিশ থেকে নিয়ে একটানা "দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" পর্যন্ত (দেশ বিভাগের মর্মান্তিক পরিণামের কাহিনীর কথা এখানে নাই পড়লাম, বাঙালির জীবনে এক মহত্বপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয় কাল।

মানব সমাজে এমন কিছু লোক জন্মলাভ করে থাকেন যাঁদের মনকে এক ধরনের ঘটনা বিশেষভাবে নাড়া দেয়, তাঁদের মনে ঘোরতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেহেতু শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, বাদক, নর্তক এবং এ ধরনের অন্যান্য সূক্ষ্ম

অনুভূতির লোকেরা অন্যদের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল, সেহেতু মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা তাদের মানসে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁদের নতুন অভিব্যক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে নতুন মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে, নতুন সৃজনী শক্তির তাড়না তাঁদের ঠেলে দেয় অজানা পথের দিকে।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমার প্রজন্মের শিল্পীরা স্বভাবতই কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। (১) এ অভূতপূর্ব সামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পকলার কোনও ভূমিকা আছে কি না। যদি থাকে তার নির্দিষ্ট আকার কী হবে? (২) এ নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় শিল্পকলায় আনতে হবে এক গতিশীলতা। এ অভাব মেটাতে হলে যে-নতুন নান্দনিক মূল্যবোধ এবং দৃষ্টির প্রয়োজন তা পাবার উদ্দেশ্যে কোন দিকে চোখ ফেরাতে হবে? (৩) সার্থক শিল্প কর্মে শিল্পীরা নতুন সামাজিক বাস্তবতা কিভাবে প্রতিফলিত করবেন? যেমন চোখে দেখছেন তেমনই? না অন্য কোনও বিকল্প আছে? যদি থাকে তার চেহারা কী হবে? (৪) সর্বোপরি ফর্ম এবং কনটেন্টের মেলবন্ধন ঘটানো যায় কী করে?

এই সময় প্রদোষ দাসগুপ্তের ১৯০/বি রাসবিহারী অ্যাভেনুর স্টুডিওতে এসব প্রশ্ন নিয়ে অনেক বৈঠকি আলাপ আলোচনা চলত। শিল্পী বন্ধুরা, যেমন সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, এবং বর্তমান লেখক, এসে প্রায়ই যোগদান করতেন (পাঠকদের জানিয়ে রাখি যে এ আলাপ-আলোচনাকালেই ক্যালকাটা গ্রুপের গোড়াপত্তন হয়)। এইসব বৈঠক এই স্টুডিওর সীমা ছাড়িয়ে কখনো কখনো বিস্তৃত হত, বিষ্ণু দে, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, রথীন এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং নীরদ এবং কমল মজুমদারের বাড়িতে। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্র এবং কমল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এইসব বৈঠককে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় সরস করে তুলতেন। (যতদূর মনে পড়ে, এই সময়ই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর "মধুবংশীর গলি", "নবজীবনের গান" ইত্যাদি গীতিকাব্যের সুর রচনা করেছেন, যে-গীতিকাব্যে তিনি ফর্ম এবং কনটেন্টের মেলবন্ধনের চমৎকার একটি নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন এবং যে-নিদর্শন অনেককেই তখন উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছিল)। যাই হোক এসবের মধ্য দিয়ে কিছুদিনের ভেতর কয়েকটি সত্য আমাদের কাছে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে। সেগুলো ছিল অনেকটা এইরকম। (ক) ইম্প্রেশনিস্ট, পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট এবং ফোবিস্ট (Fauvist) শিল্পীদের ছবিতে বিশেষ করে এই শেষোক্ত শিল্পীদের ছবিতে, রঙের মুক্তি। (খ) বিষয়বস্তুর ন্যূনতম প্রাধান্য (যেমন সেজানের আপেল, ভ্যানগখের চেয়ার কিংবা ছেঁড়া বুট জুতো ব্রাকের পাইপ এবং কফিপট ইত্যাদি)। (গ) বস্তুর বাইরের খোলসটি নয়, তার ভেতরকার বাস্তবটিকে (inner reality) অর্থাৎ তার ফর্মাল গুণটিকে চিত্রপটে তুলে ধরা।

(ঘ) আঙ্গিকের অর্থাৎ ফর্মের গভীর তাৎপর্য (ঙ) কিউবিজমের বিপ্লবী ভূমিকা। (চ) এবং পোস্ট-কিউবিস্ট শিল্প যে সম্পূর্ণ আঙ্গিক সর্বস্ব এ সত্যটির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। এক কথায় শিল্পকলার মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন। এ "নূতন" মূল্যবোধের কয়েকটি প্রধান অঙ্গ হল এই—প্রথমত ছবির সমতল (flat) জমি। দ্বিতীয় রেখার প্রাধান্য। তৃতীয়ত স্পেসের (Space) বিভাজন এবং চতুর্থত—যে কথা একটু আগেই বললাম—দৃশ্যমান জগতের ভেতরকার বাস্তবকে উদ্ঘাটন করার দিকে ঝোঁক। এসবের কিছু কিছু যে আমাদের ধ্রুপদী এবং লোকশিল্পেরও বৈশিষ্ট্য ছিল সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে কোনও বিলম্ব হল না। আমাদের প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে তখন আরেকটি প্রশ্ন মহত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। সেটি হল এই "নূতন কঠিন সামাজিক বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বেঙ্গল স্কুলের পেলবতা এবং কাব্যিক ছন্দোময়তা (lyrical grace) আমাদের প্রয়োজন কতটা মেটাতে পারবে?"
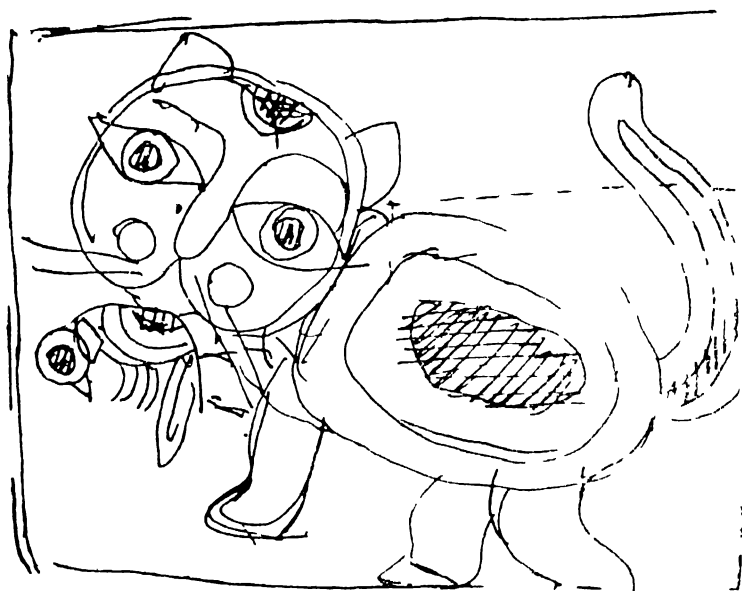
যামিনী রায় তখন তাঁর সৃজনীশক্তির তুঙ্গ ছুঁই-ছুঁই করছেন। একদিকে—স্বদেশিয়ানা, অন্যদিকে আধুনিকতার তাগিদে নতুন আঙ্গিক এবং নতুন অভিব্যক্তির অক্লান্ত খোঁজ—এ দুয়ের চাপ থেকে তখন তিনি মুক্ত এবং স্বকীয়তায় ভরপুর। একদিকে আঁকছেন নানা আঙ্গিকের ছবি অন্যদিকে গড়ছেন মূর্তি—কখনো কাঠ কেটে, কখনো বা মাটি দিয়ে। এই মূর্তি গড়ার কাজ স্বল্পস্থায়ী হলেও কোনওমতেই তাদের নগণ্য বলা যায় না। ছবি আঁকতে আঁকতে মূর্তি

গড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার পেছনে থাকে এক অদম্য তাগিদ যা বস্তুর ফর্মকে শুধু ফ্ল্যাট জমিতে না দেখে তার চারপাশে ঘুরেফিরে আরও ভালো করে জানতে এবং বুঝতে সাহায্য করে। এইসব ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু নিতান্তই তুচ্ছ বলা যায়—টুপী মাথায় সাহেব, মুখে তাঁর সিগারেট, কিংবা নগ্ন পুরুষ ও নারী মূর্তি, কখনো বা টোটেমের আকারের ঢেউ খেলানো উল্লম্ব ফিগর। কিন্তু যেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা হল, চোখে দেখা বাস্তব থেকে অনেকটা সরে গিয়ে বস্তুর ভেতরকার স্বরূপের (inner reality) বিকাশ। এটা স্পষ্টতই ফর্মালিস্ট তদন্তের প্রতিফলন এবং তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন অতি সরলীকরণ অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাকশনের সাহায্যে এবং বলা বাহুল্য, এই অ্যাবস্ট্রাকশন তাঁর ছবির ফর্মাল মূল্যবোধেরও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর গড়া মূর্তির, বিশেষ করে কাঠের মূর্তিগুলোকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় তিনি সমকালীন য়ুরোপীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। তাঁর সেন্সিবিলিটির একটি অংশ যে এ যুগের য়ুরোপীয় শিল্পকলার মূল্যবোধে লালিত হয়েছিল সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। যে চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি তাঁর য়ুরোপীয় অ্যাকাডেমিক কায়দায় আঁকা পোর্ট্রেট এবং ল্যান্ডস্কেপ থেকে সরে এলেন, তাঁর পেছনে যে-দুটি জিনিসের মহত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল—আমার মতে, তাহল এই—একদিকে ফর্ম-চেতনা এবং রঙের মুক্তি, অন্যদিকে বুদ্ধির (ইনটেলেক্ট) প্রয়োগ। এ যুগের য়ুরোপীয় শিল্পকলার, বিশেষ করে পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট এবং ফোবিস্ট শিল্পীদের কাজের সঙ্গেই নয় পূর্ব য়ুরোপীয় এবং বাইজেন্টাইন মোজাইক চিত্রকলার সঙ্গেও তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। অবনীন্দ্রনাথ, তথা বেঙ্গল স্কুল। এক সময় চীন-জাপানের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু যামিনী রায় দেখলেন যে, এ-যুগে শিল্পকলার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী যা কিছু ঘটেছে তা চীন-জাপানে নয়, ঘটেছে পশ্চিম য়ুরোপে। কিন্তু তাঁর নতুন পথের যাত্রায় তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, উভয়কেই জানবার এবং বোঝবার চেষ্টায় কোনও কসুর করেননি। (তাঁর কৃত কয়েকখানা বড় জাপানি চিত্রের কপি এখনও রাখা আছে)। যাই হোক, তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রায় চারিদিক পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন এই বঙ্গভূমিতেই এবং এই "হোম্-কামিং" এর ফলে তিনি এবং তাঁর শিল্পকলা, তথা সমগ্র দেশ, কীভাবে লাভবান হলেন তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদের মতো নবীন শিল্পীদের চোখে যামিনী রায়ের শিল্পকলা তখন এক তাজা বসন্তের রূপে দেখা দিল—নানা ফর্মের, নানা শৈলীর, নানা বর্ণের সে কী বাহার! আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁর ছবি এবং মূর্তিতে প্রচুর আধুনিকতার ছাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি বেছে নিলেন রামায়ণ, যিশুর জীবন, বাউল-বৈষ্ণব-বাউরি, সাঁওতালি জীবন, মাতৃমূর্তি ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল এই মহানগরীর বাসিন্দা হয়েও তাঁর ছবিতে নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার কোনও ছাপই রইল না। (তিনি তাঁর পুরোনো বাসস্থান বাগবাজারের স্যাঁতসেঁতে গলি, গঙ্গার দৃশ্য ইত্যাদির কিছু নিসর্গচিত্র এঁকেছিলেন বটে। একথা জানা সত্ত্বেও এই মন্তব্যটি করলাম, কারণ, আমার কাছে এগুলো তাঁর সেরা কাজের মধ্যে পড়ে না)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, তাঁর চিত্রে সময় স্তব্ধ হয়ে আছে। একদিকে তাঁর বৈষ্ণব মন. অন্যদিকে অপরিচ্ছন্ন কিম্ভূতকিমাকার সমস্যা জর্জরিত নাগরিক জীবনের চাপে যে-শাশ্বত ভারত দ্রুত বিলীয়মান হচ্ছে তার প্রতি অদম্য আকর্ষণ থাকা হয়তো তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমরা যাঁরা তাঁর উত্তরসূরী। কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবৃত নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতায় লালিত পালিত, এবং নানা ভুবন-কাঁপানো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁদের কাজে তা কোনও না কোনওভাবে প্রতিফলিত হবে, সেটাও স্বাভাবিক নয় কি।

যামিনী রায়ের শিল্পকলায় ফর্ম সচেতনতা এবং রঙের মুক্ত ব্যবহার, শৈলীর বৈচিত্র্য—এসব কিছুই আমাদের নানাভাবে আকর্ষণ এবং উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁর আরেকটি দিক, যথা আলঙ্কারিক গুণ, ডেকরেটিভ কোয়ালিটি

আমাদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। বলা বাহুল্য এ গুণ তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু এবং ফর্মের সঙ্গে বেশ মানানসই ছিল বলা যায়। পক্ষান্তরে, ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের কাজ ছিল পুরোপুরি অলংকার বর্জিত। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাঁদের বিষয়বস্তু ছিল সামগ্রিক নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং যে-সব বিষয়বস্তু—যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলমান এবং রাজনৈতিক দাঙ্গা, নিপীড়িতদের শোষণ ইত্যাদি—এক বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির দাবি রেখেছিল। (যে-সব পাঠকেরা গোপাল ঘোষের আঁকা গাছপালা ফুলের ছবি দেখে অভ্যস্ত, তাঁদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানেন না যে তিনিও সেসময়কার মারপিট দাঙ্গার ছবি এঁকেছিলেন এবং যে-সব ছবি উইলিয়ম আর্চার তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহভুক্ত করেছিলেন)। এ দাবি মেটাতে যে-ধরনের ফর্মাল ইনোভেশনের প্রয়োজন হয়েছিল, তাতে করে অনিবার্যভাবে এই গ্রুপের শিল্পীরা, যামিনী রায়ের মতোই তাকিয়েছিলেন একদিকে দেশজ ঐতিহ্যের দিকে অন্য দিকে, আধুনিক ফরাসি শিল্পকলার নতুন মূল্যবোধের দিকে, এবং এদুয়ের মিলন ঘটিয়েছিলেন বুদ্ধির ইনটেলেক্ট সাহায্যে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবেই। নিছক নতুনত্বের খাতিরে নয়। তাছাড়া, যেহেতু তাঁদের পূর্বসূরিদের তুলনায়, এই গ্রুপের শিল্পীদের ওপর জাতীয়তাবাদের চাপ কম ছিল সেহেতু, এই লেনদেন ঘটাতে তাঁবা কোনই লজ্জাবোধ করেননি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মূল্যবোধের এই মেলবন্ধনের কাজের নেপথ্যে ছিল যামিনী রায়ের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্বন্ধে যে-সব কথা একটু আগে বললাম, তার থেকে পাঠকদের মনে এমন কোনও ধারণা যেন না জন্মায় যে, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা শুধু মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকেই তাঁদের শিল্পকলায় প্রতিফলিত করতে আগ্রহী ছিলেন। হাসি এবং কান্না—এ দুই বিপরীত মিলেই মানুষের জীবন—এ সত্যটি তাঁরা কোনওদিন অস্বীকার করেননি।

ক্যালকাটা গ্রুপের অবদান কী এবং কতটুকু, সে বিচার কালই বিচার করবে। কিন্তু একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের দাবিতে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা যে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিয়েছিলেন, সে-কথা কী আর অস্বীকার করা যায়! এবং এও অনস্বীকার্য যে, এ সাড়া দেয়ায় যামিনী রায়ের শিল্পকলা আমাদের কম প্রেরণা জোগায়নি।

গণেশ পাইন

স্বেচ্ছায় তিনি স্রোতের বিপরীতে

আপাতদর্শনে যামিনী রায়ের ছবি যেন লাবণ্যের খনি। নিরীক্ষণে বোঝা যায় সে লাবণ্যে প্রাচীন স্তব্ধতা আছে। কেননা নিপাট এক জ্যামিতিক নকশা তাঁর প্রতিটি পটের নেপথ্যে সদা উপস্থিত। ফলে সামগ্রিকভাবে তাঁর ছবি এক বিশুদ্ধ বিন্যাস, পাশ্চাত্য অভিধায় যাকে Purism বলা চলে। ছ'টি মাত্র রঙে তাঁর বর্ণিকাভংগ, ছবির ত্বক কিছুটা কর্কশ। রেখার গতিই সে ছবির প্রাণসম্পদ, অনুধাবনের প্রধানতম বিষয়। সেসব রেখার সংকেতময় ঘনত্ব আছে যা' দৃষ্টিকে সর্বাধিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর রেখার চলন এমনই যে দর্শকের মন ছবির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বহির্দেশে কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না, পটের মধ্যেই আনাগোনা করে, নিবদ্ধ থাকে। পটের কেন্দ্রবিন্দুই সেই রেখারচনার আসল অভীষ্ট। রেখাপাতের এই গুণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এবং তা' ক্ষিপ্রগতি সরলরেখা নয়। পটের ক্ষেত্র যে অবধারিতভাবে সমতল এ তথ্য তিনি সতত স্বীকার করেন, একমাত্র দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থই তাঁর অবলম্বন, বেধের ধারণা তাঁর বিচারে বিভ্রম বৈ অন্য কিছু নয়। দৃশ্যমান ঘনবস্তুকে সমতল পটে বিধৃত করার পাশ্চাত্য কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল। এ রীতিতে শেষ পর্যন্ত তিনি আস্থা রাখতে পারেননি। আকারের সার এ রীতিতে ব্যাখ্যাত হয় না। তাঁর কথায় '…তখনও তো পোর্ট্রেট ছাড়তে পারিনি, পোর্ট্রেট চলেছে—তারপর ইওরোপীয় ধরনের ছবিতে যে তিন ডাইমেনশন, তা' আমি বা তখনকার দিনের কোনো আর্টিস্টের পক্ষে এই তিন ডাইমেনশন কি টু ডাইমেনশন এই সব প্রশ্ন কোনোদিন আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার মনেতে এলো, জানি নে কি করে এলো, যে ফ্ল্যাট (জমি) তাতে কি করে ছবি আঁকা যায়।' এই প্রশ্নেই যামিনী রায়ের সংকট সূচিত হয়।

যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই এমন প্রথাবিরোধী চিন্তা সর্বনাশের সামিল। স্রোতের বিপরীতে যে সাঁতার তাতে দারুণ দুঃখ আছে। যামিনী রায় সে দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। সে এক প্রসিদ্ধ ইতিহাস। করতলগত আমলকের মত যে সিদ্ধি তা' তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, কঠিন দারিদ্র্য সে হঠকারিতার প্রতিশোধ নিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। মনে করি এমন হাহাকারেও জগৎ এবং জীবন তার সমূহ সম্ভার দিয়ে প্রকট থাকে এবং রূপকারের পক্ষে রূপ রচনা ব্যাতিরেকে অন্য 'গতি থাকে না। অনুমান, যামিনী রায় এমনই এক নিঃসঙ্গ যাত্রায় ভিন্নতর পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন বিলেতি ঘরানার নিবাপদ আশ্রয় পরিত্যাগ করে। সে অন্বেষার কাহিনীও বহুবিদিত।' জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেব পৃষ্ঠপট থাকা সত্ত্বেও তাঁর মনে বিশুদ্ধ কোনো চিত্রভাষার ভাবনা বাসা বেঁধেছিল যা' দেশকালনিরপেক্ষ। অবনীন্দ্র প্রবর্তিত স্বদেশী রীতি থেকে আরম্ভ করে চৈনিক, বাইজানটাইন, ইমপ্রেশনিজম্ এবং তৎপরবর্তী প্রতীচ্য শিল্পের আধুনিক অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর সন্ধানের ক্ষেত্র। সম্ভাব্য সব পাথরই তিনি সরিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁর সাফল্য আসে, তখন তিনি বহুলাংশে পরিণত, আত্মপ্রত্যয়ী।

যামিনী রায়ের ধর্মক্ষেত্র যদি বাঙলার পল্লীগ্রাম হয় তবে তাঁর কুরুক্ষেত্র এই কলকাতা। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে তাঁর রূপচেতনা ও জীবনবোধের উন্মেষ। প্রাচীন এক পরম্পরা তাঁর পরিবেশে ছিলই। কুম্ভকারের বর্তন থেকে মন্দিরে লগ্ন টেরাকোটায়, ব্রতপার্বণের আলপনা থেকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দশভুজায় ব্যাপ্ত এক যুগাতিশায়ী শিল্পচর্যার তিনি সাক্ষী। বাঙলার সদর সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় সেই ট্র্যাডিশনের আবাহন করতে চেয়েছিলেন যামিনী রায়। সে কাজ সহজে হয়নি। বলেছেন 'আমাকে রাস্তা খুঁজতে নিজের মধ্যেও অন্বেষণ করতে হয়েছে···তা'তে সংকল্প ছিল একটিই, না ঐ রকম চেহারা হবে নি—ছবি ভালো কি মন্দ তা' আজও আমার সংকল্পের মধ্যে নয়। আমার সংকল্প হচ্ছে

চেহারাটি আলদা হোক।' এ যেন তৃতীয় ভূমির ভাবনা—যা' সরকারি আর্টস্কুল বা ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির আওতাভুক্ত নয়। ছবির যে চেহারা শহরে নিতান্ত চেনা তার থেকে ভিন্ন কোনো আদল সহজে নাগরিকের মন কাড়ে না। তিনিও তাঁর সংকল্পে অটল থাকেন। একটি চিঠিতে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন 'শ্মশান না হলে শবসাধনা হয় না। প্রত্যেক সাধনায় সাধনপীঠের প্রয়োজন হয়। এ যুগের কলকাতাই হ'ল সাহিত্যের শিল্পের সাধনপীঠ। এখানে আসুন, কষ্ট করুন, একবেলা খেয়ে থাকুন, তবে পাবেন।'

পটচিত্র যামিনী রায়কে অবশ্যই প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু তাঁর ছবি পটচিত্রের অসংস্কৃত তারুণ্য থেকে অনেক দূরে। আকারের বিশুদ্ধতা বিষয়ে যামিনী রায়ের যে মনস্কতার কথা বলা হয়েছে তা' আধুনিক চিত্রকলার এক উচ্চকোটি প্রত্যয়। অন্যপক্ষে আধুনিক প্রতীচ্য শিল্পে আদিম রূপকলার যে বিপুল ভূমিকা, যামিনী রায়ের একক প্রচেষ্টার অন্তরালে এদেশের পটচিত্র অনুরূপ ভূমিকা পালন করে।

দুনিয়ার তাবৎ শিল্প দুটি ভাগে বিভক্ত, একটি ভারতীয় এবং অন্যটি অভারতীয়—এমন মত যামিনী রায় পোষণ করতেন। সম্ভবত ভাবের চরিত্র বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত করেছিলেন তিনি। যা শান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, গভীরভাবে সংহত এবং কেন্দ্রমুখীন, তা-ই হয়তো তাঁর মতে ভারতীয় মৌলিকতা। এখানে সমতা আছে, জীবনবিমুখতা নেই। ভোগ আছে, নেই ভোগের গ্লানি-সঞ্জাত ঘৃণা। ছবি দেখে মনে হয় তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধির মূল এদেশের ধর্মবোধের গভীরে প্রোথিত। সামঞ্জস্য আর সংযম সে বোধের অন্যতম লক্ষণ। তাঁর ছবির বুনন এমনই ঘনবদ্ধ যে, পট থেকে একটি বিন্দুও চ্যুত হলে ভারসাম্য চুরমার হয়। এ গুণ একান্তভাবে স্থাপত্যের অনুগত। যা আশ্চর্য করে তা' এই যে, প্রায় গাণিতিক কৌলিন্য সত্ত্বেও তাঁর জগৎ একান্তভাবে মৃত্তিকাশ্রয়ী, মানবসম্পৃক্ত। নারী তাঁর ছবির অবিরল বিষয়। কখনও সে কল্যাণী, কখনও প্রগল্ভ যৌবনা মোহিনী। পুরুষেরা শ্রমনিষ্ঠ, বলবান। বাবুরা আছেন, সালংকার অশ্বে কিংবা গজে যাঁরা সপারিষদ সওয়ার অথবা আরাম কেদারা বিলাসী। কতভাবে এঁকেছেন সেই কৌমারহর মুরলীধরকে

অথবা সেই নদীয়া নাগরকে। তাঁর রাম বনচারী—দেখে মনে হয় কোনো ধনুর্ধর মুনি, ক্ষত্রিয় নন। মহাভারত বুঝি তাঁকে আকর্ষণ করেনি, বুদ্ধের সাক্ষাৎও মেলে না। সম্ভবত মনোভাবে তিনি বৈষ্ণব, রণরক্ত অথবা বীতরাগ সন্ন্যাস তাঁকে উদ্রিক্ত করে না। যিশুখ্রিস্ট অপাব করুণা নিয়ে বহু পটে অবতীর্ণ, জেরুজালেম যাত্রাব আবহ একান্তভাবে স্নিগ্ধ নিরুদ্বেগ—যেন এক বিষণ্ণ পবিত্রতা। আসন্ন অমঙ্গলের কোনো সংকেত সেখানে দেখি না।

অভিযোগ আছে যামিনী রায়ের ছবি সমকালীন সমাজের প্রত্যক্ষতা এড়ায়। তাঁর এই উদাসীনতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চুপ। আমার ধারণা, তাঁর চিত্তে কোনো ধ্রুবোধ ছিল যা সংরক্ষণ কবেছেন স্থবিরের মতো। সব শিল্পীই শেষ পর্যন্ত এক স্থায়ী সৌন্দর্যের সন্ধান করেন যা' প্রকৃতির সমগ্র সৃষ্টিকর্মের অন্তর্গত রহস্যে নিহিত থাকে। দ্বন্দ্ব এবং বিকার যখন শিল্পীর একক চেতনায় সংহত হয়, সমসূত্রে গ্রথিত হয়, তখনই তিনি এক অবিচল চিত্রাদর্শের অধিকার পান। এই আদর্শ এমনই এক নিত্যবোধ যা দোলাচলকে প্রশ্রয় দেয় না। এহেন চিত্রাদর্শ যামিনী রায়কে আমৃত্যু উজ্জীবিত বেখেছে। এটি তাঁর প্রত্যয়ের বস্তু। তাঁর ছবিতে বৈচিত্র্য নেই, এ অভিযোগও আছে। বৈচিত্র্য যদি করণকৌশলঘটিত কাণ্ড হয়, সে বৈচিত্র্যে তাঁর আগ্রহ ছিল না। কেননা একমাত্র আংগিকই তাঁর সর্বস্বধন নয়। তাঁরই কথায় 'টেকনিক এবং তাব সঙ্গে মানুষটি, তার মনটি, এসব নিয়ে তবে একটি জিনিষ প্রকাশিত হয়।' টেকনিক বদলানো তাঁর পক্ষে সাধ্য হলেও মন বদলানো সম্ভব ছিল না। এ নিবিখে তিনি স্থাণু। যামিনী রায়ের জনপ্রিয়তাও তুলনা রহিত। জনপ্রিয়তার অনিবার্য মূল্য যে banality, তাও তাঁকে কবুল করতে হয়েছে দীর্ঘ কর্মজীবনের কোনো পর্যায়ে। এ-ও জানা চাই যে, যামিনী রায়ই আমাদের দেশে সঠিক অর্থে প্রথম পেশাদার চিত্রকর। বৃত্তিকে তিনি ধর্ম বলে জানতেন। কঠিন শ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ছিল তাঁর অন্ন, তথা অস্তিত্ব। এদিক থেকে উত্তরকালের শিল্পীরা তাঁর দৃষ্টান্তে কিছু শিখে থাকবেন।

মাত্র পনেবো বছর আগে তাঁর দেহান্ত হযেছে। এটুকু সময় এমন দূরকাল নয় যে নতুন করে তাঁর পরিমাপ করতে হবে। তাঁব রচিত সেই বিস্তৃত জগৎ, যা সবল এবং কমনীয়, যা শান্ত এবং উজ্জ্বল—সে জগৎ এতটুকু সময়ে ধূসর হওয়ার নয়। সেখানে তিনি স্বমহিমায় জীবিত আছেন।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী যামিনী রায়ের ছবি

যামিনী রায়ের ছবি বলতেই একটি স্পষ্ট আদলের সারল্য সহজাত ভাবে আমাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এই সারল্যে বন্যতা আছে কিনা সে কথা পরে' কিন্তু যামিনী রায় বলতে একটি গোটা ধারণার নিটোল আকার প্রতে কের হৃদয়ে, চোখে ভিত পেয়ে গ্যাছে। আর সেইটাই একজন শিল্পীর জীবনে সার্থক সাধনা। সে ছবি কতটা মন্দ কিংবা কতটা ভালো এর বাইরে এসে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

তাঁর ছবির সঙ্গে সমস্ত দেশের একটি বিশেষ তরঙ্গের একটি বিশেষ জীবন বোধের মিল আছে। এই বোধ কিন্তু কেবল নিজের দেশেই বলব কেন? এই বোধ প্রান্তদেশেও বিস্তারিত। একটি মেঠো বাঁশীর সুর শুনলে তার আমেজ জায়গায় জায়গায় ধাক্কা খায় আর সেই ধাক্কা আবার সঞ্চারিত হয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে বিস্তার লাভ করে উজানে দুকুল ধরে।

যামিনী রায়ের ছবির চর্চার মুগ্ধ আলোচনা চলতে পারে, তার ছবির স্বাদের কথা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। রসগ্রহণে ব্রতী হওয়াতেই সমগ্র বা প্রাক জীবনের আলোচনায় এসে দেখতে পাবই কেমন ভাবে এমন একটি ভাব তাঁর সৃষ্টির জীবনে বাসা বেঁধে তাকে পরিচালিত করেছে। তার একটি স্বীকৃতিই সমস্ত ছবির জীবনকে স্পষ্ট করে দেয়। আমার মনে হয় শিল্পী যামিনী রায় সেই-খানেই উদ্ভাসিত ও প্রস্ফুটিত। তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর বাবা বলতেন, "আমাদের সকলের একহাতে যেন বই, অন্যহাতে লাঙ্গল।" এই লাঙ্গল আর শিক্ষা দুয়ের সংমিশ্রণ আবার ব্যবধানেই শিল্পী ও সৃষ্টি সব সারিবন্ধ। আর ঐ ভাবনার চেতনাই সর্বক্ষণ একটি স্থির মানসে অবস্থিতির আশ্বাস দেয় তাঁর কাজে।

যামিনী রায়ের চিত্রঐশ্বর্যে বর্ণের একটি বিশেষ দিক ও তাৎপর্য্য আছে কিন্তু শেষ প্রান্তে এসে যে রঙগুলিকে স্থায়ী ভাবে বেছে নিয়েছিলেন তার থেকে আর সরে যেতে মন সায় দেয়নি এজন্য তাঁকে নানান পরীক্ষা নীরিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ইউরোপীয় চিত্রের আদলে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন ছোপ দেওয়া পদ্ধতির সাহায্যে। তবে একটি স্পষ্টতা লক্ষণীয় যে, যখনই বর্ণ ব্যবহারের তন্ময়তায় মগ্ন হয়েছেন তখনই কিন্তু সবসময় রঙের পরিচ্ছন্নতা তার বিশেষ রঙের বিশেষ উজ্জ্বলতাকে সবসময় বজায় রাখায় সচেষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এই ছবিটি তেল রঙের কিন্তু তার বর্ণ বিভাজন ও প্রয়োগের প্রকরণ একটি বিশেষ ইউরোপীয় ধারাকেই অনুসরণ করেছে। সেখানে কিন্তু সবসময় সনাতনী করণ রীতি ঐতিহ্যকে মেনে নেননি। এই তেলরঙের পদ্ধতিকে তিনি জলরঙের ভেতর দিয়ে আনতে যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার প্রচুর নিদর্শন তাঁর কাজের মধ্যেই আছে। নানাব রঙের চৌখুপি ছোপের সৃষ্টি করেছেন আবার কোথাও কোথাও প্রয়োজনে তার উজ্জ্বলতাকে নিষ্প্রভ করার জন্য আলতো পাতলা সাদার আস্তরণ দিয়েছেন বিছিয়ে। তাঁর প্রথম যুগের কাজের মধ্যে এমন ধরণ দেখা গেছে। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে স্থির বর্ণচ্ছটায় দাঁড় করাতে সময় নিয়েছেন। ধীরে ধীরে, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করার, যখন তিনি বর্ণ বিভাজনকে একটি ঘন সমান্তরাল আস্তরণে ঢেলেছেন; সেখানে রঙের কম বেশীর পরতের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। এবং আর একটি বিষয়ও দৃষ্টির দিক, তাহল, বিষয় অনুযায়ী কোথাও কোথাও নকসাকারী কাজের নমুনার অবতারনা করেছেন আর যে নকসাগুলির চেহারার সঙ্গে বাংলার ব্রতকথার আলপনার সাযুজ্যতা লক্ষণীয়। এই ধরনের নকসার ক্ষেত্রে নিজের খোঁজাকে ব্যস্ত হতে দেননি। বিষয় নির্বাচনের বিষয়ে শিল্পী সবসময় বহুমানুষের বা
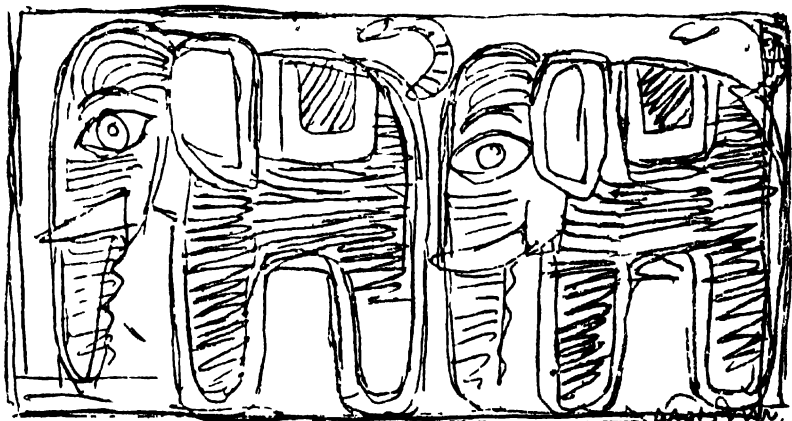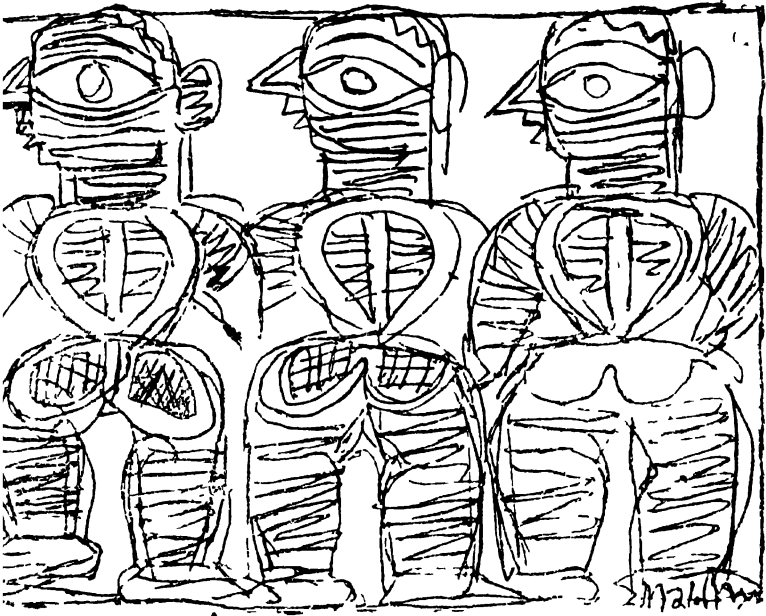
ভীড়ের সমাবেশকে পরতে পরতে ধরার থেকে সামনা-সামনিই ধরেছেন। কৃষ্ণলীলা কিংবা রামায়নের বিগ্রহগুলি এইভাবেই শিল্পীর পটে জায়গা করে নিয়েছে। বিষয়ের আর একটি আকর্ষণ বৈষ্ণবভাবনার চিত্র রূপান্তর। এরকারণও মল্লভূমের বৈষ্ণব চর্চাও বাতাবরণ। তাছাড়া একটি বিষয়ে স্পষ্ট তাহল বৈষ্ণব ধর্মীয় চর্চার সঙ্গে লোকায়ত সৃষ্টির নজীরগুলির সঙ্গে সম্পর্ক। এই লীলায়িত ভক্তিরসের অনুধ্যানের সঙ্গে শিশুকালের সম্পর্ক যা বাঞ্ছিত ভাবেই শিল্প সৃষ্টির পটে জায়গা করে নিয়েছে অবচেতনে ও অবলীলাক্রমে।

যামিনী রায়ের শিল্পকলার চরণে একটি স্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ তাহল সরলীকরণের যে ঐশ্চর্য্য শিল্পীর মনে এবং প্রকাশে বর্ত্তমান তা কিন্তু ঐ লাঙলের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের যে প্রভাব।

লোকায়ত শিল্পে শিল্পীদের পারঙ্গমতার একটি নিদর্শন গতি পথ ছিল ও আছে। অনেক ক্ষেত্রে কেন প্রায় ক্ষেত্রেই রূপকের সাহায্য ও আদায়ের সঠিক মাপের অকুলান। কিন্তু এই অকুলান ক্ষমতার অভাবটুকু ভাবনার সরসতায়, কৌতুহলে ও প্রকাশ্যের লালিত্যে কখনই দৃষ্টিকটু না হয়ে দৃষ্টি শোভন ও অনাবিলতার সারল্যে ভরে গেছে। যামিনী রায়ের চিত্রে রেখা রঙ দুই পঠনপাঠন শিল্পশিক্ষার একটি বিশেষ ছাপ বর্ত্তমান। তিনি এই শিক্ষিত শিক্ষার পারঙ্গমতাকে ঢেলে সাজাবার নিরন্তর সাধনা করেছেন। মাটির স্পর্শের

সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে শিল্পশিক্ষাগত দৃষ্টির অন্বেষণ। এই অন্বেষার নবীনতা শিক্ষার এক বিশেষ পরিচয় চিরদিনের জন্য ভারত শিল্পে গ্রথিত হয়ে গেলো। সেই নবীনতার সজীবতাই আজও পটলচেরা চোখ আর বিশেষ রেখার অনুকৃতিগুলি মানুষ শিল্পীকে চিনে নিতে ভুল করে না। অনেক ক্ষেত্রে লোকায়ত শিল্পের মধ্যে এই ধরণের রেখা ও রঙের প্রয়োগ ঘটতে দেখলে আমরা যামিনী রায়কেই স্মরণ করি। অথচ দুটি প্রান্তের সত্যকে চিনে নিতে সচেষ্ট হইনা। তাঁর ছবিগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে আমি সেই সব ছবির কথাই বলতে চাই যেগুলির আদলগুলি একমাত্র তাঁর বাস্তুই বহন করে। যে ছবিগুলিতে সে প্রভাব সে ভাষা অবর্তমান সেগুলি আলোচনার মধ্যে আনতেই চাই না। কারণ আমার আলোচনা যামিনী রায়ের ছবি নিয়ে। যে ছবি দেখে তার কথা স্মরণ না হয় সেগুলিকে এ পর্যায়ে সংযুক্ত করা চলে না। কারণ আমরা সেই যামিনী রায়কেই দেখতে চাইছি যার সঙ্গে রসিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা সেই শিল্পীকেই পটের মাঝে বিচরণ করতে দেখতে চাই যে ভূমিতে মানুষ তার নিত্য দিনের ভাবভালবাসার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই খেলা করছে।

বর্ণ প্রয়োগের বিষয়ে তাঁর "বিষয় চিন্তার সঙ্গে", অনেক সময় এক করে ফেলি। দিশী ভাষায় ছবি আঁকতেন দিশী মানুষদের ছবির পটে বসতে দিতেন—বিদেশীদেরও যখন স্থান দিয়েছেন তাও দিশী চোখের সম্মতিতে, সেই দিশীপনার সঙ্গে করণ কৌশল প্রয়োগের সবই তাই ছিল এমন নয়। বর্ণ ব্যবহারের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে যে ভিন দেশী বর্ণ ব্যবহার করেননি এমন নয়—ছবির ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন ঘটেই—কেবল দিশী রঙের ব্যবহার করেছেন এই উক্তিতে শিল্পীকে আরও ঐশ্চর্যময় করে তোলার চিন্তাকে ত্যাগ করতে হয়। যামিনী রায়ের বর্ণের ভেতর যা স্পষ্ট তাহল তার গভীরতা ও তার পরিমণ্ডল। আর একটি দিক লাল বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রয়োগের চমৎকারিত্বে নজরটি ভুললে তার বর্ণে স্বাচ্ছন্দ সাবলীল ভাবনা ও সুখসুন্দর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব। তার বর্ণ প্রয়োগের ধারার কয়েকটি অধ্যায় রচিত হয়েছে সমগ্র চিত্রসম্ভারের মধ্যে—এক হচ্ছে হালকা ছোপের মজাকে বজায় রেখে বর্ণের ব্যবহার ও রেখার সংযোজন যেগুলি আকৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় স্টেনগ্লাস ও মোজেইক কাজের একটি আদলের ছোঁয়া, দ্বিতীয় রঙ দেওয়ার পর গভীর রেখায় তাকে বেঁধে দেওয়া। কিন্তু এই গভীর রেখার বাঁধনটির আগে একটি হালকা রঙের সমান্তরাল রেখা চলে গিয়েছে—এই নিকশ কালো রেখার আগে আলতো পরতের রেখার বাহার আমাদের দেশে পটের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অজন্তা শৈলীতে। যামিনীরায়ের রঙীন ছবিতে এইসব কালো রঙের দৌড়গুলি সবসময়ই সংযমীও সংযত ব্যবহার করেছে আর তারা চলেছে নির্দেশিত চালেই। তাঁর এইসব রেখাতে চপল-চঞ্চলতার উচ্ছ্বাস নেই। এবং এও দেখবার, রেখার গতি দেখে

দেখে মনে হয় রেখা একটি বিশেষ অদৃশ্য রেখার গতিপথের অনুসরণের মাঝেই সচল। দ্বিতীয়তর রেখার মধ্যে সরু মোটা কম বেশীর প্রয়োজন যেখানে হয়েছে সেখানে তুলির করণ কৌশলের চাপে তা করা হয়নি। সেই মোটা রেখাকে আনার জন্য একই তুলিকে বার বার প্রয়োজন মাফিক পরত ফেলতে হয়েছে। লোকায়ত চিত্রকল্পে ব্যবহৃত রেখার সঙ্গে এই বিভিন্নতা থেকেই গ্যাছে।

শিল্পীর রেখাধর্মী কাজের মধ্যে অনেক সময় ছেঁড়া রেখার ব্যবহারও দেখায়। সেখানে রেখার এই বিচ্ছেদগুলি চিত্রে ব্যবহৃত বর্ণ ঘটিয়েছে। সেই কারণে আপাত দৃষ্টিতে রেখার থাকা না থাকার এই ব্যবস্থাতে সুর কখনও কেটে যায় নি। হারিয়ে যাওয়া রেখার স্রোতকে ফিরে পেতে কখনই কষ্ট সাধ্য প্রয়াস চালাতে হয় না। ঠিক ডুব সাঁতার দেবার মত এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন অনেকগুলি আছে যা আমার ভাবনাকে দেখতে সাহায্য করবে।

শিল্পীর তুলির ব্যবহারের সঙ্গে বর্ণের আকারের সীমারেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত। বর্ণ যেমন কেবলমাত্র তার পরিধিতেই উত্তীর্ণ হয়নি তেমন বর্ণিকা চালিত রেখাকেও একাকী চলতে হয় নি। বর্ণ ও রেখা এখানে সমন্বয়যুক্ত যা স্বভাবতই চিত্র ঐশ্বর্যের বড় গুণ। কিন্তু রেখার পরিচয়ের ভিত্তিতে যদি তার ছবি থেকে বড়গুলিকে তুলে নিই তাহলে রেখার সুসংবদ্ধ বাঁধনের ও জমাটের ব্যবধানকে সচল সরবতার আওতার গুণে ফেলা যাবে না। যেকথা আগেই বলেছি যামিনী রায়ের রেখার ও বর্ণের ব্যবহারে কোথাও বেপরোয়া ভাবনা কাজ করেনি তিনি ছবি যখন এঁকেছেন তা মানুষ পাখি গাছ-গাছালি সবই বিশেষ নকসার বুনোটকেই সমৃদ্ধ করে অনুসৃত হয়েছে।

রেখার মাধুর্য্য, চাতুরী ঐশ্বর্য ও সৌর্যের শিষ্টতার উদ্দাম গতি খুঁজে পাওয়ার অসুবিধা আছে। তবে একথা জোর দিয়েতো বলা যাবে না যে তিনি তা করেন নি। কেননা প্রাজ্ঞশিল্পীর অজস্র কাজের মধ্যে এই ঐশ্বর্য্য কোথাও আছে যা আমার দেখা হয় নি। আমার দেখার পরিধির মধ্যেই এই ভাবনা।

কেবল কালোকালি আর তুলির যে চমৎকারিত্বে লোকায়ত এমন কি অজন্তা শৈলীর বিশাল কাজগুলি সুসংবদ্ধ তেমন কাজের নমুনা আমাদের চোখে পড়েনি। অজন্তা শেখাতে বর্ণকে তুলে নিলে রেয়ার মধুর ছন্দময় উচ্ছল গতির একটি শব্দ শোনা যায়—যেখানে সংযম থাকলেও রেখার একটি স্বাধীনতা আছে। রেখাবর্ণের সঙ্গে ওতপ্রোত ব্যস্ততার পরিবেশে সদা চঞ্চল। শিল্পীর যে রেখার কাজগুলি অনবদ্যতা ও অসাধারনীয়ত্বের স্পর্শ সুখে সমৃদ্ধ সেগুলি তার চটজলদী চিত্র ভাবনার খসড়াগুলি। এইসব স্কেচ ধর্মী আকারের মধ্যে সত্যিকারের প্রাণটি চাঞ্চল্যের ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। রেখা তার স্বধর্মিতা নিয়ে পরিপূর্ণ। এমন সাবলীল আঁচড় যার তুলনা কচিৎ কখনও দৃষ্টিগোচরে আসতে পারে। এই রেখাগুলির বিস্ময়তার যে গুণ তা হল,

রেখা কেবল নিস্তরঙ্গ ভাবেই ছোটাছুটি করেনি রেখা তার ভাব-ভাবনা ও আকারের এক নতুন মাত্রার জন্ম দিয়েছে যা একান্তই যামিনী রায়। এই রেখা যূথের আকারের মধ্যেই দেশের মাটির প্রাণের সজীব চাঞ্চল্যের আকর্ষণ লক্ষ্যণীয়। এখানে রেখার সঙ্গে বর্ণ নেই। কিন্তু কোন কারণেই এইসব রেখা বিবর্ণ বলে মনে হয় না। পিতাপুত্র, সচকিত হরিণের থমকে থাকা, মা ও ছেলে এমন অজস্র কাজ আছে যার কোন তুলনা চলতে পারে না। আমার মনে হয় যামিনী রায় যখন রঙিন ছবি আঁকতে বসতেন তখন তাঁর পট তাঁকে সব সময় একটি গণ্ডীর নকসার ভেতর অজান্তে পেঁাছে দিত। পটে কখনই অবলীলাক্রমে সহজ ভাবে বর্ণের মাখামাখি বা রেখা সঞ্চরণে উদ্যোগ দেখা যায় নি। প্রথম দিকের কাজের মধ্যে এর সঞ্চারণ ঘটলেও যে বিশেষ ছবির আদলের জন্য তিনি আমাদের হৃদয় মানসে সেই আদলের ওপর কখনই বিশেষ কোন ইচ্ছার বা তাকে ভেঙ্গে ফেলার বাসনা কাজ করে নি। সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সম্পন্নতার দিকে টেনে নিয়ে গ্যাছে। এই সব ছবি তার নিয়মমাফিক ঋজুতার হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত। বর্ণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বেই বলেছি মূল রঙগুলির প্রতিই তাঁর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ এবং এসব বর্ণগুলির দিকে তাকালে প্রতিমা গড়ার কারিগরদের প্রতিমা রঙকরা কালীন পরিবেশকেই বার বার মনে করিয়ে দেয়। বর্ণ রেখা ও ভাবনা সংমিশ্রণে তাঁর ছবির একটি মায়া আছে। শান্ত স্নেহ শীতল একটি আরাম পরিবেশের সঞ্চার ঘটেছে সব ছবিতে। প্রত্যেক ছবিই কম বেশী স্নেহছায়ার আঁচলে সমৃদ্ধ। আর একটি আচরণ অনুসরণ যোগ্য, তাঁর অন্তর জীবন মানুষের প্রতি ভালাবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। মানুষের বলতে তাঁর চারিপাশের আত্মা জীব-জন্তুও বাদ যায় নি তবে একটি বিষয়ও দেখবার তাহল এসব জীব-জন্তুরা গৃহপালিত, মানুষেরই নিকট জন ও তাদের আচরণ।

মানুষের প্রতি তার গভীর বিশ্বাসের কথা কেবল ছবি বলে না তার অন্তর ভালবাসায় উচ্চারণের শব্দগুলি জানলে আরও প্রতীত হয় বুঝতে পারা যায় এত ভালবাসায় মাখা মানুষ জন প্রাণীরা কেমন ভাবে চিত্র পটে স্থান করে নেয় কি অনন্ত স্নেহ বোধের ধারাব প্রবাহ থাকলে এমনটি পাওয়া সম্ভব কোন প্রবন্ধের প্রস্তুতি হিসেবে নয় কোন বিশেষ লোকের জন্যও নয়-কেবল পত্রালাপ যেখানে একমাত্র মানুষ নিজেকে খুলে দিতে পারে।

"আমার জীবনে, একমাত্র বন্ধুই অন্ন বস্ত্র ঐশ্বর্য যা কিছুই। সম্বল বন্ধুজন। কাজের মানুষের যেমন বাড়ী, ঘর, ব্যাংক, এইসব হোলে সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা তার ধর্ম্ম ও অর্থ আমার অন্য সম্পদ নাই, কাজেই বন্ধুদের মঙ্গল কামনায়, ধর্ম্ম অর্থ দুইই। সেখানে ক্ষতি হলে কষ্ট পাই।" ৯৯/যা/বি। মহাসৃষ্টির পেছনে এমনই একটি মহৎ আত্মা কাজ করে। এই মহৎ আত্মার

অনুসরনেই সৃষ্টি হয় মহৎ কর্ম্ম। বিশ্বাস করা না করার চর্চা চলতেই পারে কিন্তু একটি অন্তর অনুরণণের শব্দকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না।

যামিনী রায়ের চিত্র কথা একটি বিশেষ ধারার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু যে ধারার স্রোতের আর উৎসের সঠিক একটি পথকেও সহজেই চেনা যায়। যে কথা প্রথমেই বলেছি ঐ লাঙ্গল আর বই—কলেজীয় শিল্প শিক্ষা আর লোকায়ৎ সৃষ্টির অসীম তন্ময়তা। এই মিলেই যামিনী রায়। যামিনী রায় কে যাঁরা কেবলই লৌকিক লোকায়ত ভাবনার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করেন তারা ভুল করেন। ঐ বেদীর ভিতেই তিনি নব বিগ্রহের রূপ দান করেছেন। একথা সত্য এই বিগ্রহের বিশেষ বিশেষ আকার অলংকারের সঙ্গে আমাদের চির পরিচিত গ্রামীন লোকায়ত সৃষ্টির মিল আছেই তবু সেই সম্বন্ধ তো সমগ্র জীবনের সঙ্গে। শিল্পীর নিজের ভাবনার একটি অনুভবকে আবৃত্তি করলেই ধরা যাবে কেমন সে কথা—
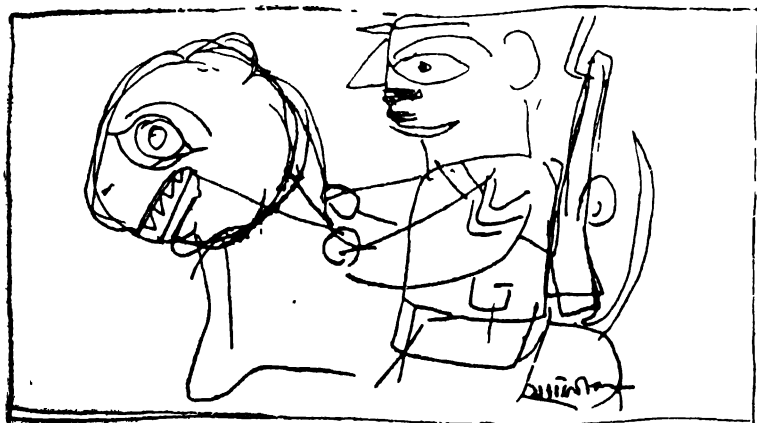
"একহল ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প, আর একহল পালা পার্বনের শিল্প যাকে পোশাকী শিল্প বলা যায়। বাংলা দেশের আটপৌরে ছবি তার পটের ছবি; আর তার পালা পার্বনের শিল্প দেবমূর্তি প্রতিমা ইত্যাদি। এ দুয়ের পার্থক্য স্পষ্ট; প্রথমটিতে প্রসাধনের প্রচেষ্টা নেই, সংস্কারের উৎসাহ নেই। দ্বিতীয় ছবি সংস্কৃত আভিজাতিক।"

এই ভাব বাচনের মধ্যে শিল্পীর চিত্র কর্মের একটি আচরণ একটি নিশ্চিত ধারণাকে গ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

যামিনী রায়ের চিত্র কর্মের মধ্যে বিশেষ করে শেষ অধ্যায়ে একই স্বাদের চিত্র রচনায় ফলন্ত। ছবির নকসী করনে বিষয়ের বিবরণে ভিন্নতা থাকলেও স্বাদের দিক থেকে তা একই ক্ষমতা রক্ষা করে গিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আর একটি

বিষয়ে তিনি চর্চা করেছেন যা তিনি বিশেষভাবে দেশের পট শিল্পীদের কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন। তাঁর সমসাময়িক কালের শিল্পীদের ক্ষেত্রে যেটি এমন ভাবে ঘটে নি। তাহল, একই ছবির বহু অনুলিপি। এতে করে একই ছবির রঙ রেখা ভাব-ভাবনাকে বার বার অনুলেখনের মধ্যে আনলে মূল চিত্রের সঙ্গে একটি জোরের অভাব আলিস্যে ছায়া দেখা যায়। তাঁর একই ছবির বহু নকলের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত তিনি বর্ণ ব্যবহারে সময়ে পট ও তার স্থায়ীত্বের প্রতি গুরুত্ব দেবার ভাবনায় জোড় দেন নি। প্রায় শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে যে কারণে কিছু কালের মধ্যে চিত্র করণ কৌশলের লালিত্য হারিয়ে ফেলে কেবল ব্যবহারের অবহেলার প্রসাদে। তবে এবিষয়ে শিল্পীর একটি বক্তব্য অতি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত এবং এটি তাঁর বিশ্বাস যে বিশ্বাস প্রত্যয়ও বটে—"ছবির পেছনে আমাব চরিত্র ; তা যদি দুষ্ট হয়, লোহার পাতে উপর চিরস্থায়ী রং, এ ছবি থাকলেও তার স্থায়িত্ব নাই। আমার এখনও বিশ্বাস, মুহূর্তে যদি রং, নষ্ট হয়ে যায যার উপব আঁকা হয় তার স্থায়িত্ব যদি দুই এক মাসেরও হয় তাতেও আমি নিজেব বা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকাবক মনে করি না, মুহূর্তের আনন্দ যদি অপবকে অল্পক্ষণের জন্য দিতে পারি, তাব পরিবর্তে যে টাকা গ্রহণ করি তাহা অন্যায মনে করি না, এই হেতু যে আজকার দিনে অল্পক্ষণের আনন্দের জন্য এর চেয়ে বেশী করেন সকলেই।"

শিল্পী যামিনী রাযেব চিত্রকলার বিশিষ্টতা বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না—মানুষকে কোন শিল্পী আনন্দ দিলে তা যেমন সার্থক তার সঙ্গে যদি শিল্পী তাঁব সাধনা দিযে সেই ভালো লাগাব আনন্দে একটি বিশেষ আকারের মাত্রা দিযে থাকেন—যে সফলতাব অনন্যতার তুলনা নেই।

রথীন মিত্র

যামিনী রায়ের দোভাষী

মাতিস যেমন শ্রমকাতর মানুষকে বিশ্রামের শান্তি দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর ছবির মধ্যে দিয়ে তেমনি আমাদের যামিনী রায় চেয়েছিলেন ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে।

তাই তিনি বলতেন, 'আমি গ্রামের মানুষ, তাই আমার ছবিতে গ্রাম্য জীবনের রূপ দেখতে পাবে।'

যদিও তিনি একাধারে শহরের মানুষ ছিলেন, আবার দেশজ, গ্রামীণ মানুষও ছিলেন। তাঁরা বাবাও বলতেন, 'আমাদের সকলের এক হাতে যেন বই, অন্য হাতে লাঙল।'

তাই যামিনী রায়ের গ্রামীণ মনোবৃত্তিও তা থেকে নিজের শক্তির বিকাশ ও নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। আর তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর অসাধারণ পিতার সেই অসামান্য উদাহরণ,—'এক হাতে যেন বই, অন্য হাতে লাঙল।'

তখনও গ্রামে শহরে সচ্ছলতা, যান্ত্রিক প্রগতির ছোঁয়া লাগে নি। তিনি বলতেন, মানবের জীবনে যা কিছু সংকল্পিত বিন্যাস বা পরিকল্পনা, তার মধ্যবিন্দুতে রয়েছে কৃষকের স্থান।

তাই আমরা তাঁর ছবিতে সেই গ্রাম্য জীবনের প্রতিটি রূপ, তাঁর মানসিকতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে দেখি।

জন্ম বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে ১৮৮৭ সালে। তখনকার গ্রাম আর এখনকার গ্রামের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত। সেই সময়ে গ্রামের কাছাকাছি বন-জঙ্গলে হিংস্র জীব-জন্তুর অভাব ছিল না। আর ছিল বাউরি, সাঁওতালদের বাস। তাই তাঁর ছবিতে যেমন আমরা গৃহপালিত জীবজন্তুর বহু ছবি দেখতে

পেতুম— যেমন, গরু, ঘোড়া, বেড়াল, ইত্যাদি, তেমনি হরিণ, বাঘ ও হাতির ছবি প্রচুর দেখতে পাই। মাছ ও পাখিরা তো আছেই। সেই গ্রাম্য পরিবেশের সরলতা, তাঁর চিত্রে কিছুটা যেন শিশু সুলভ চেহারায় দেখতে পাই। যদিও ছবিগুলিতে বেশ শিশু-সুলভ সরলতা, তবুও তাদের বলিষ্ঠ রেখা ও কুশলতা যেন পাকা হাতের খেলা।

তেমনি বাউরি, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী, গ্রামের মেয়ে পুরুষ সাধারণ জীবন, যাত্রারত, কর্মরত চিত্রের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যায়—টোকা মাথায়, কৃষক, গৃহস্থ বধূরা, বাবার কাঁধে ছেলে চলেছে ক্ষেতের পথে, চাষী, মজুর, কামার, বাউল ফকির, সাঁওতালদের মাদল নিয়ে ছবি, নবীন কুমারী, বিধবা মা, মেয়েদের কর্মরত জীবনযাপন—এই সব অতি পরিচিত চেনা গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথাই ছিল তাঁর ছবির মূল বিষয়বস্তু।

তাঁর ড্রইং বা স্কেচ দেখলেই বোঝা যায় তা যেমন প্রাণবন্ত তেমনি গতি মুখর। যেন কাগজ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সামান্যতম স্কেচও প্রায় পুরো ছবির কম্পোজিশন। যেখানে যেমনটি প্রয়োজন—ফিগারগুলি ঠিক তেমনি যথাযথ ভাবে, দেওয়া।

১৯৫৮ সালে কয়েকজন বিদেশী-রুশ দেশীয় শিল্পী ভারতে আসেন, দু'দেশের মধ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার আদান-প্রদানের কর্মসূচী অনুযায়ী ওঁরা, এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জন শিল্পী কলকাতায় আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কলকাতার নাগরিক জীবন-যাপনের ওপর কিছু ছবি আঁকার ইচ্ছে, আর দেখা করতে চান যামিনী রায়ের সঙ্গে। দেখার ইচ্ছে যামিনী রায়ের স্টুডিও ও।

সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় ললিতকলার অধ্যক্ষ ঐ দুই শিল্পীর কলকাতায় থাকার সময় দিন পঞ্জিকা তৈরি করার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের ভ্রমণকে পূর্ণ করে তোলার জন্যে, আর যামিনী রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার ভারও দেয়া হয়েছিল আমাকে। ওঁদের সঙ্গে একজন ইংরেজি ও রুশ জানা রুশী দোভাষী ছিলেন।

তখন দুন স্কুলে শীতের ছুটি, কলকাতায় ছিলাম, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। যামিনী রায়ের সঙ্গে দেখা করে সময় ঠিক করে নিলাম। যামিনীবাবু আমায় তাঁর দোভাষী হতে বলেছিলেন, কারণ তিনি কথা বলবেন বাংলাতে। ওঁর জীবন-যাপন ছিল খাঁটি বাঙালির, চাল-চলন, পোশাক-আশাকে বজায় রাখতেন খাঁটি বাঙালির আভিজাত্য। খুব ভালো লেগেছিল এ দায়িত্ব হাতে পেয়ে। আর স্মৃতিতে আজও সেই ঘটনা অমলিন হয়ে আছে।

দুই রুশ শিল্পী পুনেমারো আর ত্রুবিয়াংকা তাঁদের দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পেঁাছে গেছিলাম যামিনী রায়ের বাড়ি।

গাড়িতে যেতে যেতে ঐ দুই শিল্পীর ক্রমাগত প্রশ্ন—'যামিনী রায় কেমন দেখতে? কি ধরনের মানুষ? এমনি আরও অনেক কিছু।

যদিও ওঁরা দু'জনেই যামিনীবাবুর প্রচুর ছবি দেখেছেন বিদেশের আর্ট গ্যালারিতে। বিশেষ করে রঙের ছবি ওঁদের বেশ নাড়া দিয়েছে।

আমি ওঁদের একটু ভাবনার মধ্যে রেখে অন্যভাবে জবাব দিতে লাগলাম প্রশ্নের। বললাম, দেখি তোমাদের মানস পটে যে যামিনী রায়ের ছবি, তাঁকে সামনা-সামনি দেখে তোমরা চিনতে পারো কি না। তবে এটুকু বলতে পারি তাঁর ছবিতে যেমন শিশু-সুলভ সরলতার উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়, তেমনি এই বয়সেও তাঁর হাসি এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শিশু সুলভ ভাবটি মিশে আছে।

গাড়ি ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ির (এখন বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ি) কিছু দূরে এসে থামল। স্পষ্ট মনে আছে কয়েক পা হেঁটে যেতে হয়েছিল। ঠিক সময়ে ওঁর বাড়ির সামনে আমরা। যামিনীবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে। অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্যে ফটক খুলে বেরিয়ে এলেন। পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগেই

দুই শিল্পী তাঁদের ব্রিফ কেস রাস্তায় রেখে ওঁর পা ছুঁয়ে নমস্কার করলেন। সে প্রণামে মিশে ছিল শ্রদ্ধা।

এরকম দৃশ্য আমার কল্পনাতেও ছিল না, সম্পূর্ণ ভিন দেশী দুই শিল্পী একজন ভারতীয় শিল্পীকে ঠিক বাঙালি প্রথা মতো সম্মান জানালেন। মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। আশপাশের বাড়ির কিছু মানুষও দেখেছিলেন এই দৃশ্য।

যামিনীবাবু হাসি মুখে, তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ঘরে। পিছনে পিছনে আমরা দুই দোভাষী।

সমস্ত ঘরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁদের ছবি দেখালেন যামিনী রায়। প্রতি ঘরেই সাজানো ছবি। যেখানে যেমন জায়গা, সেখানে তেমন মাপের ছবি। বাকি ছবিগুলো ওঁর ছেলের (পটল) সাহায্যে ড্রয়ার থেকে বার করে তুলে ধরলেন ওঁদের সামনে। বিদেশী শিল্পীরা ছবি দেখতে দেখতে আরও গভীরে ডুবে গেলেন।

দুই রুশ শিল্পী যামিনী রায়ের ছবিতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন শহরের জনজীবন, কুলিমজুর, কলকারখানা বা মেহনতী জনতার ছবি। শেষে তাঁরা প্রশ্নও করলেন এ ব্যাপারে।

উত্তরে যামিনীবাবু জানালেন, মানবজীবন ও সভ্যতার গতির কথা, কোনটা কতখানি সার্থক। উনি এক একটি উদাহরণ দিচ্ছেন বাংলায়, আমি তার তর্জমা ইংরেজিতে করে রুশ দোভাষীকে জানাচ্ছি। তিনি আবার সেই বিষয়টি রুশ ভাষায় পৌঁছে দিচ্ছেন দুই শিল্পীর কাছে। তাঁরাও আবার পাল্টা প্রশ্ন রাখছেন। কথা ঘুরতে ঘুরতে বাংলা হয়ে পৌঁছচ্ছে যামিনীবাবুর কাছে।

উনি বলেছিলেন, জল-মাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মানুষের জীবন, খাদ্যও তাই। জল-মাটি, হাওয়া অনুসারে জীবনযাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। সমাজজীবনের বিন্যাসের ইতিহাস ভিন্নও বটে, আবার একও।

গ্রামের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথায় ফিরে গিয়ে, আবার তাঁর ছবির দৃষ্টিকোণের বিষয়ে চলে এলাম।

গ্রামীণ জীবনের সহজ মনোবৃত্তি, তা থেকে নিজের শক্তির বিকাশ ও নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেও তিনি নিজস্বতা হারান নি।

কলকাতায় এলেন ১৬ বছর বয়েসে। তখনই ছেলেবেলার ছবি আঁকার শখ বাস্তব রূপ নিল। এক সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন শুরু করলেন শহরে এসেও। ভর্তি হলেন সরকারি আর্ট স্কুলে। ঘরভাড়া নিলেন বাগবাজারে এক গলির ভেতর।

অল্প বয়েস থেকেই স্বাধীন রোজগারের সূত্রপাত হয়েছিল। খ্যাতি লাভ করেছিলেন একজন পোর্ট্রেট পেইন্টার হিসাবে। তখনকার দিনে মক্কেলকে খোশামদ করে মুখ আঁকা লোকের অভাব ছিল না। এমনকি সিটিং না নিয়ে

শুধু মাত্র ফোটোগ্রাফ সামনে রেখে এঁকে দেওয়া হতো পোর্ট্রেট। এতে বেশ আয় হতো। তবে যামিনী রায় বেশিদিন ঐ ভাবে এঁকে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেন না। তাঁর গভীরে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল শিল্পীর সংকট। পোর্ট্রেট আঁকায় মন ভরছে না। পাশ্চাত্য রীতি থেকে মুক্ত করে সন্ধান করতে লাগলেন নতুন পথের। ফিরে গেলেন মাটির কাছে। ভারতীয় জীবনের শেকড় খুঁজতে নিজের গ্রামে পেঁছে গেলেন। তখনও সেখানে 'সভ্যতা' পেঁছয় নি। যন্ত্রযুগের কোলাহলও নেই। যামিনীবাবুর বয়েস তখন ৩৪। গ্রাম্য জীবনের রসে রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন ক্রমশই। কালিঘাটের পটুয়াদের ছবি, মাটির পুতুল বা বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের ভেতরের দেয়ালের টালি তার মাথার ভেতর জেঁকে বসল।

সেই সময়ে তাঁর রেখাচিত্রে মা ও শিশু, বৃদ্ধ মানুষ, বাংলার বিধবা নারী বা মাছ, বেড়াল, হাতী, হরিণ সবই এসেছে। ইউরোপ ও চীনের অঙ্কন রীতি শিক্ষা-দীক্ষা যতটুকু তিনি রপ্ত করেছিলেন, তাকে কাজে লাগিয়েছেন। Perspective Fore shorten-কে তার space-এর ব্যবহারে।

বাউরি, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী সাধারণ জীবনযাত্রার মেয়ে পুরুষ হল তাঁর ছবির বিষয় বস্তু।

এমনভাবে রূপ দিলেন যে বাঙালির কাছে তারা চেনা আত্মীয়, যদিও মুখভঙ্গি ও শরীর ভিন্ন ধরনের।

নানা দেশের ছবির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি যে কোনো ছবিকেই বিশ্লেষণ করে তাঁর নিজের মতন করে, নিজের তাগিদের সঙ্গে মিশিয়ে আঁকতেন। তাই কোনো ছবিই মূল ছবির নকল হয় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় ইজিপসিয়ার রীতিতে সোজাসুজি দেখা শরীর কাঁধের প্রোফাইল আর মুখ আঁকা, সাঁওতালদের মাদল নিয়ে নাচের ছবি।

যামিনী রায় এই সিদ্ধি অর্জন করেছেন তার বৈচিত্রের সীমায়নে এবং বিশেষ করে প্রাণময় রেখা গণ্ডির মধ্যে রংগুলি সমলেপন চাপে এবং পারস্পরিক সঙ্গতিতে তৈল চিত্রের মতন উজ্জ্বলতা টেম্পেরা রঙে আনার নৈপুণ্য যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, বিশেষ করে তাঁর বাগবাজারের গলির বা বাঁকুড়ার বাড়ির ছবি বা দক্ষিণেশ্বরের ছবি, নিশ্চয়ই তাঁরা ভুলতে পারবেন না।

অনেকে হয়ত ভাবেন, তাঁর ছবিগুলি খুবই সহজ পদ্ধতিতে আঁকা সোজা নকশাগুলি বিশেষ করে এত সরল খুঁটিয়ে দেখলে আশ্চর্য হতে হয় মহিমাময় দ্রুত সীমারেখার টান দেখে। কত সংযত আর কতখানি কল্পনা শক্তি থাকলে এরকম রঙিন স্পন্দিত মহিমাময় ছবি করা সম্ভব হত। তাঁর ছবিতে রং ব্যবহৃত হয়েছে কখনও অলংকার হিসেবে কখনও বর্ণনা হিসেবে।

ফর্মের প্রকাশের চেষ্টায় তিনি, মাঝে মাঝে ভাস্কর্যে হাত দিতেন। ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়ি তৈরির সময়ে মাটি থেকে কিছু পাথুরে মাটি বেরোয়। সেই সব পাথুরে মাটি খুব কম কাটাকুটি করে যে সব মূর্তি তিনি বের করলেন, দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

পরবর্তী কালে দুটি বাটালির সামান্য ঘায়ে কাঠ বর্জন করে কাঠের আঁশের চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে প্রতিমা বার করার বাহাদুরি অনেক আধুনিক ভাস্করদের হার মানাবে।

এই প্রসঙ্গে স্বনাম ধন্য ফরাসি শিল্পী মাতিসের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। মাতিসও ফর্মের প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে ভাস্কর্যে হাত দিতেন। সামনে ফ্ল্যাট জমির সম্মুখে দাঁড়িয়ে না থেকে তিনি বস্তুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে আরও ভালো করে নিরীক্ষণ করে অধ্যয়ন করার সুযোগ নিতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, 'চিত্রকলায় ছবি আঁকার উপকরণ যে বিরাট অংশ গ্রহণ করে বলে আমরা সাধারণত কল্পনা করি, সেটা ঠিক নয়। আমি যা করি তাতে আমি আবদ্ধ নই। আমি যদি অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতুম তবে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ছবি আঁকা ছেড়ে তাই করতুম।'

———

করুণা সাহা

যামিনী রায়ের স্টুডিওতে দুবার

শিল্পী যামিনী রায়ের ছবির সঙ্গে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার পরিচয় ঘটেছিল। সেদিন ছিল রবিবারের এক সকাল। আমি তখন আর্ট কলেজের ছাত্রী। ছবি আঁকার প্রাথমিক ব্যাকরণ, ড্রইং, পারস্পেকটিভ, আলোছায়ার খেলা বোঝবার চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করে চলেছি। এইভাবেই আর্ট-কলেজের দিনগুলো কাটছিলো। এক রবিবারের সকালে আমাদের পরিবারের এক আরকিটেক্ট বন্ধু আমাকে যামিনী রায়ের ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময়ে আমার উৎকণ্ঠা আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। চিন্তাই করতে পারিনি এত বড় একজন শিল্পীর সান্নিধ্যে এত সহজে আসতে পারব। সে দিনের সেই অভিজ্ঞতা আমাকে দীর্ঘকাল অভিভূত করে রেখেছে।

দরজা খুলে তাঁর স্টুডিওতে ভিতরের প্রকাশ পথে লম্বা করিডোর তার পর বড় বড় কয়েকটি ঘর। ছবিগুলো সাজানো রয়েছে সাদা রংয়ের পাইন কাঠের সাধারণ কতগুলি জল চৌকির ওপরে। এ ঘরে দেয়ালে খুব কম ছবিই টাঙ্গানো ছিল। স্টুডিও ঘরটির বৈশিষ্ট ছিল, অনাড়ম্বর সাধাসিধে সাজসজ্জা। লম্বা করিডোর পার হয়ে এলাম অন্য এক বড় ঘরে, যেখানে কিছু ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো। সাদা দেয়াল মেঝের রং ইণ্ডিয়ান রেড্। দূর থেকে দেখতে পেলাম স্টুডিও ঘরের ভেতরে এক ধারে বসে আছেন শিল্পী নিজে। সুন্দর সৌম কান্তি দীর্ঘকায়। সঙ্গে আছেন শ্রীঅতুল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ও কবি বিষ্ণু দে। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সে সময়ে সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসীন আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি নিজেই শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সেদিন সেই বিরাট মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। পর মুহূর্তে তাঁর সাদর সম্ভাষণ ও সহজ সরল ব্যবহার আমার সকল উত্তেজনা ও ভয়ের অবসান ঘটিয়েছিল। জানালার বাইরে তখন সবুজ

ঘাসে সকালের রোদ পড়েছে। মনের মধ্যে এক আনন্দের দোলা অনুভব করলাম। এক বিরাট ব্যক্তিত্ব, এক বিরাট শিল্পী যাঁর সারা জীবনের বিচিত্র সব সৃষ্টি সকলের মনে দাগ কেটেছে আমি তারই কাছে এসেছি। এ ছিল আমার প্রথম দেখা।

শ্রদ্ধেয় শিল্পী যামিনী রায়ের মৃত্যুর দু তিন বছর পরে আমি দ্বিতীয়বার সেই ষ্টুডিওতে যাই তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখতে। চিত্র জীবনে অনেক বছর তিনি একাডেমিক্ রীতির অনুসরণ করেছিলেন। সব দেশের ছবির অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। বেশ কিছু পোর্ট্রেটও এঁকেছেন বিদেশী রীতিতে। ভ্যানগখের কয়েকটি ছবির অনুকরণে আঁকা তার ছবি দেখলাম। ধীরে ধীরে তিনি ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নিজস্ব এক নতুন ধারায় চিত্র-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। চিত্র রচনায় ছিল আমাদের দেশের পুতুল ও লোক চিত্রের প্রভাব। বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলার মন্দিরের গায়ের টেরাকোটা ও দাঁইহাটের পাথরের কৃষ্ণ মূর্ত্তি এবং বিশেষ করে বাংলার পটের আভাস চোখে পড়ে।

এই বিরাট শিল্পীর সারা জীবনের কাজে বিচিত্র নক্সা ও ড্রইং দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ক্লান্তিহীন উৎসাহে নক্সার পর নক্সা এঁকেছেন। যামিনী রায়ের নক্সা গতিবান ও সরল। ফিগারকে তিনি ফ্রেমে বেঁধে ফেলতেন। ফলে ফ্রেম হল ছবির অঙ্গ। রেখা ও প্রতিমার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় রেখাচিত্রে। তিনি একটি মাত্র লাইনের ব্যবহার করতেন না। দুটি বা তিনটি রংয়ের সাহায্যে সম্পূর্ণ ছবিটি গড়ে তুলতেন। চিত্রের উপকরণগুলি নিরাভরণ ভাবে ব্যবহার করতেন। চোখের সামনে দেখা জিনিষের ড্রইংএর মত। কপি না এঁকে সমস্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে অন্তর্নিহিত রূপ রসকেই ডিজাইনের মধ্যে প্রতিফলিত করতেন।

পটুয়াদের মত তিনি সাধারণ ও সস্তার যাকে বলা হয় মাটির রং ব্যবহার করতেন। প্রথম দিকে কিছু অয়েল পেণ্টিং রং-এর ব্যবহার করেছেন পরে অবশ্য একেবারে দেশী প্রথার কাজ শুরু করেন ও তাঁর জীবদ্দশায় আর অন্য রং ব্যবহার করেননি। তাঁর আঁকা ছবি সকলের ঘরে ঘরে দেখা যায়। দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি প্রচুর সমাদর ও সম্মান লাভ করেছেন। এ ছাড়া দেশ বিদেশে তাঁর ছবি সমাদর লাভ করেছে এ আমাদের গর্ব্বের বিষয়। তাঁর পটভিত্তিক চিত্রের প্রধান বিষয় ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র সব ও কৃষ্ণলীলা, চৈতন্য অধীবাসী সমাজের লোকজন, বাউল, পশুপাখীর নানা ধরণের ডেকোরেটিভ্ ছবি। আলপনার নানা নক্সা তাঁর ছবির অলঙ্করণে ব্যবহার করেছেন। যীশুর জীবনী নিয়ে অনেক ম্যুরানধর্ম্মী ছবিও তিনি এঁকেছেন। অনেক সময়ে তাঁর ছবিতে বিশেষ কোনও ঘটনা নেই। একটি বিশেষ মুহূর্ত্তকে ধরে রাখাই ছিল তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। ভারতীয় চিত্রে ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নতুন বৈচিত্র এনেছেন তিনি তাঁর ছবিতে।

গণেশ হালুই

আধুনিক শিল্পের দুই পুরোধার একজন

ধরা যাক বন্ বন্ করে ঘুরছে একটি চাকা। তাতে কিছু ছুঁড়ে দিলে সবেগে প্রত্যাখ্যাত হবে এটাই স্বাভাবিক। সমাজ-সংসারেও সেটাই নিয়ম। প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত রীতি-নীতি এবং অভ্যাস নতুন কোনও ধারণাকে সহসা গ্রহণ করতে রাজি হয় না। সাধারণত এখানেও নতুনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে প্রত্যাখ্যান। শিল্পী যামিনী রায়ের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। একদিকে রিয়ালিজম্, অন্যদিকে স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ শিল্প-মানসিকতার প্রবল প্রবাহ। স্বভাবতই যামিনী রায় তাঁর স্বকীয়তা নিয়ে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক দ্বিমুখী স্রোতের মুখে প্রায় ভেসে যাওয়ার দাখিল। ইউরোপে যখন যুগান্তরী শিল্প-আন্দোলন চলছে আমাদের দেশে শিল্পী, শিল্প-রসিক এবং বুদ্ধিজীবীরা তখন স্পষ্টত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রথম দলে যাঁরা তাঁরা তৎকালের ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক বাস্তববাদিতার কট্টর সমর্থক। অন্য দল পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির সন্ধানে পুবের দিকে তাকিয়ে। চীন জাপান, স্বদেশের অজন্তা মুঘল রাজপুত-চিত্র এবং দেবদেবীর ভাস্কর্যের অনুকরণে তাঁরা ভারত-শিল্পের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁরা স্বাদেশিকতার সাধক। পুব আর পশ্চিমের সহাবস্থানের চিন্তা সেদিন বলতে গেলে অনুপস্থিত। পরিবর্তে বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থী শিল্পসাধক এবং তাঁদের সমর্থকদের তখন চলেছে বিরোধ, বিদ্বেষ আর পরিহাস-বিদ্রূপের পালা। তারই মধ্যে যামিনী রায়ের আবির্ভাব। মজার ব্যাপার এই, পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষের কাছেই কিন্তু যামিনী রায় ছিলেন ক্রমাগত অবহেলিত। কখনও বা আক্রান্ত। রিয়ালিজমের চোখ-ভোলানো আলো আঁধারি মায়া ঘেরা আদর্শ বা স্বদেশীয় অজন্তা-ইলোরার মতো ধ্রুপদী আদর্শ

পুনরুজ্জীবনে আগ্রহী শিল্পিদলের কাছে যামিনী রায় সেদিন অপাঙক্তেয়। ওঁদের কাছে তাঁর ছবি গ্রাম-বাংলার শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া মাটির পুতুলের মতো। নিছক মন-ভোলানো অর্থহীন সারল্য। সুতরাং, যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম এক কথায় নাকচ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আপন অন্তঃস্থ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় এবং প্রচলিত ভাবধারায় প্রভাবিত না হওয়ার মতো অবিচলিত মানসিকতার জন্য সেদিন কার্যত তিনি একঘরে। কিছু কিছু শিল্পরসিকের চোখে তিনি গ্রাম্য, অশিক্ষিত ও একগুঁয়ে একজন শিল্পী যশঃপ্রার্থী মাত্র।

অবশ্য যামিনী রায়ের সমর্থকও ছিলেন কেউ কেউ। যথা শাহিদ সুরাবর্দি। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন—"বলা যায় যামিনী রায় অবজ্ঞা ও তিক্ততায় পুরোপুরি লাঞ্ছিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিতে রঞ্জিত তাঁর শিল্পীজীবনের নানা পরিবর্তন সম্বন্ধে খুব কম লোকই জ্ঞাত আছেন। দীর্ঘকাল তাঁকে একজন বাতিকগ্রস্ত এবং বাংলার রিভাইভালিস্ট আন্দোলনের বিরোধী মৌলিকতার পিছনে অর্থহীন অনুসরণরত একজন ফ্যানাটিক হিসাবে দেখা হয়েছে আমাদের যাবতীয় শিল্পকর্মের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় যেসব পণ্ডিতরা দিয়ে থাকেন তাঁদের চোখে যামিনী রায় ছিলেন অশিক্ষিত ও অবাঞ্ছিত একজন।...ভারতে তাঁর মতো এমন পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতায়, তার শিল্প অন্বেষণের লক্ষ্যবস্তু থেকে এত যোগসূত্রহীন অবস্থায় জীবন অন্য কোন শিল্পী যাপন করেছেন বলে আমার জানা নেই।"

'ভারত শিল্প ও আমার কথা'য় সুপরিচিত কলা সমালোচক ও সি গাঙ্গুলীর মন্তব্য, "অবশেষে তিনি যে নতুন পথটি ধরলেন তা হল আমাদের বাংলাভূমির লোকশিল্প বা ভূমিজ শিল্পকলার পথ ও পদ্ধতি।...সৃষ্টি হল নব নব রূপাকৃতির সম্ভার।...এই নতুন রূপের নবীন সাধনা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দেশে বিদেশে খ্যাতিমান করে তুলেছিল। তবে এখানে একটা প্রশ্ন উঠে যে, আজকালকার বিজ্ঞান ভিত্তিক শহুরে জীবনের কেন্দ্রে বসে কোন মার্জিত বুদ্ধিধর আর্টিস্টের পক্ষে শুধু গ্রামীণভাব ও লোক শিল্পের প্রকৃত মহিমা সৃষ্টি করা বাস্তবিক সম্ভব কিনা। যদি কেউ তা চেষ্টা করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তা তাঁর রচনায় সাফল্যের চিহ্ন যদি পরিস্ফুটও হয় তাহলেও কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতা অনিবার্য।" উপরি উক্ত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে জীবনের অনেকটা বছর একজন নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়, একাকী অবিচলিত অভীষ্ট লক্ষ্যের যাত্রী, নিয়ত সংগ্রামী যামিনী রায়কে দেখি ও পরবর্তী সফলকাম যামিনী রায়কে মানুষকে "বোকা বানানো" ও "কৃত্রিমতার" অপবাদে অস্বীকৃতির মানসিকতা লক্ষ করা যায়।

শিল্পী মাত্রই যেন অনুগ্রহের পাত্র। এ সমাজে সে যে কতখানি অবাঞ্ছিত পদে পদে উপলব্ধি করে। ফলে তাৎক্ষণিক প্রলুব্ধ হওয়ার ফাঁদে অনেকেই

আকৃষ্ট হয়। কেউ বা আরোপিত স্লোগানের মতো নিজেরই সৃষ্ট রূপবন্ধনে মোহগ্রস্তের মতো আবদ্ধ থাকে। মানুষের আকৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তার অন্তস্থ সত্তার আবেদন-নিবেদন ও গ্রহণ বর্জনের ক্রিয়া অজ্ঞাতে সম্পন্ন হয়। যিনি নিতান্তই মননশীল ও অন্তর্মুখী, নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং নিজেকে আবিষ্কার করাতেই স্বকীয়তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কথাটি যত সহজে বলা যায় কার্যক্ষেত্রে ততই অসাধ্য মনে হয়। আপনার বাইরে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির আবর্ত বার বার সেই আবর্তে আমাকে প্রক্ষিপ্ত করায়। আমি ঢাল বেয়ে অসহায় গোলাকার একটি বলের মতো কেবলই গড়িয়ে পড়ি। আমার আপন সত্তাটি সেই গোলাকার কৌটায় আবদ্ধ থেকে ভূপাতিত ও অপমৃত্যুতে সমাপ্ত হয়। কিন্তু যামিনী রায় শত দারিদ্রের মধ্যে অত্যন্ত সজাগ উজান বাওয়া শিল্পী।

"আমার আঁকা কোন 'গাছকে' কেউ যদি বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে বিচাব করেন, যথেষ্ট ভুল আছে কিন্তু গাছটিকে গাছ না বলে কেউ 'বাঘ' বলবেন, একথা অবশ্যই বলা যায় না।" যামিনী রায়ের এমনি ধাবা একটি তাৎপর্যময় উক্তি তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মকে ধাবণ করে আছে। ব্যাপারটিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

স্কোয়ার ও রেক্ট্যাঙ্গুলার আঁকার প্রকৃতিতে আমরা সহজেই দেখি না। কিন্তু আমাদের গৃহ অভ্যন্তরে নিত্য নড়া চলার গতিময়তার সুবিধার্থে এইরূপ নির্দিষ্ট আকারের ক্ষেত্র তৈরি করি। এই বিশেষ কারণেই ছবিতে ব্যবহৃত স্বাভাবিক আঁকার বিশিষ্ট ফর্ম সমূহ বিপরীতধর্মী স্কোয়ার কিংবা রেক্ট্যাঙ্গুলার জমিতে সহজেই পরিস্ফুটিত হয়।

তা হলে কি পৃথিবীর যাবতীয় যা কিছু কেবলই মানসিক জটিলতা ও বাহুল্যবর্জিত কোনও একক রূপকেই আমরা যথার্থ ছবির আখ্যা দেবো। একটি গোলাকার বৃত্তে দুটি সমান্তরাল অনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখার সংযোগে যে শিশুচিত্রের মতো মানুষের আকার পরিগ্রহ করে, তাতেই কি কোনও ছবির মর্মকথা নিহিত থাকে। তা হলে কি যামিনী রায়ের ছবিতে সরলীকৃত নিছকই কতকগুলি ফর্মের রূপ। স্বভাবতই এ-প্রশ্ন মনে জাগে।

ব্যাপারটিকে পুনরায় বোঝার চেষ্টা করা যাক। একটি নেহাতই সরল রেখা কেবলই রেখায় প্রতীয়মান হয়, যদি না রেখাটির প্রথম বিন্দু থেকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া ও থেমে যাওয়ার শেষ বিন্দু পর্যন্ত কোনও উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানসিক অভিব্যক্তির ইঙ্গিত থাকে। আমরা ঘরে বসেও যেমন আকাশের বুকে ভাসতে পারি, তেমনি বিস্মৃত কোনও কিছুকে মুহূর্তের মধ্যেই আমার সম্মুখে হাজির করাই। এই যাওয়া আসার বিচিত্র অনুভূতির একটি অনুসারী রেখা রূপকল্প নকশায় পরিণত হয়।

যেমন ধরা যাক, আমি অনেক আঁকা-বাঁকা, সোজা, চড়াই-উৎরাই, নদী-খাল

বনজঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠেছি, আমার এই ক্রিয়াকর্মটি পার্শ্ববর্তী নকশাটির মতো সামগ্রিক অনুভূমিক, উল্লম্ব, বক্র, তির্যক, তরঙ্গায়িত, ত্রিকোণ ইত্যাদি রেখার সমন্বয়ে আমার মনে যে অনুভূতিগত আন্দোলন সৃষ্টি করে—তারই একটি একক রূপ নকশায় পরিণত হয়েছে।

দেহগত কাঠামোর মধ্যেও যে সামগ্রিকরূপ আছে, এই রূপেব অন্তঃস্থলেই জীবাত্মার বাস। যে কোনও আকার যতক্ষণ না এই জীবাত্মায় স্পন্দিত হয়, ততক্ষণ তা নিছক ফর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাই শিশু চিত্রে এইরূপ শিহরণ। সাড়া দেখি না। অথচ শিশুর হাতে তুলে ধরা, মার গড়া সামান্য মাটির পুতুলটিতে—মার অন্তর্নিহিত ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা মিশ্রিত কত না অনুভূতিব সাগরে সিক্ত বিশ্বজনীন প্রসারিত আবেদন থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই আবদনেরই সুর ধ্বনিত হয় যামিনী রায়ের ছবিতে সহজ সরল অনায়াস উপলব্ধি আঙ্গিকের আড়ালে। তিনিই প্রথম যিনি লোকজ শিল্পের অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যবর্জিত সমাহিত অখণ্ডের সাড়া অনুভব করেন। এবং অনভূত এই আঙ্গিকের প্রতি দ্বিধাহীন অবিচলিত থাকেন। যামিনী রায় শুরুতে রিয়ালিজমের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু রিয়ালিজমের মায়াময় ইলিউশনের চেয়ে দেশজ অমিশ্রিত সমদ্যোতক ফ্ল্যাট। রঙের ভারি প্রলেপ ও সরলীকৃত ছন্দিত রেখার গতিময়তা ও আঙ্গিকে বিন্যস্ত ছবি, যেমন ফ্ল্যাট অস্পষ্টতা, জটিলতা ও বাহুল্যবর্জিত নগ্ন, ভাসমান হয়েও দৃশ্যগত 'লিনিয়ার পারস্পেকটিভ' ও আলো-আঁধারির রাখঢাকের গভীরতার চেয়ে আমাদের মনকে এক অচেনা ভাবাবেগে নিমজ্জিত করায়। এ কথা তিনি উপলব্ধি করেন। তাই তাঁর বিস্তীর্ণ ক্যানভাসের প্রেক্ষাপটে ''মা ও শিশুকে'' যখন দেখি, নির্দিষ্ট কোনও নাম, দেশ ও কালের অতীত রাফায়েলের বিখ্যাত চিত্র ''ম্যাডোনা ও শিশু''র চাইতেও বেশি বিশ্বজননী মাতৃত্বের স্বরূপ আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তেমনি 'বিড়ালী ও শাবক', 'হস্তিনী ও শাবক' ছবিগুলিতে অখণ্ড মাতৃরূপ দেখি। কার্যরত 'কাঠের মিস্ত্রি'র পেশাগত দক্ষতার প্রশান্তি, 'নিবেদন' ছবিটিতে বর্ষাস্নাত পরিচ্ছন্নতা। এমনি সীমাহীন বিস্তারের অভিব্যক্তি সব ছবিকে আশ্রয় করে থাকে। শুরুতে রিয়ালিস্ট ও অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্ররীতির প্রতি আকৃষ্ট হলেও, মূলত কী কারণে তিনি দুটো পথই অচিরে পরিত্যাগ করেন ও উভয় অনুগামী ও সমর্থকদেব দ্বারা তিরস্কৃত হন। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। প্রথমত যে কোনও দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাসিকাল আর্টের মূল্যবোধ একটি উৎকৃষ্ট আদর্শে পরিণত হয়। তাই ইউরোপে বহুদিন গ্রিক শিল্পের ধারা অব্যাহত ছিল। ফলে তথাকথিত মার্জিত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে দেশজ লোকশিল্পের সমাদর তেমন ছিল না। আফ্রিকা ও মায়া সভ্যতার ঐশ্বর্যময়ী শিল্প সম্ভারকেও প্রিমিটিভ বলে নিম্নমানের আর্ট মনে করা হত।

এমনকি স্থানীয় শিল্প সংগ্রহশালাগুলিতেও এদের স্থান জোটেনি দীর্ঘদিন। লুভর মিউজিয়ামেও অস্বীকৃত হয়। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রিক ক্লাসিকাল শিল্পের অধিকার ক্রমশ শিথিল হওয়া নতুন নতুন মূল্য বোধের সংযোজনের আফ্রিকা ও মেক্সিকো আর্টের অন্তর্নিহিত সত্তা পাবলো পিকাসো, পাল ক্লে, হেনরি মুর প্রমুখ শিল্পীদের কাছে একটি নির্ভেজাল আদিম শক্তিমত্তায় উদ্ভাসিত হয়। শিল্পজগতে দ্রুত নব নব আঙ্গিকের সংযোজন আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয়ত আমাদের এখানেও ব্রিটিশ প্রবর্তিত রিয়ালিস্ট ও ভারতীয় ক্লাসিকাল আর্টের সমর্থক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে লোকজ শিল্প ইউরোপীয়দের মতোই অপাঙক্তেয় মূল্যহীন ছিল। যামিনী রায় শুরুতেই ইউরোপীয় সমকালীন শিল্প আন্দোলনের ভাবধারায় উৎসাহিত হন ও বেশ কিছু ইমপ্রেশনিস্টের আদলে ছবি করেন। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় পিকাসো ও পাল ক্লের মতো লোকজ শিল্পেই নিজেকে আবিষ্কার করেন। ফলে সকলের কাছে ও আর্টের নামে পুতুল খেলার শিল্পী হিসাবে হাস্যাস্পদ হন।

ভারতীয় আধুনিক শিল্পের দুই পুরোধা যামিনী রায় ও রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন শিল্পজগতে রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবাত্মক ভূমিকাও অনেকের কাছে অস্বীকৃত ও কটূক্তির শিকার হয়। যামিনী রায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রে তাঁর অন্তঃস্থ শক্তিময়তার যেমন সন্ধান পান, রবীন্দ্রনাথও সেই কারণে যামিনী রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং অন্তরে যথেষ্ট সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্যারিসে চিত্র প্রদর্শনী চলাকালীন যামিনী রায়কে লেখা চিঠির কিছু অংশ—" আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সে জন্য তাদের দোষ দিই নে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়। আমাদের দেশে তার কোন ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রদৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে।" "...এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করলো। এই যে নিছক দেখবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি—যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী।" (১৯৪১ সাল)

কিন্তু উভয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রজগতে যতখানি ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখি, যামিনী রায়ের ছবিতে ততখানি বিশ্বজনীন রূপকল্পের বিস্তার নাই।

———

বিকাশ ভট্টাচার্য্য

যামিনী রায় ও তাঁর বরণীয় চিত্রকল্প

অংকনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার পর অবধি এদেশের নানাস্থানে ভ্রমণকরবার ও সেখানকার কলারসিক ও সংগ্রাহকদের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রচুর সুযোগ আমার ঘটেছে। এই লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আমাকে প্রচুর ভাবিয়েছে তা শ্রীযামিনী রায়ের শিল্পকর্মের সাদর উপস্থিতি, যা প্রায় সর্বস্তরের ও রুচির ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রশ্ন করে জেনেছি, যামিনীবাবুর শিল্প তাদের কাছে এসেছে প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। কোনরকম প্রবল চাপ বা প্রচার বিশেষভাবে এর পেছনে সক্রিয় ছিল না।

অথচ শুনে এসেছি, যামিনীবাবুর শিল্পের প্রচারের পেছনে শ্রীবিষ্ণু দে সুরাবর্দী সাহেব প্রভৃতি বিজ্ঞানের আন্তরিক সক্রিয় ভূমিকার কথা। এসবের সত্যতা ও উপযোগ্যতাকে অস্বীকার বা খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। তবে এসব মেনেও যে ব্যাপারটা আমার কাছে অনেক বেশী প্রকাশ,-পক্ষান্তরে প্রধানতম আকর্ষক শক্তি বলে মনে হয়েছে তা যামিনীবাবুর শিল্পের অভিনব ও অদম্যভাবে প্রাণবান সুষমা যার মূলমন্ত্রই আনন্দ আর যাকে এদেশের শিল্পে ধ্রুব বলে মানা হয়েছে। তাছাড়া চিত্রকলার প্রধানতম সর্ত হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই, Visual experience বা চাক্ষুস অভিজ্ঞতা তা যামিনী বাবুর চিত্রকলার ক্ষেত্রে এতই মনোহর যে তাকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমি এমন অনেককেই দেখেছি ও জেনেছি যারা এই শতকের প্রথম ও মধ্যভাগের কলকাতা কেন্দ্রিক বিদগ্ধ মনের খবরাখবর প্রায় রাখেনই নি বা এ সম্পর্কে এমন বিশেষ কোন ধারণা পোষণ করতেন না যা এদের পক্ষে যামিনী

বাবুর ছবির appreciation বা গুণের যথোচিত বিচারে সাহায্য করে। এরা তার চিত্রকলার প্রতি যে নিবিড় ভালোবাসাকে স্বীকার করেছেন তা মুখ্যত তাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপরায়নতা থেকেই করেছেন। বহু বিদেশীকেও এর প্রতিধ্বনি করতে দেখেছি শুনেছি।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, পাশ্চাত্যে চিত্রকলা প্রভৃতি যাবতীয় সুকুমার কলার মার্জিত রূপ সামাজিক জীবনে যেমনভাবে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিবিড়ভাবে সঙ্গদান করে এসেছে, এদেশে মুখ্যত ঐতিহাসিক কারণেই তেমনটি হয়নি। নব্য কলাচর্চার শুরুতে এদেশে তার বেগ বা প্রয়োজন কখনও এতটা প্রবল হয়নি যা জনজীবনের বিরাট অংশে সম্যক প্রভাব ফেলবে। এই চিত্রকলার সঠিক মূল্যায়ণেও আমাদের বারবারই ভ্রান্তি ঘটে গেছে। এবং ঘটনাচক্রে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞজনেরাই প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই এই বিষয়ে আমাদের চালিত করেছেন অথবা করতে চেয়েছেন। এর ফল সবসময়ই শুভ হয়নি। চিত্রভাষার যে সব ব্যাখ্যা সেসময় এদেশে প্রচলন করবার চেষ্টা হয়েছে তার বিরাট অংশই পরস্পর বিরোধী ও অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ছিল। আর যেহেতু মানসিকভাবে আমরা অহেতুক কল্পনা বিলাসেই অনেক বেশী পরিমাণে আগ্রহ দেখিয়েছি। চিত্রভাষার মূলসর্ত দৃষ্টি গ্রাহ্য অনুভূতির প্রকাশ, তার থেকে প্রায়ই আমরা সরে গেছি। নির্ভর করেছি ভাবের রাজ্যে। তাই এখানে চিত্রে Structural element বা গঠনমূলক উপাদান প্রাধান্য পেলনা—সেখানে রাজত্ব করলো এমন সব কল্পনা যা নিতান্ত বায়বীয় বললে বিশেষ অন্যায় হবে না। অথচ পাশ্চাত্যের রসিকরা যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের দ্বারা তাড়িত হননি শুধু মাত্র রসগ্রহণের উদ্দেশ্যেই এদেশের চিত্রকলার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, স্বভাবতই তারা যে সমস্ত চিত্রকলায় Visual Element বা দৃশ্য গ্রাহ্য উপাদানই প্রধানতর ভূমিকায় বিরাজ করছে তাতেই অনেক বেশী পরিমাণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাছাড়া এদেশের নিজস্ব ভাবধারার প্রতি আগ্রহও এখানে কাজকরছে, তবে তা কখনই Visual Element-কে পাশে সরিয়ে রেখে নয়। যামিনীবাবুর ছবির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যও এই Visual Element-এর এক অভিনব বিন্যাসে মণ্ডিত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে আরেকজনের কথা এখানে এসে পড়বে যাঁর চিত্রের গঠনও মূলত এই সর্তকে মেনেই গড়ে উঠেছে—যদিও প্রকাশ ভঙ্গিতে কোন অন্তর্লীন ভাষায় তার কাজ এমন এক মাত্রায় রূপায়িত হয়েছে এর আগে তেমনটি কোথাও ঘটেনি, এই-চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ।

আমরা জানি, একসময় যামিনী বাবু পাশ্চাত্যের ধরণে শিল্পচর্চা করতেন, তাঁর বেশ নিদর্শনও আমি দেখেছি। মোটের ওপর লেগেছে। অর্থাৎ এমন কোন স্তরে এসব শিল্পকর্ম পৌঁছয় নি যা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। অথচ পরে যখন পটশিল্পের থেকে রসদ নিয়ে যে স্বতন্ত্র

ধরনের আঙ্গিকের প্রস্তাবনা যামিনীবাবু করলেন তখন সমগ্র চিত্রপট এক অভিনব অনুপম বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল। এই নব উদ্ভাসিত শিল্প তার জন্মভূমি বাঁকুড়ার লৌকিক পটচিত্রের কোন উপাদান নিল, কিন্তু তার পৌনপুনিক গ্রাম্যতা থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এক মহিমান্বিত স্তরে উন্নীত হল। আবার অন্য দিকে শহুরে রুচির জোগানে রত কালিঘাট পটে যে নিম্ন রুচির রসিকতার জাড়কে ভেজানো চিত্রভাবনা তার থেকে নিজেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত রাখলো। কিন্তু এসব ঘটলে কোনরকম বিবাদের রাস্তায় না গিয়ে। ধর্ম এখানে জীবনের অঙ্গ হয়ে রইলো, কিন্তু মহাজনেব ভূমিকায় খবরদারি করতে এলো না। তার চিরন্তন মাতৃরূপ কল্পনা থেকে শুরু করে কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি যে বা যারাই তার পটে এসেছেন তারাই এক অপার্থিব অকপট শান্ত সুষমার প্রতিমূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছেন। এমনকি বেড়ান মৎস্যরা প্রায় অকল্পনীয় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

যারা চিত্রকর্মে আছেন তারা জানেন, চিত্রপটকে সুচারুভাবে বিভাজন করে অল্প প্রয়োজনে সাজানো কতটা দুরূহ কাজ। অথচ যামিনীবাবুর চিত্র দেখলে মনে হয় এগুলো কতো সহজেই না ঘটেছে। এটা সম্ভব তার পক্ষেই যিনি অপারিসীম অনুশীলনে এক অকল্পনীয় দক্ষতাকে আয়ত্ত করেছেন। এদেশের চিত্রকল্পের একটি বড় লক্ষণ তাব আলংকারিক ভঙ্গিমা বা Decorative manner (বা attitude)। এটা যামিনীবাবুব এই বিশেষ লক্ষণটিকে তাঁর চিত্রকল্পে এনেছেন কিন্তু কি অত্যাশ্চর্য সংযমের সঙ্গে। বাহুল্য নামক কোন কিছুই তাঁর চিত্রকল্পে পাত পায়নি যেটা সে সময়ের নিরিখে যথার্থই স্মরনীয় ঘটনা। যামিনীবাবু ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল ছাড়া আর চিত্রকর্মে এমনতর ঘটনা ঘটেছে?

বংশতালিকা

- রামতারণ রায় (স্ত্রী : নগেন্দ্রবালা রায়)
  - কুমুদরঞ্জন রায়
  - যামিনীরঞ্জন রায় (স্ত্রী : আনন্দময়ী রায়)
    - ধর্ম্মদাস রায় (১৯১১—)
      - দেবব্রত রায়
        - দ্বৈপায়ন রায়
      - সুব্রত রায়
        - অনিন্দ রায়
      - সুমিত্রাসিংহ রায়
      - সুচিত্রা ঘোষ
      - শিবব্রত রায়
    - জীমূতকান্তি রায় (১৯১৬—১৯৩২)
    - সুনীতি সেন (১৯১৯—১৯৭৩)
    - মৃণালকান্তি রায় (১৯২১ –)
      - অঞ্জন রায়
      - সংঘমিত্রা রায়
    - অমিয়কান্তি রায় (১৯২৩—১৯৮৬)
      - সঙ্গীতা রায়
    - মণি রায় (১৯৩৩—)
      - শর্মিষ্ঠা সেন
  - রজনীরঞ্জন রায়
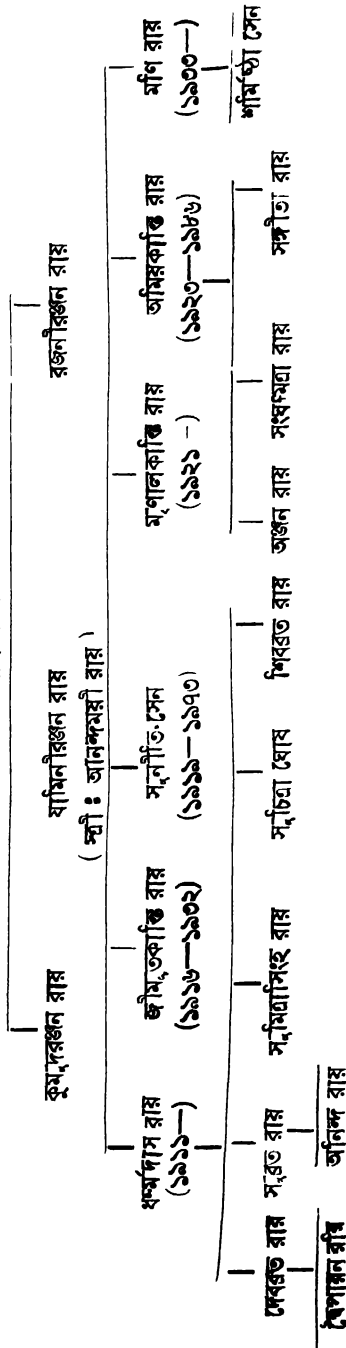
বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড়

যামিনী রায়ের পুরো নাম যামিনী রঞ্জন রায়। জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। পিতার নাম রামতারণ রায়। মাতার নাম নগেন্দ্রবালা দেবী।

বাঁকুড়া পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা। আয়তন প্রায় ৬৮৭১ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর ও পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল। পূর্বদিকে বিষ্ণুপুর। জেলার জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। বর্দ্ধমান, হুগলী মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল প্রাচীনকালে কর্ণ সুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অষ্টম শতক থেকে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজারা রাজত্ব করতেন। রাজারা প্রথমে শৈব, পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন বলে কথিত আছে। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে যে শিল্পসুষমা-মণ্ডিত অপূর্ব মন্দির স্থাপত্যরীতি ও টেরাকোটা শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল বিষ্ণুপুর নগর ধ্বংসাবশেষ ও মন্দিরগুলো তারই অতীত গৌরব গরিমার সাক্ষী। মল্লরাজাদের আমলে সংস্কৃত ও সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজ রাজত্বে বাঁকুড়া জেলা কিছুকাল বর্দ্ধমান জেলার ও জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া একটি পৃথক জেলার মর্যাদালাভ করে।

বাঁকুড়া জেলার দূরত্ব কলকাতা থেকে প্রায় ২৩১ কিলোমিটার। এখন এই জেলার সঙ্গে কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ রয়েছে নানা যানবাহনে। কিন্তু এক সময়ে কলকাতা থেকে বাঁকুড়া পেঁাছান খুব সহজসাধ্য ছিল না।

বেলিয়াতোড় চলতি ভাষায় বেলেতোড় নামেই পরিচিত। বেলেতোড় থেকে কবি বন্ধু বিষ্ণু দে কে ১৮.৩.৪২ তারিখে লেখা যামিনী রায়ের একটি চিঠি থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। এই পত্রের এক জায়গায় যামিনীবাবু লিখেছেন, 'আসবার আগে পত্র দিবেন। আমি পটলকে লোক সঙ্গে দিয়ে বাঁকুড়া ষ্টেশনে রাখব। যাতে কোন অসুবিধা না হয়। যে দিন রাত্রের গাড়ীতে আসবেন তার ২ দিন আগে পত্র দিবেন কারণ এক একদিন ছোট লাইনের গাড়ী ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা কোরে ছেড়ে দেয়। কারণ আজকাল B. N. R.-এর গাড়ীর খুব দেরী হচ্ছে বাঁকুড়া পোঁছতে। সেদিন কলকাতার ডাকও আসে না, কাজেই চিঠি একদিন দেরীতে পাই। হাওড়া স্টেশনে একটু আগে আসবেন, রাত্রি ৯৷৷ টায় ট্রেন, এনকোয়ারি আপিসে জিজ্ঞাসা করবেন বাঁকুড়া আসবার ট্রেণ কোন প্লাটফরম থেকে ছাড়বে, খুব সম্ভব ৭নং। রাত্রি ৩টায় বাঁকুড়ায় পেঁাছায় সঙ্গে বি, ডি, আর RY এর ট্রেন প্রস্তুত থাকে, ৪৫মিঃ লাগে আমাদের বাড়ী আসতে বেলিয়াতোড় ষ্টেশন বি, ডি, আর রেলওয়ে। ষ্টেশন থেকে ৫মিঃ আন্দাজ লাগে। বি, এন, রেলওয়ে বাঁকুড়া পর্যন্ত ইনটার ক্লাস বোধহয় ৪ টাকা আন্দাজ টিকিটের দাম, আর বাঁকুড়া থেকে বেলিয়াতোড়

পর্যন্ত ।৵০ আনা। ৫০্ টাকায় চলিবে কিনা লিখিয়াছেন, নিশ্চয়ই চলিবে।'

যামিনী রায়ের পিতৃপুরুষরা কিন্তু বাঁকুড়ার লোক ছিলেন না। বসবাস ছিল যশোহর। এই রায় পরিবার সম্পর্কে বিষ্ণু দে 'যামিনী রায়ের কথা' রচনায় লিখেছেন, 'যশোহর রাজবংশে তাঁর (যামিনী রায়ের) পিতৃপুরুষরা জড়িত ছিলেন এবং রাজার হত্যাদেশের জন্যে তাঁরা মল্লভূমের বিষ্ণুপুররাজের আশ্রয় প্রার্থী হন। অর্থাৎ রায় মশায়দের জমিদারির পত্তন হয় প্রতাপাদিত্যের যশোহর কচুরায়ের আত্মরক্ষার্থে মোঘল দরবার থেকে বর্তমান বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর রাজ্যের আশ্রয় নেওয়ায়। বিষ্ণুপুর রাজ তাঁকে উচ্চ বংশ শোভন জায়গীর দিতে চান রাজসভার কাছাকাছি। কিন্তু রাজারাজড়ার দরবারী অভিজ্ঞতার পরে রায় মশায়রা জঙ্গলে জায়গা চান, বিষ্ণুপুর থেকে
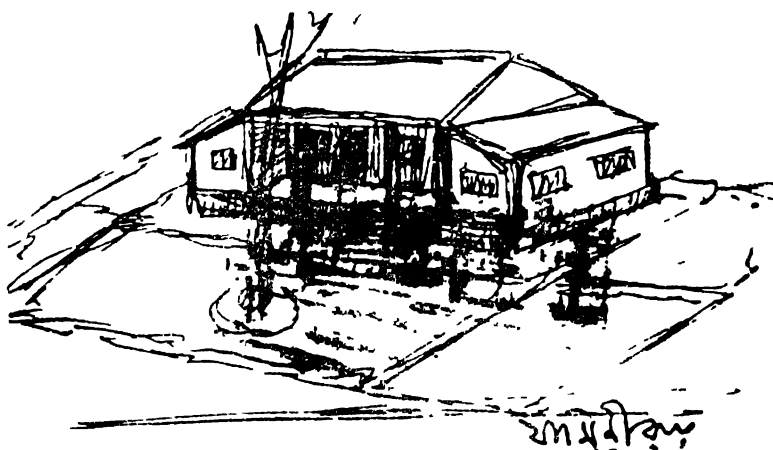
কিঞ্চিৎ দূরে বেলিয়াতোড়ে। বেলিয়াতোড়ের কাছেই জঙ্গল আরম্ভ, মালভূম থেকে মেদিনীপুর জেলা অবধি।'

তখন এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ এবং হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল ছিল। আত্মরক্ষার জন্যে গ্রামবাসীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র রাখতে হত। যত্রতত্র একা ভ্রমণ নিরাপদ ছিল না। যামিনী রায়ের নিজের কথায়, 'বাবার পাশে শুয়ে শুয়ে কাঁদতুম, বাবা বলতেন—এই দেখ আমার পাশে দা রয়েছে। তোমাকে কোন জন্তুই কিছু করতে পারবে না।'

জন্মতারিখ

এই বছর (১৯৮৭) যামিনী রায়ের জন্মশতবর্ষ পালন করা হচ্ছে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ জন্ম সাল ধরে। কিন্তু তাঁর সঠিক জন্ম সাল কবে? তা নিয়ে মিথ্যে বিতর্ক রয়েছে। 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' বইতে লেখক কমল

পরবর্তীকালে অবশ্য আরও বহু পুরস্কার পেয়েছেন। এখানে কমল সরকারের সরকার লিখেছেন, '১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বাকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে জন্ম'। জন্ম সাল নিয়ে বিতর্ক থাকায় তিনি সঠিক তথ্যের সপক্ষে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর 'স্টেটসম্যান' এ শিল্পীর প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত 'আর্ট একজিবিশন ইন ক্যালকাটা' প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করেছেন; 'বর্ণ ইন ১৮৮৯ এাট বেলিয়াতোড় ইন দ্য ডিসটি্রকট অব বাঁকুড়া।' আবার ১৫ই মার্চ ১৯৮৭ একটি ইংরেজী সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় রঙীন ম্যাগাজীনে শিল্পীর জন্ম তারিখ ১০ই এপ্রিল ১৮৮৮ লেখা হয়েছে দেখলাম। দিল্লীর ললিতকলা থেকে প্রকাশিত 'ললিতকলা সিরিজ অফ কনটেমপরারি ইণ্ডিয়ান আর্ট' পর্যায়ের যামিনী রায় সংখ্যায় শিল্পীর জন্ম সাল ১৮৮৭ বলে জানানো হয়েছে। 'যামিনী রায়ের কথা' এই শিরোনামে রচনায় বিষ্ণু দে লিখেছেন, 'যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, (শুনেছি) এপ্রিলের মাঝামাঝি, বাংলা বছরের শেষ রাত্রিতে।' যামিনী রায়ের বাড়ীতে কথা বলে জানলুম ১৮৮৭ই ঠিক। এবং দিনটা হল বাংলা মাসের ১লা বৈশাখ। এ বিষয়ে শিল্পীর চতুর্থ পুত্র অমিয় রায় বলতেন, 'চৈত্র মাসের শেষ তারিখে রাত্রি বারটার পর তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাই ১লা বৈশাখ নববর্ষের দিন তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়।' তাঁর কথাতেই জানা যায় জীবনের শেষ দিকে শিল্পীর এক অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। 'যেখানে ছবি আঁকতে বসতেন সেখানে খুচরো পয়সা দিয়ে নিজের জন্মসালটা সাজিয়ে রাখতেন। সাজাতেন '১৮৮৭' সংখ্যাটি।

ছেলেবেলার শিল্প আকর্ষণ

জন্মেছিলেন নিয়োগী পাড়াতে। মামারবাড়ির ঢেঁকিশালে। এই বাড়ির কাছে ছুতোরপাড়াতে বসে শিশু যামিনী রায় পরম উৎসাহভরে দেখতেন কাঠের কাজের কারুকর্ম, মূর্তি তৈরির মুন্সিয়ানা। বেলেতোড়ের ছুতোরপাড়ার ছুতোররা এই দুরকম কাজই করতেন।

পুকুরপাড়ে বসে ভিজে মাটি দিয়ে পুতুল গড়তেন। লাল হলুদ খয়েরি রঙের গিরিমাটি দিয়ে ছবি আঁকতেন। পড়তেন পাঁচবাড়ির মেলার পাঠশালাতে। স্কুলের হাতের লেখার খাতায় অনবরত অবিরাম মনের কথা ছবিতে লিখতেন। বড়মামা চারুচন্দ্র দত্ত এই শিশুর হাতে দিস্তে দিস্তে কাগজ এগিয়ে দিয়ে উৎসাহ দিতেন।

বাঁকুড়া জেলায় এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিশোর যামিনী রায় ঐ প্রদর্শনীতে একটা ছবি পাঠিয়েছিলেন। ছবিটার নাম দিয়েছিলেন 'সমাজ'। ছবি দেখে খুশি হয়ে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্টেট এই কিশোর শিল্পীকে একটি গিনি উপহার দিয়েছিলেন। জীবনে এই প্রথম পুরস্কার। শিল্পীর স্বীকৃতি।

লেখা 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্র শিল্পী' গ্রন্থ থেকে তার কিছু উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক হবে না !

'প্রাক্তন ছাত্ররূপে সরকারি আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে তাঁর অংশগ্রহণ শুরু ১৯১১ এ। ভারতের অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর 'ডিভাইন মোমেণ্ট' (জল) বোম্বে আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে ভারতীয় রীতির শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয় (১৯২০)। পরের বছর মাদ্রাজ ফাইন আর্ট প্রদর্শনীতে 'উইডোয়ার' চিত্রটিও ভারতীয় রীতির শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে পুরস্কার লাভ করে। কলকাতার 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠার পর এ সংস্থার প্রদর্শনীতেও তাঁর চিত্র প্রদর্শিত হয় (১৯২১)। আকাডেমি অব ফাইন আর্টসের তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড' (জল) চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান ভাইসরয় (লর্ড উইলিংস) প্রদত্ত স্বর্ণপদক ও একশো টাকা অর্থ পুরস্কার লাভ করে (১৯৩৫-৩৬)।'

যামিনী রায় তাঁর ছেলে বয়সে গ্রামের বিভিন্ন কারুশিল্পীদেব হাতের কাজ দেখে যুগপৎ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হতেন। এ প্রসঙ্গে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত 'যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে' লিখেছেন, 'তিনি দেখতেন কেমন করে তাঁতি তাঁত বোনে, কেমন কবে কুমোব চাকে হাঁড়ি গড়ে, বেত আর বাঁশের কাবিগররা কি রকম ধামা বাঁধে, মাদুব বোনে, মৃৎ শিল্পীরা কি করে খড়ের গোছা থেকে দুর্গার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি আর রঙিন পুতুল আর খেলনা তৈরি করেন, মেয়েবা কি করে গান গাইতে গাইতে ঢেঁকিতে পাড় দেন, কি করে পালা পার্বণে আলপনা দেন, বসুধারা আঁকেন। এ ছাড়াও তিনি মা মাসী কথক ঠাকুর ইত্যাদির কাছ থেকে আর যাত্রা আর পালা দেখে, পোটোদের জড়ানো পটের সঙ্গে গান শুনে ভারতের জীবনের আনন্দ আর শিক্ষার মূল উৎস রামায়ণ মহাভারত, পুরান-উপপুরান, রাধা কৃষ্ণ লীলার মহত্ব আর মাধুর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। বাঁকুড়া জেলার আর একটা বিশেষত্ব ছিল সেখানকার হিন্দু মুসলমান ছাড়া সাঁওতাল আর আদিবাসী বাসিন্দারা। কিশোর যামিনী রায় তাদের সরল জীবন আর তাদের নাচ গানও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এ সব অলীক কল্পনা নয় তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ তাঁর অজস্র ছবিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তাতে গ্রামের দৈনন্দিন জীবন, কর্মরত নরনারী, রামায়ণ কৃষ্ণলীলা ইত্যাদির নানান ঘটনা অপরূপভাবে চিত্রিত হয়ে রয়েছে।'

যামিনী রায়ের মুখে শুনেছি বেলেতোড়ের গ্রামে নাওয়া খাওয়া ভুলে তিনি কুমোরদের দুর্গা মূর্তি তৈরি দেখতেন তন্ময় হয়ে। এ জন্যে বাড়ি বা স্কুল পালিয়ে সোজা চলে যেতেন কুমোরদের ঘরে। খুব অভিনিবেশ সহকারে দেখতেন কেমন করে কুমোর এক এক করে ঠাকুরের চোখ কান নাক তৈরি করছেন। অনুপ্রাণিত হতেন। খুব বড় শিল্পী হবার বাসনা জাগতো মনে।

রাস্তা থেকে নানা রঙের পাথর নুড়ি কুড়িয়ে তা মাটিতে সাজিয়ে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন করতেন।

নাটকে চিত্রকর

নাটকের প্রতি যামিনী রায়ের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন সংযোগ ছিল। তখন ষ্টার থিয়েটারের কাছে হাতীবাগান বাজারের ওপর থাকতেন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। নাটকের সূত্র ধরেই শচীনবাবুর সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন। গল্পগুজবে সময় কাটাতেন। একসঙ্গে থিয়েটারেও যেতেন।

নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী সেই সময়ে থাকতেন বাগবাজার ষ্ট্রীটের ওপর একটি বাড়িতে। যোগেশ চৌধুরীর পিতা সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। যোগেশ চৌধুরীর সঙ্গেও যামিনী রায়ের বন্ধুত্ব গাঢ় ছিল। পারিবারিক যাওয়া আসা তো ছিলই। তিনি যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'সীতা' নাটকের সীন এঁকে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন চরিত্রের সাজ পোষাকেব ডিজাইনও নাকি এঁকে দিয়েছিলেন। নাটকটি হোত শ্রীরঙ্গমে। অভিনয়ে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শিশির ভাদুড়ী। শিশিরবাবুর সঙ্গেও মঞ্চ ও নাটকের নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করতেন।

যামিনী রায়ের নিজের কথায়, 'প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় পোর্ট্রেট এঁকে আর স্ক্যাচ করে ঐ থিয়েটারে আসবার সময় দু জায়গায় যেতাম—যোগেশ চৌধুরী আমার বন্ধু ছিল, আর শচীন সেনগুপ্ত—উনি ছিলেন আগে বিজলী কাগজ আরো দুটো কাগরেব এডিটর। উনি থাকতেন গ্রে-ষ্ট্রীটের ওপরে। ওঁর ওখানে এসে আর এক কাপ চা খেয়ে ।'

অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে যামিনী রায় শুধু মুগ্ধই ছিলেন না, তাঁর গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতেও যাওয়া আসা ছিল। কখনও কখনও সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ফিরতেন রাত্রে। পরবর্তীকালে অহীন্দ্রবাবু নতুন বাড়িতে উঠে এলেও যামিনীবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় টান পড়েনি এতটুকু। এছাড়া ষ্টার থিয়েটারের তত্ত্বাবধায়ক প্রবোধ গুহঠাকুর, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং নাট্য জগতের আরও অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল।

অভিনেতা নরেশ মিত্রের সঙ্গে যামিনী রায়ের সম্পর্কের পরিচয় মেলে বিষ্ণু দের 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা' লেখায়। বিষ্ণু দে লিখেছেন, 'প্রথমবার বরানগর যাওয়া হয় নরেশ মিত্র মহাশয়দের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা তাঁরা নাটকরূপে অভিনয় করবেন ; রাস্তায় দেখা, নরেশবাবু বললেন তাঁদের সঙ্গে কবির কাছে যেতে। ও'দের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যামিনী রায়ের পরিচয় বিশেষ একটা ঘটে ওঠেনি। যাইহোক, ও'রা যামিনীদাকে নিয়ে

গেলেন, তিনি নীচে বসে আছেন আর নরেশবাবুরা ওপরে গিয়ে নাটক নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ ওপর থেকে ডাক দিলেন, 'যামিনী আর গোপন থেকো না, এসো। যামিনী তুমি প্রকাশ হও।' তারপরে ওপরে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই বললেন, 'দেখ তোমার ওখানে মাঝে মাঝে যাবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু এরা আমাকে নিয়ে এমন করে যে যেতে পারি নে।'

পরে একবার যামিনীদা সস্ত্রীক যান। যামিনীদার মুখে শুনেছি, 'আপনার বউদিদি তো প্রণাম করে একটু দূরে স্থির দাঁড়ালেন, রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওগো তুমি কাছে এসে শোনো, যামিনী জীবনের যে কাজ গ্রহণ করেছে, তাতে তো ওর আর তোমার এক কাপড় আধাআধি করে পরে থাকবার কথা, যাহোক ও এরই মধ্যে সে পর্ব পেরিয়ে উঠেছে।"

বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ

খুব অল্প বয়সেই যামিনী রায় স্বাধীন জীবন যাত্রায় স্বনির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে বেলেতোড় থেকে নতুন এই মানুষটিকে নতুন এই শহরে একের পর এক নানান পেশায় নিযুক্ত হতে হয়েছিল। তিনি পড়তেন আর্ট স্কুলে। থাকতেন উত্তর কলকাতায় ঘর ভাড়া করে। চৌরঙ্গীতে আর্ট স্কুলে যেতেন পায়ে হেঁটে।

এই আর্ট স্কুলে পড়তে পড়তেই তিনি একবার কলকাতা ছেড়ে চলে যান এলাহাবাদে। সেখানে কাজ করতেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে। এই ছাপাখানার কর্তা ছিলেন চিন্তামনি ঘোষ। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপাবার জন্যে এই ছাপাখানায় লিথোগ্রাফ বিশেষজ্ঞ সামার সাহেবকে আনা হয়েছিল জার্মানী থেকে। সেখানে যামিনী রায় থাকতেন একটি মেস বাড়িতে। ওখানে সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকতেন। এই সামার সাহেবের অধীনে কাজের সুবাদে যামিনী রায় বিভিন্ন রঙ ও এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মেশাবার নানান কৌশল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

শোনা যায় তিনি কিছুদিন কলকাতায় এক ছোট রঙিন লিথোগ্রাফ প্রেসেও কিছুকাল কাজ করেন। কাজের জায়গা খুব ছোট বলে তিনি ঐ প্রেসের কাছে এক বাড়ির রোয়াকে বসে লিথোর কাজ করতেন। এক সময়ে এক ইহুদি ব্যবসায়ীর জন্যে বড়দিনের সময়ে রঙিন কার্ড এঁকে দিতেন। একশো কার্ড এঁকে পেতেন দশ বারো আনা। উত্তর কলকাতায় হরি পাল লেনে ছিল এক কাঠ খোদাইয়ের ছাপাখানা। এখানে রঙিন কাঠ খোদাইয়ের কাজ করতেন। আবার 'গরাণহাটা এনগ্রেভিং ছবির বর্ডারে রঙ দিতেন নামমাত্র মূল্যে, কঞ্চি বাঁশ ছুলে। পরে আমরা দেখতে পাই যে স্বনামধন্য ফরাসী শিল্পী ফেরর্ণা লেজের ঐ মোটা টানে ছবি আঁকতেন—যেন পাড় দিয়ে ধরে রাখা।'

দাদার গ্রন্থ ব্যবসায়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বই বয়ে নিয়ে

যেতেন মাত্র আনা চারেক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সন্ধ্যার দিকে শ্যামবাজারে এক কাপড়ের দোকানেও বসেছেন কিছুকাল খুব সামান্য অর্থের জন্যে।

শিল্পী জীমূতকান্তি রায়

জীমূতকান্তি রায়ের জন্ম ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। যামিনী রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মদাস, তারপর এই ছেলে। এই ছেলের কোলে বোন সুনীতি। চুঁচুড়াতে বিয়ে হয়েছিল সুধীর কুমার সেনের সঙ্গে। তারপর যথাক্রমে মৃণালকান্তি রায়, অমিয়কান্তি রায় ও মণি রায়। এর মধ্যে গুণী শিল্পী অমিয়কান্তি যামিনী রায়ের সারা জীবনের ছায়া সঙ্গী ছিলেন। ইনিও ১৯৮৬ সালে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

জীমূতকান্তি লোকান্তরিত হন মাত্র ষোল বছর বয়সে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে। অমিয় রায়ের আগে তিনিই পিতাকে ছবি আঁকার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। নিজেও ছবি আঁকতেন। ছবির হাত খুব ভাল ছিল। রামায়ণের ওপর আঁকা তাঁর চিত্র কলা রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

জীমূতকান্তির একটি ছবি দেখেছি তাঁর দাদা ধর্মদাস রায়ের বাড়ীতে। শাল পিয়াল বটের অসংখ্য ঝুড়ি নেমেছে। এক পাল শুয়োর সেই নির্জন প্রান্তরে হেঁটে চলেছে। পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে মর্মরধ্বনি যেন পরিবেশকে সরব করে তুলেছে। সুন্দর ছবি। জলরঙে আঁকা। তবে বিবর্ণ। দু এক জায়গায় পোকায় কেটেছে।

বাড়ীর অদূরেই ছিল শালবন। সে ঘন জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর বাস তো ছিলই। আক্রমণও হত। যামিনীরায়ের পুত্র জীমূতকান্তিকে এই জঙ্গলের কাছে বুনো শিয়ালে খেয়েছে বলে শোনা যায়। তবে আসলে যে কি ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। অন্যমতে, জীমূতকান্তি দুই বন্ধুর সঙ্গে কলকাতা থেকে বেলিয়াতোড় বেড়াতে যায়। একদিন তিনবন্ধু বাড়ী থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ঘুরতে বেরোয়। জীমূতকান্তি হারিয়ে যায়। অনেক সন্ধান করেও না পেয়ে দুই বন্ধু ফিরে আসে। তারপর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জীমূতকান্তির ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায়। ৭ই জুন ১৯৩৩ এর অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ জীমূতকান্তি নাকি আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

শিল্পী বন্ধুদের আড্ডায়

যামিনী রায়ের খুব কাছের মানুষ ছিলেন (১৮৯৮-১৯৭৭) শিল্পী অতুল বসু। তাঁর বণ্ডেল রোডের বাড়িতে যামিনী রায়ের অবাধ যাওয়া-আসা, দুই বন্ধুতে শিল্পের সুখ দুঃখ নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা হত।

তবে প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দুজনের দেখা হোতই। ঐ দিন নিয়মিত আগন্তুকদের তালিকায় ছিলেন আরও দুজন শিল্পী। এঁরা হলেন সতীশ সিংহ ও যোগেশ শীল। এ ছাড়া আরও অনেকেই আসতেন।

সতীশ চন্দ্র সিংহ (১৮৯৩—১৯৬৫) থাকতেন উত্তর কলকাতার নাথের বাগানে। কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অফিসিয়েটিং অধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেছেন। প্রতিকৃতি অঙ্কন, পুরাতন চিত্র পুনরুদ্ধার ও গ্রন্থ ইলাসট্রেসনের কাজে খুব নাম ডাক ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তাঁর আঁকা শরৎচন্দ্র বসু এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-এর প্রতিকৃতি রয়েছে।

সতীশ সিংহের মত যোগেশ চন্দ্র শীলও (১৮৯৫-১৯২৬) শিল্পী যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারা চিত্র চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলার নারীকে নানান রূপে রঙে ছবিতে প্রতিষ্ঠা করে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবির মধ্যে রয়েছে 'সদ্যোস্নাতা', সদ্যোস্নানসিক্ত বসনা, 'মা' প্রভৃতি।

যোগেশ শীল রণদাপ্রসাদ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'জুবিলি আর্ট আকাডেমিতে চিত্রশিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন অতুল বসু ও হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯৫—১৯৪৮)। প্রতিকৃতি এবং সিক্তবসনা এবং নগ্ন নারীর বিচিত্র ভঙ্গী এবং দেহসৌষ্ঠব এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

'জুবিলি আর্ট আকাডেমি'র (১৯১৯) চারুকলা চর্চা চলতো হেমেনবাবুর সেই আমলের ২৪, বিডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে। এখানে ভবানী চরণ লাহা এবং যামিনী রায়ও নিয়মিত আসতেন বলে শোনা যায়। তিনি এই শিল্পীচক্র গঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। এখান থেকে 'দি ইণ্ডিয়ান আকাডেমি অব আর্ট' নামে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হত।

আগের কথায় ফিরে আসি। বণ্ডেল রোডে অতুল বসুর বাড়িতে বৃহস্পতিবারের আড্ডায় শিল্পকলা ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হত। মুড়ি ছানার গজা আর চা আসত অতিথিদের জন্যে।

যামিনী রায়ের অনুরোধে খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি অতুলবাবুর স্ত্রীকে একদিন বললেন, 'বৌদি মাংসের স্টু করলে কেমন হয়। আপনার তৈরি করতে কোন অসুবিধাই হবে না। কুকারে কেমন করে রাঁধতে হয় আপনাকে দেখিয়ে দেব।' কয়েক দিন পর সত্যিই যামিনীবাবু কুকার এনে হাজির করলেন এবং বৌদিকে শেখালেন। এর পর থেকেই প্রায়ই মাংস এবং সঙ্গে সেকা পাউরুটি থাকত। যামিনীবাবুর প্রিয় ছানার গজা বাদ দেবার উপায় ছিল না। এই আড্ডা বৃহস্পতিবারের প্রতি সন্ধ্যায় বসতো। চলেছিলো এক নাগাড়ে পাঁচ ছ বছর। কখন কখনও যামিনীবাবুর বাগবাজারের বাস-ভবনেও বৃহস্পতিবারের আড্ডা যে বসেনি এমন নয়। অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন 'বৃহস্পতিবারের বারবেলার আড্ডা'। এসব পুরনো দিনের গল্প শোনা শিল্পী অতুল বসুর পত্নী শ্রীমতী দেবযানী বসুর কাছে।

প্রতি পূর্ণিমাতেও শিল্পীদের এক এক জনের বাড়িতে ঘুরে ফিরে আর এক আসর বসত। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'যামিনী

রায়' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অতুল বসু, হেমেন্দ্র মজুমদার, সতীশ সিংহ প্রমুখ শিল্পীদের একটি সংস্থা ছিল, তার নাম শিল্পী-চক্র। ঘুরে ঘুরে প্রতি পূর্ণিমায় শিল্পীদের এক এক জনের বাড়িতে তার এক একটি অধিবেশন হত। মেলামেশা আলাপ আলোচনা ও খাওয়া দাওয়াটাই প্রধান ছিল তার কর্ম-সূচীতে, বিশুদ্ধ শিল্পতত্ত্ব নিয়ে কমই কথাবার্তা হত তা হত কদাচিৎ কেউ একটা প্রবন্ধ ট্রবন্ধ পড়লে।' প্রতি পূর্ণিমায় এমন আর একটি অধিবেশনের কথা প্রয়াত অমিয় রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী রেবা রায়ের কাছে শুনেছি।

কলেজষ্ট্রীটের কাছে কেশব সেন ষ্ট্রীটে 'কীর্তি' সিনেমার এখন নাম হয়েছে 'জহর'। এই সিনেমা হলের কাছাকাছি ছিল চারু রায়ের বাড়ি। এখানেও শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়মিত এক আড্ডা বসত। এই আড্ডায় আসতেন যতীন বাগচী, নলিনী সরকার, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন মজুমদার, হরেন গুপ্ত এবং পূর্ণ চক্রবর্তী। যামিনী রায় এখানে প্রায়ই আসতেন বলে শুনেছি পূর্ণ চক্রবর্তীর মুখে।

আবির্ভাবকালে শিল্প আবহাওয়া

ইয়োরোপীয় প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতিতে যামিনী রায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শিল্পী জীবনের সূচনায় প্রতিকৃতি রচয়িতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশের বাইরে গিয়েও পৌঁছিয়েছিল। ডাক পড়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে। শশীহেস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন থেকে একটি প্রতিকৃতি এঁকে দিয়েছিলেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। চৌদ্দ বছর পরে শশী হেস অঙ্কিত এই তৈলচিত্রটির অনুলিপি করেছিলেন যামিনী রায়। সে ছবি দেখে অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ দু'জনেই খুশি হয়েছিলেন। এই ছবি এখন আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।

যদুনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কত মানুষের প্রতিকৃতিই না রচনা করেছেন। প্রতিকৃতি চিত্রে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক ও সি গাঙ্গুলিও তাঁর পিতা মাতার আলেখ্য রচনা করিয়েছিলেন যামিনী রায়কে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে ও সি গাঙ্গুলি লিখেছেন, 'তেল রঙ এ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তিনি এককালে পোট্রেট রচনা করেছেন। অতি চমৎকার। আমার পিতা মাতার অয়েল পোট্রেট করে দিয়েছিলেন বহুদিন আগে এবং তা হয়েছিল অতি উঁচুস্তরের প্রতিমূর্তি।'

পাশ্চাত্য প্রথায় তাঁর গুণগত উৎকর্ষ কত উঁচু সুরে বাঁধা ছিল তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে শুধু প্রতিকৃতিতে নয়, বেশ কিছু আলোকোজ্জ্বল ইমপ্রেস-নিস্টিক নিসর্গচিত্রেও। কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। নন্দন তত্ত্বের শেকড়ের সন্ধানে অস্থির হয়ে ওঠেন। খ্যাতি ও অর্থের লোভকে সংবরণ করে খুঁজতে থাকেন নিজস্ব শিল্পভাষা। অনুভূতিকে তুলির টানে অনন্তকালের করে তোলার বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শুরু হয় সংগ্রাম।

এই কঠিন সংগ্রামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে পেছনে ফেলে আসা সেই সময়ের দিকে তাকাতে হবে এক ঝলক। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। ইংলণ্ডে নিসর্গের ছবি প্রাধান্য পাচ্ছে। কনস্টেবল, টার্নার, ব্লেক, রসেটি প্রমুখ শিল্পীরা তখন দারুণ জনপ্রিয়। ফ্রান্সে ইমপ্রেসনিস্ট আন্দোলন জোরদার। ভ্যানগখ, রোঁদা, গঁগা প্রভৃতি শিল্পীদের অপরিসীম প্রভাব প্রবাহ। পিকাসোও তখন শিল্পের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত।

এদিকে ভারতশিল্পে সেই সময় মিনিয়েচার ছবির যুগটি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মুঘল ঘরানায় যে বিভিন্ন আঞ্চলিক কলম-এর উদ্ভব হয়েছিল তাও থিতিয়ে আসছিল। ইয়োরোপীয় রীতি আশ্রিত আলগিরি নাইডু ও রাজা রবিবর্মার ধারা তখনও অক্ষুন্ন।

পরাধীনতার সে যুগে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পকলার ব্যাপক আমদানী হয়েছিল এদেশে। ভারতবর্ষের তখন খ্যাত অখ্যাত অনেক রূপকার নন্দন প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন এই বিদেশজাত শিল্প ঐশ্বর্যে। সে যুগে বাস্তববাদী পাশ্চাত্য চিত্রকলার এদেশে অন্যতম প্রধান হোতা ছিলেন রণদাপ্রসাদ গুপ্ত। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অতুল বসু। শিল্পকীর্তির জোরে আজও যাঁরা স্বনামধন্য হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে হেমেন মজুমদার, শশী হেস, সতীশ সিংহ এবং যোগেশ শীলের নাম।

অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর প্রখর সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয়েছিলেন সে যুগের বহু শিল্পী। সেই রচনারীতিকে অনুসরণ করে সৃষ্টিলীলায় মেতে উঠেছিলেন নন্দলাল, বিনোদবিহারী, অজিত হালদার, ক্ষিতীন মজুমদার, ভেঙ্কটাপ্পা, দেবীপ্রসাদ এবং আরও অনেকে।

পাশ্চাত্য এবং নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি—এই দুই জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী প্রভাব প্রবাহ অনেক দূরে সরে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী যামিনী রায় একক অভিযান চালালেন সাহসী নাবিকের মত। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে ইয়োরোপীয় শিল্প ঐতিহ্য অনুসরণ ও অনুকরণে যা সৃষ্টি হবে তা না খাঁটি ইয়োরোপীয় না ভারতবর্ষীয়। এই অনুভব যামিনী রায়কে নতুন শিল্পভাবনায় আক্রান্ত করেছিল। তিনি রূপলোকের এমন এক নবতর শরীর সন্ধানে আত্মস্থ হয়েছিলেন যা এ দেশের জল হাওয়ায়, রৌদ্র ছায়ায় মাটিঘেষা।

যামিনী রায়ের নিজের কথায়, 'আজকের দিনে এই কথা, যত কথাই বলি না কেন, একটিমাত্র সঙ্কল্প ছিল আমার, যে এই কোন রাস্তায় যাব? কিন্তু দেখি ইয়োরোপের মতো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, চীনের মতো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তিব্বতের মতো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—পারসিয়ান বা মোঘল পেইন্টিং বা এই যেসব, এ আমার পক্ষে···কেননা আমি সেই পরিবেশে নেই। কাজেই রাস্তা খুঁজতে নিজের মধ্যেই অন্বেষণ করতে হয়েছে, যে এই

রাস্তা খোঁজার জন্যে তাতে কি সংকল্প ছিল একটি, না ঐরকম চেহারা হবেনি —ছবি ভাল কি মন্দ তা আজও আমার ইয়ে নয়, আমার সংকল্পের মধ্যে নয়। আমার সংকল্প হচ্ছে চেহারাটি আলাদা হোক। তারপর এর গুণবিচার। আগে দর্শন, তবে গুণ, আগে দর্শনধারী তবে গুণবিচারী। আগে দর্শন, তাই তাতে এর চেহারাটা আলাদা—এইটিই হোক, এইটিই ছিল সংকল্প। তারপর যখন আলাদাটা, মোটামুটি সর্বজনে দেখে বললেন, হ্যাঁ, আলাদা হয়েছে— আমি চেষ্টা করেছি তারপর হ'ল কি, তা এই কাজের মধ্যে দিয়েনিজেকে জানা।'

বেলেতোড়ে শেষ যাত্রা

বেলেতোড় থেকে যামিনী রায় কলিকাতায় আসেন ১৯০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভর্তি হন কলকাতার গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টএ। তারপর মাঝখানে অনেক-বারই সেখানে গেছেন। আবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন। থাকতেন উত্তর কলকাতায় একটা ঘর ভাড়া করে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর যামিনীবাবু আর বেলেতোড়ে যাননি। সেই তাঁর শেষ যাওয়া। ছিলেন বছর দেড়েক।

এই যাওয়া অনেকটা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছিল। তা বোঝা যায় ১৮ ৩. ৪২ তারিখে বিষ্ণু দেকে লেখা পত্রে। যামিনী রায় লিখেছেন,

শ্রীশ্রী হরি

প্রিয়বরেষু, ১৮।৩।৪২

আজ এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম, আমি এসেই পত্র দিতাম, কিন্তু পাঁচ বৎসর দেশে আসি নাই নানা অসুবিধার মধ্যে পড়ে পত্র দিতে দেরী হচ্ছিল, এখানে না আসার অনেকখানি চেষ্টা করতে হয়েছে নিজের মনের সঙ্গে আর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শেষে হার মেনে, অত্যন্ত অশান্ত মন নিয়ে আসতে হোয়েছিল।…

আপনাদের যামিনীদা।

একরকম নয় অনেক রকমের অশান্তি এখানে বসে শিল্পীকে ভোগ করতে হয়েছে। কলকাতার শিল্পসংস্কৃতি এবং গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। শহীদ সুরাওয়াদী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মৃণালিনী এমার্সন, অরুণ সিং, জন আরউইন, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্রদের সঙ্গে প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন. শিল্পের সুখ দুঃখ নিয়ে কথা বলতেন চিঠিপত্রে। অন্যদিকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন শিল্পের নিত্য নতুন শরীর সন্ধানে। তার ওপর ছিল অর্থনৈতিক অনটনের জোরালো ধাক্কা। একসঙ্গে এতগুলো পারিপার্শ্বিক এবং অন্তরের চাপ স্যমলাতে যে কি পরিমাণ ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে তা কেবল তাঁর কাছের মানুষরাই জানেন। আমরা কেবল কিছুটা অনুমান করতে পারি সেই সময়ে বেলেতোড় থেকে লেখা পত্রাবলী থেকে।

১৯৪২ এর পর যামিনী রায় বেলেতোড় যাননি বটে, কিন্তু নিরন্তর জন্মভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সব বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করতেন।

বেলেতোড়ের বাড়ীতে প্রতি এক বছর অন্তর ভাগের দুর্গা পুজোর পালা সেই কবে থেকে শুরু হয়ে আজও হয়ে আসছে। পুজোর আয়োজন ষোল কলায় পূর্ণ করতে শেষ বয়েসেও যামিনী রায়ের উৎকণ্ঠা উৎসাহের জোয়ারে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি।

আগেই বলেছি বেলেতোড়ের এই পিতৃ আবাসে শেষ গিয়েছিলেন ১৯৪২এ। বোমার আতঙ্কে তখন যে যেদিকে পারছে শহর কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। অনন্যোপায় হয়ে, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই শিল্পী গিয়েছিলেন স্মৃতিঘেরা জন্মভূমিতে। ছিলেন বছর দেড়েক। ঐ সময়ে বিষ্ণু দের সঙ্গে চলে দীর্ঘ পত্রালাপ। বিষ্ণু দে সপরিবারে শিল্পীর আমন্ত্রণে বেলেতোড়ে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন জন আরউইনও। ইনি ছিলেন বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর কে সি র প্রাইভেট সেক্রেটারি। বিষ্ণু দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আরউইন পরবর্তীকালে যামিনী রায়ের ছবির ভক্ত হয়ে পড়েন। বিষ্ণু দে ও জন আরউইনের লেখা যামিনী রায়ের ওপর একটি গ্রন্থ ১৯৪৪ এ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনে ভারতীয় শিল্পী বিশেষজ্ঞ আরউইন সাহেব ১৯৮১ র গোড়ার দিকে মাস খানেকের জন্যে এসেছিলেন কলকাতায়। ছবি দেখতে গিয়েছিলেন যামিনী রায়ের ষ্টুডিওতে। মুকুল দে, রাণীচন্দ এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে গিয়েছিলেন বেলেতোড়ে যামিনী রায়ের আশ্রয়ে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের মুখে শুনেছি তিনি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এক দিন যামিনীবাবুর বেলেতোড়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি ঐ অঞ্চলে কর্মসূত্রে থাকতেন।

গুণগ্রাহী গগনেন্দ্রনাথ

১৯৩১ খৃস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১১৫টি.শিল্প নিদর্শন নিয়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগে সমবায় ম্যানসনে যামিনী রায়ের এক একক চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। সোসাইটির উদ্যোক্তা অবনীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হলেও এ ব্যাপারে অন্তরালে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। তিনি যামিনী রায়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর 'মা ও ছেলে' ছবিটি কিনেছিলেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক। আর প্রদর্শনী উপলক্ষে 'আর্ট অফ যামিনী রায়' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন অধ্যাপক ও শিল্প সমালোচক শাহিদ সুরাবর্দী।

দীর্ঘ জীবনে যামিনী রায়ের ছবির বহু প্রদর্শনী হয়েছে দেশে বিদেশে। তবে আর্ট স্কুল থেকে পাশ করার পর প্রথম ছবি প্রদর্শিত হয় ১৯১৯-এ সরকারি আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে। তারপর এই আর্ট স্কুলেই একক প্রদর্শনী হয় ১৯২৯। ১৯৩১ এ নিজের বাসভূমি আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে ও ১৯৩৮-এ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিটে ভাস্কর ক্ষিতীশ রায়ের স্টুডিওতে। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে শিল্পীর ১—২ বি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, বাগবাজারে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। চলেছিল ১৭ তারিখ পর্যন্ত। ১৯৪৬এ লণ্ডন ও পরে ১৯৫০ নিউইয়র্কে'ও একক ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। তারপর আরও অনেক।

কিন্তু তিনি জীবনভোর ১৯৩৭ এ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীর কথা ভুলতে পারেননি। বিশেষত তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী গগনেন্দ্রনাথ ঐ প্রদর্শনীর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করেন।

তারপর গগনেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি স্মরণ 'স্মৃতিকথা' এই নামে একটি ছোট রচনায় যামিনী রায় লিখেছেন, '···এরপর একটি ঘটনার কথা ছবি দেখার মতো আজ আমার মনে পড়ছে। নবু তখন ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির সম্পাদক। একদিন নবু এসে বুলল যে আমার ছবির প্রদর্শনী করবে। নিয়ে গেল টেনে বড় বড় ছবি তার বাবার কাছে। নবু বল্লে—বাবার ইচ্ছে যে আর একবার আমার আঁকা ছবিগুলো দেখেন। সে যে কত বড়ো আনন্দের দিন সে আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। আজও মনে করে রেখেছি।

শ্রদ্ধেয় গগনবাবুই আমার ছবির প্রথম প্রশংসা করেন। যখন প্রদর্শনী খোলা হ'ল গগনবাবু তখন অসুস্থ। তখন তিনি বাকশক্তিরহিত, ঠিক মতো দাঁড়াতেও পারেন না। আমার ছবি দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। তিনি চোখের জল দিয়ে আমার ছবির প্রশংসা করে গেলেন, জানিয়ে দিলেন আমাকে তাঁর অন্তরের কথা—আমাকে তিনি কত ভালবাসেন, স্নেহ করেন।

আজ নবু নেই, সবাই সরে গেছে আমার চারপাশ থেকে। আমি কাজ করে চলেছি তাঁদের স্নেহ ভালবাসা আশীষ নিয়ে।'

'নবু'র পুরো নাম নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯১০—৮১) প্রতিভাবান শিল্পী। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে প্রদর্শনীর পর থেকেই যামিনী রায়ের ছবির জনপ্রিয়তা যে বাড়তে থাকে তা আগেই বলেছি। কিন্তু জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছবির চাহিদা বাড়তে থাকে চল্লিশ দশকের প্রারম্ভ থেকে।

এল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কাল। যামিনী রায়ের ছবি কবি শিল্পী

সমালোচক ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। তখনকার গভরনর মিঃ কে সি, মিসেস কে সি, শাহিদ সুরাওয়ার্দী, স্টেলা ক্যামরিশ, জন আরউইন, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অতুল বসু, মৃণালিনী এমার্সন প্রভৃতি যশস্বী ব্যক্তিদের দ্বারা ছবি উচ্চ প্রশংসিত হয়। পরাধীন কলকাতাতে বিদেশীরাও ছবির ভক্ত হয়ে ওঠেন। প্রচুর ছবি বিক্রি হয় স্বদেশে। বিদেশেও যায় শিল্পীর শিল্পখ্যাতি দেশের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন 'যামিনী রায় এ্যাণ্ড ট্রাডিসন অব পেইন্টিং ইন বেঙ্গল' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ। পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর (১৯০১-১৯৬০) গ্রন্থ-'দা ওয়ার্ল্ড অব টুইলাইট'-এ এই প্রবন্ধ স্থান পায়। 'যামিনী রায়'—এই নামে বিষ্ণু দে ও জন আরউইনের লেখা বই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে ১৯৪৪-এ প্রকাশিত হয়।

বিষ্ণু দের সঙ্গে পরিচয়

কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) যামিনী রায়ের শুধু ছবির ভক্তই ছিলেন না ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। বিষ্ণু দের সঙ্গে যামিনী রায়েরআলাপের সূত্রপাত কেমন করে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় বিষ্ণু দের লেখা 'যামিনী রায়' নামক প্রবন্ধে।

আরও জানার আকাঙ্ক্ষায় কবিপত্নী শ্রীমতী প্রণতি দেকে চিঠি লিখেছিলাম। উনি এক পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে যামিনীদার আলাপ কেমন করে তা তো সঠিক জানা নেই। আমার স্বামী ছবি খুব ভালবাসতেন ছোটবেলা থেকেই। অনেক এলবামে ছবি কেটে কেটে রাখতেন। এখনও আছে কিছু। আর প্রিণ্টস যোগাড় করতেন। ওঁর এক মাষ্টারমশাই এই গুণটি এনকারেজ করতেন। ওঁকে জাপানী এবং চীনে ছবির প্রিণ্টস এনে উপহার দিতেন। 'ছড়ানো এই জীবনে' উনি এ কথা আমাদের বলেওছিলেন। ওঁর নিজের লেখা 'যামিনী রায়' বইটিতে উনি লিখেছেন, "আমরা অনেকেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে যামিনীদার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। প্রথম বাগবাজারের গলির বাড়িতে জলধর সেনের শিল্পোৎসাহী পুত্র অজিত সেন, যিনি কল্লোল অফিসে নিয়মিত বসতেন, তিনি নিয়ে যান। তাঁর বন্ধুত্ব ছিল দীনেশ রঞ্জন দাসের সঙ্গে সঙ্গে এবং এঁরা যামিনী-বাবুর ছবি ছাপাতেন কল্লোল পত্রিকায় হালকা এক রঙা ব্লক দিয়ে। অজিতবাবু আমায় একদিন আনন্দ চাটুজ্যের গলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্টেলা ক্রামরিশা তখন ভারতীয় শিল্প জগতে কাজ করতেন। তিনি উঠানের চৌকাঠে জোর করে আলপনা দিইয়েছিলেন। আমি আর সেই আলপনা ডিঙিয়ে ঢুকিনি।'

আমার স্বামী তারপর যামিনীদার বাড়ি গিয়েছিলেন পরে। উনি সিমেণ্ট বা মার্বেল মেঝের ওপর আলপনা দেওয়া পছন্দ করতেন না। আমি বেলেতোড়ে ও'র (যামিনীদা) বোনেদের দেওয়া আলপনা দেখেছি। সে যে কি সুন্দর কি বলবো, সুজনদিদি ও বিজনদিদির করা অপূর্ব। আর বুড়ো আঙুল দিয়ে কাগজে নক্সা করা—সেও দারুণ। শুনেছি যামিনীদার বাবাও এই কাজ অপূর্ব করতেন।

যামিনীদার সঙ্গে ও'র আলাপ নিশ্চয়ই আগেই হয়েছে। যামিনীদা তো মাঝে মাঝে সুধীনবাবুর বাড়িতে "পরিচয়"-এ শুক্রবারের আড্ডায় যেতেন। উনি তো শরীর ভালো থাকলে, যেতেনই। সেতো ১৯৩০—৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪-এর প্রতি শুক্রবার। আমাদের বিয়ে হয়েছে ৩৪এ। তারপর তো দেখেছি ও'কে যেতে প্রায় প্রতি শুক্রবারই। আমিও তো গেছি ১৯৩৫ এ। যামিনীদা আমাদের বাড়িতে এসেছেন ১৯৩৯এ আমাকে ও'র রঙ ব্যবহার করা শেখাতে।'

বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের চিত্রকলার বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ কয়েকটি রচনা লিখেছেন। তারমধ্যে প্রথমেই মনে পড়ছে বিষ্ণু দে এবং জন আরুইন এর যৌথ উদ্যোগে লেখা 'যামিনী রায়' নামে ছবি-সম্বলিত বইটির কথা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪এ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে। জন আরুইন বিষ্ণু দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং সেই সময়ে বাংলার গভর্ণর কে সির ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। এখন বিলেতে ভারতীয় শিল্প বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত।

যামিনী রায় সংক্রান্ত বিষ্ণু দের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে 'পরিচয়' ও 'সাহিত্যপত্র'তে ছাপা হয়। ঐসব পুরনো প্রবন্ধ এবং আরও কটি রচনা নিয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে, মহালয়ায় 'যামিনী রায়' এই নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মহৎ শিল্পীর দীর্ঘ জীবনের শিল্পকর্ম নিয়ে লেখেন একালের আর এক মহৎ কবি। এই গ্রন্থটি 'প্রতিভাস' প্রকাশনা থেকে শিল্পীর জন্ম শতবর্ষে পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

যামিনী রায়ের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী ছিল খুবই সাদাসিধে। শৃংখলা আর নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়েই তাঁর জীবন অতিবাহিত। ভোর পাঁচটায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। ছটার মধ্যে নীচে নেমে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে পুজোয় বসতেন। আলাদা কোন ঠাকুর দেবতা নয়। নিজের আঁকা দেব-দেবীর ছবিতে ফুল দিয়ে জল গ্রহণ করতেন।

সকাল আটটার মধ্যে জল খাবার খেতেন। প্রাতঃরাশে থাকতো মুড়ি বাদাম বা ছোলাভাজা, ঘরে তৈরি সন্দেশ আর চা। খুব ভালবাসতেন বলে প্রায়ই বেলের মোরব্বা ঘরে তৈরি করা হত। ছানার গজাও পছন্দ করতেন। সকালের খাবার একটা বড় কাঁসার বাটিতে খেতেন।

জল খাবার খেয়ে সোজা নেমে যেতেন একতলায় ষ্টুডিও ঘরে। চারঘণ্টা একটানা ছবি আঁকতেন। শেষের দিকে অবশ্য বয়েসের ভারে ক্লান্ত হয়ে সব সময়ে পারতেন না। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন।

ঠিক দুপুর বারটায় আহারে বসতেন। ভাত ডাল সুক্তো, আর ডাটা পোস্ত বা কাঁচা পোস্ত হলে তো কথাই নেই। খুব ভালবাসতেন। নিরামিষ আহারে তৃপ্তি পেতেন। আমিষের মধ্যে মাছ খেতেন। ডিম মাংসের মোটেই ভক্ত ছিলেন না। বরং বলা ভাল অপছন্দ করতেন।

দুপুরের আহার শেষ করে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম। এক ফালি ছোট কাঠের তক্তায় হেলান দিয়ে আরাম কেদারায় শোবার মত দেহটাকে এলিয়ে দিতেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে আবার তন্ময় হয়ে যেতেন নিজের আরাধ্য কাজে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় একতলার ষ্টুডিও ঘর ছেড়ে ওপরে উঠে আসতেন। তখনই পরিবারের সবাইকার সঙ্গে কথা বলতেন। গল্প করতেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য ছোট খাটো স্কেচ করতেন প্রায় দিনই। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে রাত্রের খাওয়া সেরে ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক নটায় শুয়ে পড়তেন। দুবেলা দুটো পান খেতেন। মাঝে মাঝে বিড়ি। সাহেবসুবো এলে সিগরেট।

আখের গুড়ের প্রতি সাংঘাতিক আসক্তি ছিল। এক নাগড়ী গুড় এক সপ্তাহে খেয়ে শেষ করে দিয়েছেন এমনও হয়েছে। দুধভাত পেলে মহাখুশি হতেন। আপেল আম আমসত্ব দারুণ প্রিয় খাবার ছিল।

পোষাক পরিচ্ছদ ছিল খাঁটী বাঙালীর মত। পরতেন লংক্লথ কিংবা মার্কিনের ঢিলে ঢালা পাঞ্জাবী। বাড়িতে অবশ্য পরতেন দু পকেট ওয়ালা তিন ঘরা ঢিলে হাতা ফতুয়া। বাইরের লোকজন এলে কিংবা বাড়ির বাইরে গেলেই সাধরণতঃ পাঞ্জাবী গায়ে চড়াতেন। আর বাইরে গেলে কাঁধে উঠত উড়নি। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটী। আটহাতি মিলের কাপড় ব্যবহার করতেন।

দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। বাড়িতে নারায়ণ কিংবা শালিগ্রাম শিলা পুজোর সময় উপবাস করতেন। পুজো শেষ হলে তবেই জলগ্রহণ। পুজো পাঠের সময় বাড়ির সবাইকে কাছে ডাকতেন।

নানা রকম সংস্কার ছিল। তেরো তারিখ বা বৃহস্পতিবার মানতেন। কোন শুভ কাজ এসব দিনে করতেন না। এমন কি নতুন দেশলাই পর্যন্ত ভাঙ্গতেন না। পাঁজী দেখার বাতিক ছিল। যে কোন শুভ কাজ কিংবা অশুভ যাত্রার আগে পাঁজী খুলে দিন ক্ষণ দেখে নিতেন সময়টা কেমন। চিঠি লেখার সময় 'শ্রী শ্রী হরি' এই কথাটি লিখে তবেই শুরু করতেন।

বাড়ির মহিলাদের জন্যে হালকা রঙের শাড়ি পছন্দ করলেও প্লেন সাদাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সাদা সিল্কের কিংবা সরুলাল পাড় ধবধবে সাদা শাড়ি কেউ পরলে খুশি হতেন। সাদা খোলের ঢাকাই শাড়ির ওপর দুর্বলতা ছিল।

নিজে খুব ফিটফাট এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। ময়লা কাপড়, এলোমেলো চুল, অগোছাল জিনিষ পত্র দেখলে চটে যেতেন। বুকসেলফে সাজান বই, তাবে মেলা ভিজে কাপড়, এমনকি জানলা দরজার খোলা বা বন্ধ কপাট পর্যন্ত ঠিক ঠিক না হলে ভীষণ রাগ করতেন। নিজের হাতে তা ঠিক করে দিতেন। এর থেকে বোঝা যায় শুধু ছবি নয় দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রতি ছোট খাটো বিষয়ের শৃঙ্খলার দিকেও তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি সদা সজাগ থাকতো।

গ্রন্থ প্রচ্ছদ

যামিনী রায় কবি বন্ধু বিষ্ণু দের অনেকগুলো বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি হল 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'। এই কবিতা গ্রন্থটির জন্যে বিষ্ণু দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে বইটির প্রথম প্রকাশকাল, বৈশাখ, ১৩৮০। উৎসর্গে লেখা ছিল। 'শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কে 'তাই পরালাম রাখী'।'

নাভানা থেকে প্রকাশিত 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতার' সব কটি সংস্করণ ছাড়াও অপর বইগুলোর নাম জানার জন্যে কবি পত্নী শ্রদ্ধেয়া প্রণতি দে কে চিঠি লিখি। তার উত্তরে উনি লেখেন 'যামিনীদা ওঁর (বিষ্ণু দে)' 'পূর্বলেখ' বইয়ের মলাট ডিজাইন নিজেই এঁকে দেন। তার ওপর মলাটের কাগজ অমৃত বাজার পত্রিকার ও যুগান্তরের ছাপার কাগজের প্যাকেট, যে মোটা কাগজে ওদের মুড়ে আসতো, সেই কাগজের মলাট দিয়ে কভার করান। আমার কাছে একটা আছে রিখিয়াতে। বই তো আর পাওয়া যায় না। দুটো রঙে ওই ডিজাইন ছাপা হয়। একটা নীলে, একটা লালে। 'হে বিদেশী ফুল' ও 'সাত ভাই চম্পা' ও 'মাও সে তুঙের' প্রথম এডিসন যামিনীদার ডিজাইন। 'শুধু পঁচিশে বৈশাখ' ও 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' ও তাই।' "স্মৃতি সত্তার" দুটি সংস্করণ। দ্বিতীয়টা রমেন মুখার্জীর করা। সেই ডিজাইনটা পাওয়া যায় নি বলে পরে আরেকটা দেন, যেটা আমাদের পরিবারের সব বিয়েতেও ব্যবহার করা হয়। এটার একটা ইতিহাস আছে। কলকাতায় থাকলে উনি—(বিষ্ণু দে) প্রায়ই যামিনীদাকে বলতেন, 'বই বেরুবে।' যামিনীদা শুনে বলতেন, 'সাইজটা বলুন, বইয়ের মলাট ডিজাইন করে দেবো।' এমন পরম বন্ধু, আত্মীয়েরও বাড়া আমরা কমই পেয়েছি। আরেকজন পরম বন্ধু ছিলেন বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর কথা ভাবলেও মনটা আনন্দে ভরে যায়। এঁদের মত মানুষ কমই হয় এ পৃথিবীতে।'

১৯৪৬ এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল' বইটির প্রচ্ছদ পট যামিনী রায়ের অলঙ্কৃত। লেখক গ্রন্থটি শিল্পীকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন; 'শিল্পী যামিনী রায়কে/চিত্রকলার আলোচনায় আমার অধিকার নেই/তাই

আপনার প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম/এই বই আপনাকে উৎসর্গ করেই।' কবি সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'রাত্রিকে দিনকে' কাব্য সংকলনেরও প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন যামিনী রায়।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' বিষয়ে বিষ্ণু দে কে লেখা যামিনী রায়ের চিঠি—

শ্রীশ্রীহরি

পরম প্রিয়বরেষু, ২০।৪।৬৩

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ বই খানি প্রবন্ধ কিছু ও কবিতাও কিছু—না পুরা কবিতায় লেখা জানালে ভাল হয়। উপরের রূপটির জন্য ভাবছি, শুধু হাল্কা ইণ্ডিয়ান রেড—কিম্বা দুটি রং এ করবা কিনা ভাবছি বেশি রং ব্যবহার করলে ব্লক করতেও খরচ বড্ড বেশী, যাই হোক যে টুকু জানতে চেয়েছে—জানালেই হবে। আগামী কালই পাবেন ছবিটী—আশাকরি সবলে ভাল আছেন।

শুভকামনা জানাচ্ছি। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

[এই পত্রটি বিষ্ণু দের লেখা 'যামিনী রায়' গ্রন্থ থেকে পূর্ণ মুদ্রিত।]

শিল্পীর আবাস

যামিনী রায়ও সপরিবারে বেলেতোড়ের বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের মত একই বাড়ীতে তিনি বেশিদিন থাকতে পারতেন না। তাই বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার এই চৌহদ্দীর মধ্যে কতবারই না আবাস পরিবর্তন করেছেন। শেষকালে একনাগাড়ে খুব বেশিদিন কাটিয়েছেন বাগবাজারে যুগান্তর অফিসের গায়ে ১/২ বি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে। এই বাড়ীতে ছিলেন ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই গৃহে বহু জ্ঞানী ধনী মানুষের চরণ স্পর্শ পড়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন

শিল্পী কর্তৃক ঘরের নকশা
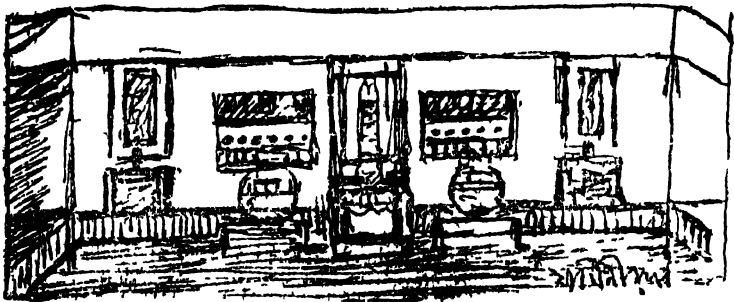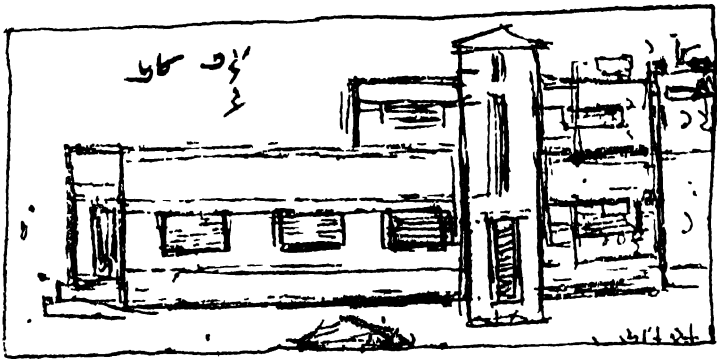
শিল্পী কর্তৃক বালীগঞ্জের বাড়ীর নক্‌শা

১৯৪০-৪১ এ শিল্পীর ছবি দেখতে। এমন নানা ঘটনায় বাগবাজারের ঐ ঠিকানা ইতিহাস হয়ে গেছে।

বাগবাজারের অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের ১/২ বি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের ভাড়া বাড়িতে যামিনী রায় ছিলেন ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত। বালীগঞ্জের ১৮, ডিহি শ্রীরামপুর লেনে বাড়ী করে সপরিবারে চলে যান ১৯৫০ সালে। বাড়ির পুরো একতলাটায় হল স্টুডিও আর গ্যালারী। নিজের আঁকা চিত্রকর্ম ভালভাবে সাজিয়ে রাখবার জন্যেই এমন ব্যবস্থা। কারণ তিনি মনে করতেন, 'ছবি আমাকে টাকা দিয়েছে তাই ছবি ভাল করে রাখবার জন্যেই বাড়ি।'

বাগবাজারের বাড়ি বহু দেশী বিদেশী গুণী মানুষের আনাগোনায়, বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে ইতিহাস হয়ে আছে। বাগবাজারের ঐ পাড়া ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষ এবং শিল্পী যামিনী রায় কেমন যেন মিলে মিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বাগবাজারের সেই সংকীর্ণ গলি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় যামিনী রায়কে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ভাবতে সেদিন অনেকেরই কষ্ট হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসু তো দুঃখকরে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয়েছিল পুরাতন-পন্থী বাগবাজারই তাঁর জীবনদর্শনের অনুযায়ী যেন ঘেঁষাঘেঁষি আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের একতলায ছাড়া আর কোথাও ঠিক মানাবে না তাঁকে—কিন্তু দেখে পুলকিত হয়েছিলাম নতুন বাড়িতে একতলায় তাঁর কর্মস্থানটি অবিকল সেই পুরনো ছাঁচেই তিনি নির্মাণ করেছেন—অভিনব শুধু সংলগ্ন খানিকটা ঘাসের আঙিনা।'

দিল্লীর নবনির্মিত গৃহে পদার্পনের পর ১৯৫০ এর ১১ই জুন তারিখে রবিবারের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় 'এ ওয়েল নোন ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট বিল্ডস এ নিউ হাউস' এই শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখার সঙ্গে ছাপা হয়েছিল নতুন বাড়ি এবং স্টুডিওর ছবি।

পৌর কর্তৃপক্ষ ১৯৫৬ সালে ডিহি শ্রীরামপুরের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'বালীগঞ্জ প্লেস ইস্ট'। কিন্তু শিল্পীর মনে নতুন নামকরণ বোধহয় কোন রেখাপাত করেনি। অথবা পুরনো নামটাকে হয়তো তিনি বেশি পছন্দ করতেন নতুনের চেয়ে। আর তাই বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি চিঠিপত্রে ঠিকানা লিখতেন, ১৮, ডিহি শ্রীরামপুর লেন।

'টুকরো কথা'

সিগনেট প্রেস থেকে একসময়ে 'টুকরো কথা' এই নামে একটি ছোট সংখ্যা প্রকাশিত হত দিলীপ কুমার গুপ্তর পরিকল্পনায়। এতে সাধারণতঃ গ্রন্থ ও লেখক সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশিত হত। অন্য বিষয় নিয়েও যে কখনও লেখালেখি হত না এমন নয়। যেমন 'যামিনী রায়' নামে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে নীচের লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর লেখাটির উপরে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা যামিনী রায়ের একটি রৈখিক প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছিল।

—'আচ্ছা, শোন, তোমাদের ঐ ঠাকুরঘরে সবাই কেন জুতো পায়ে আসে? তুমি বারণ কর না কেন?'—ছোট্ট মেয়েটি একদিন তাঁকে প্রশ্ন করল।

রুপালি-শাদা একমাথা-চুল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মোড়া পেতে বাড়ির সামনে মাঠে বিকেলের ছায়ায় বসে থাকেন। কখনোই প্রায় বাইরে যান না। সকাল থেকে বিকেল একটানা ঘরে বসে কাজ করেছেন। সন্ধ্যে ঘোর হলেই আবার গিয়ে কাজে বসবেন। এত কী কাজ তাঁর? ছোট্ট মেয়েটি রোজ তাঁকে দেখে। আর দেখে সব বাড়ী থেকে আলাদা দেখতে ঝকঝকে মেঝে আর মস্তো জানলা দেয়া এই বাড়িটার ঘরে-ঘরে, দেয়াল ঘেঁষে সার-সার সাজানো ছবি। কী তার রঙ! এমনটি সে আর দেখেনি। ঠাকুর-ঘর?

শিশুর মুখে প্রশ্ন শুনে যামিনী রায় অবাক হয়ে তাকালেন। কত লোক আসে-যায়, কৈ এমন করে কেউ তো কখনো বলেনি? সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মেয়েটি জানল না তার নিষ্পাপ শিশুমন যামিনী রায়ের আশ্চর্য রচনাকে যথার্থ মর্যাদা জানিয়ে অজ্ঞাতসারে সারা দেশের মুখরক্ষা করল।

যামিনী রায় তাঁর শিল্পরচনাকে বলেন 'পেশা' এবং এই 'পেশা'-ই তাঁর জীবন। উধর্বশ্বাস পৃথিবীর হাটে আজও যারা প্রতিভাকে পণ্য করেননি সেই মুষ্টিমেয় মহৎশিল্পীর অগ্রগণ্য তিনি, কৃত্রিম এই সভ্যতার পাশে নিজেকে জ্বালিয়ে নির্মল, সহজ, সুন্দর এক রূপলোক রচনা করেছেন। উজ্জ্বল সেই বর্ণপুরীতে শোক নেই, উচ্ছ্বাস নেই, প্রবৃত্তির তাড়না নেই। আছে শান্ত সুস্থির, শান্তি-আনন্দ-মঙ্গলময় জীবনের প্রতিচ্ছবি। শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি আজ তাই পৃথিবীর রূপ-তৃষ্ণার্তের তীর্থস্থান। গত বৈশাখে তিনি ৬৫ বছরে পৌঁছলেন। তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই॥

শিল্প সংগ্রহ

দিশী শিল্পকলা বিশেষতঃ লোকশিল্পের প্রতি যামিনী রায়ের ছিল আবাল্য আগ্রহ। তিনি নিজে খুব কষ্ট করে বহুরকমের শিল্পবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন। চিৎপুরের কাঠ-খোদাই, রঙিন লিথোগ্রাফ, এমন কি কালীঘাট শৈলীতে উত্তর কলকাতায় অঙ্কিত ক্যানভাসের ওপর টেম্পেরা ছবিও সংগ্রহ করেছিলেন। কালীঘাট থেকে বাঁকুড়া মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পাটা পট পুতুল এবং নানা রকমের শিল্পকলা যোগাড় করেছিলেন।

প্রথম দিককার প্রদর্শনীতে নিজের ছবির সঙ্গে নিজের এইসব ব্যক্তিগত সংগ্রহও প্রদর্শন করতেন। যেমন ১৯৩১ এ বাগবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত একক চিত্রপ্রদর্শনী সম্পর্কে প্রবাসীর পাতায় শ্রীশান্তা দেবীর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, 'কালীঘাট হইতে শুরু করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় প্রভৃতি নানা গ্রামে তিনি যে সকল পুরানো পট সংগ্রহ করেন তাহাও তাঁহার প্রদর্শনীর একটি ঘরে সজ্জিত দেখিলাম।'

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিড়লা আকাডেমিতে আয়োজিত ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসের বিরাট একক চিত্র প্রদর্শনীতেও যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু মূল্যবান পুরনো পটচিত্র দেখানো হয়েছিল।

এই পটের সুবাদেই শিল্পীর সঙ্গে শহীদ সুরাবর্দীর প্রথম পরিচয় বলে শুনেছি বাগীশ্বরী অধ্যাপক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে।

যামিনীর রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালাকে বেশ কিছু অতি উৎকৃষ্ট মানের পুরনো পটচিত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক সুরাওয়ার্দী তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং আশুতোষ সংগ্রহশালার কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রভাবশালী একজন। এই পটের সূত্রধরেই আলাপ পরবর্তীকালে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা লাভ করে।

বেলেতোড়ের রায় পরিবারে এমন সংগ্রহের বাতিক ছিল যামিনী রায়ের খুড়তুতো দাদা বসন্তরঞ্জন রায়েরও। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পণ্ডিত এই মানুষটি আজীবন শুধু সংগ্রহ করেছেন পুঁথি। এই সংগ্রহের নেশাতে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন আবিষ্কার করেন বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুঁথিটি। ফলে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে চলতি ভাবনায় খুলে যায় আর এক নতুন দুয়ার। বিষয়টি নিয়ে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

তাঁর অসংখ্য পুঁথির মধ্যে বেশ কিছু শুধু মূল্যবান নয়, দুষ্প্রাপ্যও। তাঁর জমান সংগ্রহ তিনি দান করে গেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে। আশী বছর বয়সে ১৯৫২ সালে বসন্তরঞ্জন লোকান্তরিত হন।

তিরোধান

যামিনী রায়ের অনন্তকালের তুলির টান চিরতরে থেমে যায় ১৯৭২ সালের

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে। মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে থেকেই ব্রঙ্কাল নিমোনিয়াতে ভুগছিলেন। এ ছাড়া বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতা তো ছিলই। বালীগঞ্জ প্রেস ইস্টের বাসভবনে অক্লান্ত রূপতাপস যামিনীরায় ইউরোমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় লোক শিল্পের আধার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী শিল্পগুরু শ্রীযামিনী রায়ের মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় বলেন, 'যামিনী রায়ের মৃত্যুতে আমরা এমন একজন শিল্পীকে হারালাম যিনি আমাদের দেশ এবং নিজেদের পারস্পরিক বোঝাপড়াকে গভীরে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

লোক শিল্পের স্থানীয় জীবন ধারাকে কেমন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাও তাঁর চিত্রে সুপরিস্ফুট। তাঁর তুলির টান অনন্তকালের হয়ে আছে।

স্বাধীনতার আগে থেকেই আমি যামিনী রায়কে চিনি। তাঁর স্টুডিওতেও গেছি। আমরা সকলে একজন গভীর মানবতাবাদী পুরুষ ও প্রথিতযশা ভারতীয়কে হারালাম।'

শেষ ছবি

মৃত্যুর আগে শেষ ছবি 'লাস্ট সাপার'। যীশুখৃষ্টকে অবলম্বন করে ৭ ফুট লম্বা ২ ফুট চার ইঞ্চি চওড়া মাপের ছবিটি মৃত্যুর পাঁচ সাত দিন পূর্বে শুরু করেছিলেন। শেষ করে যেতে পারেননি। অসমাপ্ত এই ছবিটি আছে 'যামিনী রায়' সংগ্রহশালায়।

শিল্পী অঙ্কিত 'লাস্ট সাপার' ' (৪৫.৫ × ১৯২.৫ সি এম) একটি বিশাল আয়তনে ছবি রয়েছে দিল্লীর ন্যাশানাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্টে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে ইতি পূর্বে টেম্পেরাতে ১৯৪২এ আর একটি 'লাস্ট সাপার' এঁকেছিলেন।

'শিল্পীর মৃত্যু নেই। যিনি স্রষ্টা তাঁকে নিত্যনতুনভাবে আমরা উপলব্ধি করি তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পী যামিনী রায়ের মৃত্যুতেও এই মহান রূপস্রষ্টার অবিনশ্বরত্বই নতুন করে আমরা উপলব্ধি করলাম। দীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করে গেছেন ভারতীয় শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যেই তিনি গণনীয়। রঙ ও রেখার অবিনশ্বর কবিতার রচয়িতা তিনি, যার উৎস চিরন্তন বাংলাদেশ এবং চিরন্তন মানবিকতা। বাংলার ভাবলোকের বিচিত্র ঐশ্বর্য উদঘাটিত হয়েছিল যামিনী রায়ের ছবিতে। তাঁর ছবি আমাদের মহৎ এক উত্তরাধিকার।

'লাস্ট সাপার' পৃথিবী বিখ্যাত যে কয়জন শিল্পীর রেখা রঙে বাঙময় হয়েছে তাদের মধ্যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কথাই প্রথমে স্মরণে আসে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এই দেওয়াল চিত্রটি আছে মিলানের গীর্জা সানটা মারিয়া ডেলাতে।

'চিত্রকল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে, মানব ইতিকথার এক দারুণতম নাটকীয় মুহূর্ত'। মানবত্রাতা, দীনদয়াল প্রভু যীশু তাঁর দ্বাদশ শিষ্যকে নিয়ে শেষবারের মত সন্ধ্যা ভোজনে বসেছেন। বাইরে বিজন প্রান্তরে ক্লান্ত সন্ধ্যার করুণ আভাস। অকস্মাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাদের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করবে এ আমি জানি।'

শান্ত সমাহিত, ক্ষমাসুন্দর ও করুণার প্রতিমূর্তি প্রভুর সেই কটি কথায় ঘরের মধ্যে যেন আচম্বিতে বজ্রপাত হলো। প্রলয়ের দ্বার খুলে গেল। চিরচঞ্চল কালের গতি রুদ্ধ হলো। একটি নিমেষে তার সরণি জুড়ে দাঁড়ালো। চকিত স্তব্ধ ক্রুদ্ধ আতঙ্কিত অভিভূত তাঁর দ্বাদশ শিষ্য সেই মর্মান্তিক মুহূর্তে শুধু একটি প্রশ্নই করতে পারলো, 'প্রভু সে কি আমি ?'

জন জোফানী 'লাস্ট সাপার' এঁকেছিলেন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে।

শিল্পী অমিয় রায়

প্রতিভাধর পুত্র জীমূতকান্তির মৃত্যুর পর যামিনী রায় অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন দুটি কারণে। একদিকে পুত্র বিয়োগ। অন্যদিকে শিল্প কর্মে সহায়ক এক শিল্পীর মৃত্যু। এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি পুত্র অমিয় রায়কে ছবি আঁকার কাজে নিযুক্ত করেন।

'যামিনী রায়ের কথা' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে লিখেছেন, 'যুবক শিল্পী জীমূতের মৃত্যুতে যামিনীদার নিশ্চয়ই শিল্পকর্মে সহায় কমে গেল। বালক পটল অর্থাৎ অমিয়কে যামিনীদা নিজের কাজে লাগালেন। পটলের ছবি আঁকার হাত ও ছবির গঠন তখনই জোরদার ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ছবির টেম্পেরা, তৈলচিত্র, পোট্রেট এর হাত আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করত, এখনও করে। অধিকন্তু এখনও, মোজেইক আর কাঁচ-এর স্বচ্ছ ছবি তৈরিতে তাঁর কৃতিত্বে অনেকেই খুশি। অমিয় রায়ের নানা রকম কৃতিত্ব ও কর্তৃত্বে মুগ্ধ হতে হয়। অমিয় বাল্যকালেই—বছর পাঁচেক বয়স থেকে পিতা তাঁকে ছবির নানা কাজে লাগিয়ে দেন এবং আমাদের দেখাতেন। এবং অন্য পরিবারের বালক বালিকাদের ছবিও প্রচুর সংগ্রহ করে রাখতেন। সেগুলি বার করে বলতেন : এই ছবি দেখেই কোন পরিবারের আবহাওয়ার ছেলে বা মেয়ে বোঝা যায়। কিন্তু অমিয় রায়ের নানাবিধ সবল কৃতিত্ব দুর্লভই বটে।'

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে অমিয় রায়ের দীর্ঘকাল খুবই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যামিনী রায়ের চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে। তাঁর এবং তাঁর সহধর্মিনীর মধুর অমায়িক ব্যবহার ভোলবার নয়।

নানা রকমের মাধ্যমে অমিয় রায় কাজ করতেন। সাধারণভাবে ঢালাই বা, জমানো সিমেন্টের ওপর মোজাইকের ছবি চোখে পড়ে। কিন্তু অমিয় রায় তাঁর শিল্পী মনের উচ্ছ্বাসকে এক সময়ে প্রকাশ করতেন এক নতুন মাধ্যমে। তিনি

থ্রী পীস হালকা মজবুত কাঠের ওপর স্বরচিত আঠা দিয়ে চিত্রের চরিত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট ছোট মোজাইক টাইল আটকে এক ছন্দোময় রূপচিত্র সৃষ্টি করতেন। চিত্রগুলো উত্তাপ, আগুন, জল ও ড্যাম্প প্রুফ বলে শিল্পী দাবী করতেন।

মোজাইক এর চিত্রকলা নতুন নয়। সৌখিন শিল্পরসিক রাজা রাজরারা ঘরের দেওয়ালে মেঝেতে মোজাইকের রঙিন চিত্র বিচিত্র ছবি নকসা করাতেন। ইউরোপের বাইজানটাইন শিল্পকলায় মোজাইকের কাজের প্রচলন ছিল। মোজাইক কাজের নিদর্শন সুপ্রাচীন হলেও অমিয় রায়ের কাজে নতুনত্ব আছে। কারণ কাঠের ওপর মোজাইকের কাজ এর আগে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই নতুন রচনা রীতি যথেষ্ট পরিশ্রম ও ধৈর্যের পরিচয়বাহী।

মোজাইকের ছবি অন্যভাবেও করেছেন। একটি নিদর্শন হল কবি গুরুর প্রতিকৃতি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পীকৃত এই প্রতিকৃতি ছিল ডানলপ রাবার কোম্পানীর আয়ত্বধীনে। বর্তমানে কোথায় আছে জানা নেই। তাছাড়া কলকাতা রবীন্দ্রসদনের দক্ষিণ প্রান্তের বাইরের দেওয়ালে যে দুটি সুবৃহৎ মোজাইকের চিত্রকলা সতত দৃষ্টিকে নন্দিত করে তাও অমিয় রায়ের শিল্প প্রতিভার একটি অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিল্পী অমিয় রায় শিল্পপ্রেরণা লাভ করেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। বার বছর বয়স থেকে তিনি একান্ত অনুগত সহযোগী হিসেবে বাবার সঙ্গে কাজ শুরু করেন এবং টিবেটিয়ান, চাইনীজ, মোঘল, ইউরোপীয়ান প্রভৃতি চিত্রধারার সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে পরিচিত হন। যামিনী রায়ের 'ডট' বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে আঁকা চিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অমিয় রায় মোজাইক চিত্রের দিকে অগ্রসর হন।

শিল্পীর সুললিত মোজাইক ছবির মধ্যে 'গোটস অব হেভেন', রয়েল প্রফেসন রূপ মাধুর্যে অনুপম। 'শৃঙ্গার' ও 'রিদম' কবিতার মত ছন্দময়। 'দ্য জয় অব দ্য হারভেস্ট' ছবিতে গ্রাম বাংলার চিত্র পরিস্ফুট। তাছাড়া 'নারী', "ভাইটালিটি" 'ফ্যানটাসি' প্রভৃতি চিত্রে রূপ ও রং বিন্যাস চমৎকার। শিল্পীর তুলিতে যামিনী রায়ের রঙিন প্রতিকৃতির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

এক সময়ে শিল্পের নবতর শরীর সম্বন্ধে আত্মমগ্ন শিল্পী চার বছরের অমিয় রায়ের ছবিতে পেয়েছিলেন তাঁর শিল্প জিজ্ঞাসার জবাব বাবার। দেখাদেখি শিশু শিল্পী অমিয় রায় স্লেটে পেনসিল দিয়ে আঁকছিলেন ছবি। সেই ছবিতেই যামিনী রায় খুঁজে পেয়েছিলেন যা চাইছিলেন তাই।

এ প্রসঙ্গে অলইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত বিষ্ণু দের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে যামিনী রায় বলেছেন, 'এই তখন তিন ডাইমেনশনাল ওয়ান ডাইমেনশনাল ফ্ল্যাট ঐটে নিয়ে মনের মধ্যে খুব ইয়ে চলছে। তখন পটল চার বছরের এই রকম

বয়স হবে। এখন আমি ঐ রাত্রিবেলা ঐ রকম স্কেচ করি, ঐ ইয়ে দিয়ে, ভুসো দিয়ে, আর সেই সঙ্গে আমার সঙ্গে ছিল। হঠাৎ ওর কতকগুলো ছবির মধ্যে দেখলুম, আমি যা চাই তাই। সেই তখন আরম্ভ করলাম এই ধরণের ছবি আঁকতে।'

এ প্রসঙ্গ তুললে অমিয় রায় বলতেন, 'সব দেশের সব শিশুই এমন ছবি এঁকে ফেলে, এর মধ্যে চিত্র কৃতিত্ব কিছু নেই। বাবার দেখাটার মধ্যেই ছিল কৃতিত্ব।'

কয়েকবছর রোগ ভোগের পর শিল্পী অমিয়কান্তি রায় ওরফে পটলদা ১৯৮৬ সালের মে মাসের ২৪ তারিখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেলেতোড়ে দেখা-শোনা

১৯শে মার্চ ১৯৮৭।

হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল ছ'টা দশ মিনিটে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডে চেপে দুর্গাপুর পেঁছিলাম বেলা ন'টায়। এই একশ একাত্তর কিলোমিটার পথ কেটে গেল ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে।

দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে চাপলাম বর্ধমান-রাঁচি এক্সপ্রেস বাসে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাস ছাড়ল। রাস্তার দু-পাশে বোরো-ধানের সবুজ ক্ষেতের বুক চিরে লালমাটির রাস্তার ওপর দিয়ে বাস ছুটে চলল। দামোদর নদীর ওপর ব্যারেজ পেরিয়ে বাস পীচ-ঢালা মসৃণ পথের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় আঠার কিলোমিটার রাস্তা পেছনে ফেলে বেলেতোড় এল সকাল দশটায়। নামলাম ডাক বাংলো স্টপের তিন রাস্তার সংযোগস্থলে।

এক মিষ্টির দোকানে জিজ্ঞেস করতে যামিনী রায়ের বাড়ি বাতলে দিল। তিন রাস্তার মোড় থেকে মিনিট তিন-চার হেঁটে পেছিয়ে এলাম শ্রীশ্রীসারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে। এই স্কুলের পেছন দিকে যামিনী রায়ের জ্ঞাতিভাই বিশ্বনাথ রায়ের বসতবাটী। প্রথমে এঁর সঙ্গেই দেখা করি।

তারপর লালমাটির সড়ক ধরে আমরা প্রথমে যামিনীবাবুর জন্মভিটে দেখতে যাব বলে রওনা হলাম। সঙ্গী হলেন পরাগবাবু। ভালো নাম অমিয় রায়। কাছেই থাকেন। আর ভবানীচরণ রায়। ইনি হলেন যামিনী রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমুদরঞ্জন রায়ের একমাত্র পুত্র। তাঁর মুখে শুনলাম যামিনী রায়ের বিয়ে হয় সিদুল বলে বাঁকুড়ার এক গ্রামে। স্ত্রী আনন্দময়ী ছিলেন বিখ্যাত সিংহ বাড়ীর মেয়ে। পথ চলতে চলতে মনে পড়ে গেল যামিনী রায়ের নিজের কথা, 'বাবা কিছুদিন সরকারি চাকরীতে ছিলেন। চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন, গ্রামে ফিরে এসে চাষীর জীবন আরম্ভ করলেন। আমাদের গোটা পরিবার আত্মীয়স্বজন জাতে ও অবস্থায় সমাজের ওপরতলারই মানুষ ছিলেন। গ্রামে দুটি গোষ্ঠী ঐরকম ছিল। মায়ের পরিবার বেশ স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু তবু তিনি আমার বাবার স্বেচ্ছায় সরল গ্রামীণ জীবনে সহায় ছিলেন। বাবা তুলোর চাষ করতেন।

তাঁতে সুতো করতেন। গ্রামের তাঁতীদের দিয়ে আমাদের ধুতি শাড়ি করতেন। তারা লাল পাড়টা করতে পারত না। স্বামীর জীবিত অবস্থায় তো মেয়েদের পাড় রাখতে হয়, মাকেই লালসুতো দিয়ে সরু পাড়ের একটা কিছু করতে হত ঐ মোটা কাপড়ে। সর্ষে চাষ থেকে সর্ষের তেল, মাথায় মাখার জন্যে তিল তেল। বাবার স্থির বিশ্বাস ছিল, প্রকৃতির নিয়মে জল হাওয়ায় অঞ্চলের মাটিতে যা ফলে তাই সে অঞ্চলের মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি নিজে গরু ছাগল ভেড়া মেষ রাখতেন। তখন গ্রামের কাছে বেশ বড় জীবন্ত বন-জঙ্গল ছিল, সে বনে বেশ জন্তুও ছিল। তাই তিনি গরু ছাগল মেষের ছাউনি-ঢাকা আশ্রয়ে বা গোশালায় রাত্রে নিজেই শুতেন। বাবা চাষীদের বাউরিদের পছন্দ করতেন। পেন্সিলের বদলে কাগজে নখ দিয়েই ড্রইং শেখান। বংশের গর্বও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু মাকে ক্ষেতে খামারে নিজেকেই খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হত। আমাদের অনেক বাউরি ছিল কাজ করত। বাবা বলতেন, আমাদের সকলের এক হাতে যেন বই, অন্য হাতে লাঙল।'

যামিনী রায়ের এইসব কথার প্রতিধ্বনি বেলেতোড়ের মানুষজনের কাছে শুনলাম। তবে পোষা জন্তু-জানোয়ার আর নেই। কারণ শিল্পী পরিবারের অর্থাৎ চার ছেলের কেউই ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। সবাই কলকাতাবাসী। বন কেটে বসত বানাতে বানাতে জঙ্গল এখন দূরে সরে গেছে

পিতার মত যামিনী রায়ও বাউরিদের পছন্দ করতেন। গুঁইরাম বাউরি তাঁর বাড়িতে থাকতেন। কাজ করতেন। তিনি এই গুঁইরামের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। গুঁইরামও তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন। দুজনেই দুজনকে স্নেহ করতেন। গুঁই রামের ছেলে গোর বাউরকেও তিনি পুত্রবৎ ভালবাসতেন। বংশানুক্রমে এঁরা সুন্দর দর্শনা। সুঠাম সুডোল চেহারা। গুঁইরাম এবং তাঁর ছেলে আজ আর কেউ বেঁচে নেই বটে। কিন্তু গোর বাউরির ছেলে কেষ্ট বাউরি এবং তাঁর পরিবারবর্গ এখনও এই রায়-পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

পথ চলতে চলতে ভবানীবাবু বললেন, 'রামতারণ রায় কাগজে ছবি আঁকতেন না। নরুণের মত নানারকম যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি শ্লেট এবং কাঠের ওপর নকশা ও ছবি করতেন। আরও বললেন, যামিনীকাকার ছোটভাই রজনীকাকা ভালো মূর্তি গড়তে পারতেন। তিনি পাথর কেটে এবং মোম দিয়ে বেশ কয়েকটি দেবদেবী তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি এখন বেশ মনে পড়ে।'

কথা বলতে বলতে আমরা এসে থামলাম রায়পাড়ায় রামতারণ রায়ের পৈতৃক পুরনো ভিটেতে। বর্তমানে এখানে থাকেন সত্যসাধন রায়। দুই ভাইয়ের

মধ্যে যামিনী রায়ের পিতা রামতারণ রায় ছিলেন ছোট। বড়র নাম রামনারায়ণ রায়।

এই বাড়ির কাছেই ছুতোর পাড়া। এখানেই শিশু যামিনী রায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন ছুতোরদের কাঠের কাজ এবং মূর্তি গড়া দেখে। এঁরা এই কাজ বহু যুগ থেকে করে আসছেন। তবে মূর্তির চাহিদা দিন দিন কমে আসার দরুন এঁদের জীবিকার রূপান্তর ঘটেছে। দেখলাম চিড়ে মুড়ি ভাজা চলছে।

আরও কয়েক পা এগিয়ে আমরা হাজির হলাম নিয়োগী পাড়ায় যামিনী রায়ের মামার বাড়িতে। এটাই শিল্পীর জন্মভিটে। এখন পরিত্যক্ত, ভাঙা পোড়ো বাড়ি। পরাগবাবু এবং ভবানীবাবু দুজনেই আগাছামগ্ন একটা ভগ্নস্তূপ দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন। এইখানে ছিল ঢেঁকিশাল। আগের দিনে আঁতুর-ঘর হতো এই ঢেঁকিশালে। এইখানেই জন্মেছিলেন যামিনীকাকা। এ বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। অন্য বাড়ি করে আছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে সেই জায়গাটা দেখলাম। মনে মনে প্রণাম করলাম। মনে হল এক তীর্থক্ষেত্রে এসেছি।

যামিনী রায়ের দুই মামা। বড়মামা চারুচন্দ্র দত্ত কলকাতাতে এক ব্রিটিশ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ইনি বাহাত্তর তিয়াত্তর বয়সে দেহ রাখেন। ছোট মামা ডঃ অবিনাশচন্দ্র দত্ত অকালে স্মল পক্সে মারা যান।

প্রয়াত চারুচন্দ্র দত্তর কন্যা কমলা মিত্রের বাড়ি এবার আমরা হাজির হলাম। দেখে মনে হল ওনার বয়স ষাটের ওপর। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরে উনি যা বললেন তা অনেকটা এই রকম।

তিন ভাগনা (কুমুদরঞ্জন, যামিনীরঞ্জন ও রজনীরঞ্জন) বাবার প্রাণ ছিল। উনি তিনজনকেই খুব ভালোবাসতেন। বড় ভাগনাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে গেছিলেন। মেজভাগনা (যামিনী রায়) পাঁচ বাড়ির মেলাতে পাঠশালায় পড়ত। কিন্তু পড়ায় তেমন মন ছিল না। লেখার খাতায় ছবি আঁকতো হাতের লেখা না করে। অনেকে বকতো। বড়মামা প্রশ্রয় দিত। আঁকার জন্যে দিস্তে দিস্তে কাগজ যোগাত। কেউ কেউ তা পছন্দ করত না। পুকুরের ধারে বসে ভিজে মাটি দিয়ে মূর্তি বানাতো। লাল, হলদে, খয়েরি রঙের গেরিমাটি দিয়ে ছবি আঁকতো। ছুতোর পাড়ায় গিয়ে তন্ময় হয়ে বসে মূর্তি গড়া দেখত। এই সব লক্ষ্য করে বাবাই (চারুচন্দ্র দত্ত) এই ভাগনাকে কলকাতাতে আর্ট স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন।

বেলেতোড়ে এলে শিল্পী আগে মামার চরণস্পর্শ করতেন। প্রত্যেকবার পুজোয় কাপড় পাঠাতেন। প্রাণের কথা বলতেন।

পুরো গ্রামটি দেব-দেউলময়। যাওয়া আসার পথের ধারে চোখে পড়ল -হারবোলতলা, রামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্রীধরের মন্দির, গোকুলচাঁদ ও রাধারাণী মন্দির।

ভগ্নপ্রায়, জীর্ণ দেবদেবীহীন পরিত্যক্ত কয়েকটি মন্দিরও অতীত স্থাপত্য ও শিল্প-কীর্তির মূক সাক্ষী হয়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে আছে।

এ পথ সে পথ ঘুরে এবার আমরা এলাম যামিনী রায়ের অতি পুরনো ঠাকুর বাড়িতে, এখানে এখনও দুর্গা পুজো হয়। ঠাকুর দালান শোভা করে রয়েছে চালচিত্র। চমৎকার লোকশিল্পে রঙিন নকসা করা। ভবানীচরণ রায় বললেন, জানেন তো আমাদের অনেককাল আগে বসবাস ছিল যশোরে। সেখান থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে আমাদের পিতৃ-পুরুষরা আসেন বিষ্ণুপুরে। শুনেছি তিন কর্তা আত্মারাম, সসত্বরাম ও বাঞ্ছারামের মধ্যে একজন ছিলেন বিষ্ণুপুর রাজার দেওয়ান। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এক সাধুর কাছ থেকে অষ্টধাতুর অষ্টদশভুজা সুন্দর দেবীমূর্তি পেয়ে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবীর নিত্যসেবার জন্যে রাজা এই দেওয়ানকে নাকি যমুনাবাঁধ দিয়ে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুর থেকে বেলেতোড়ে আসার সময় ঐ মূর্তি আনা যায়নি। ওখানেই তার নিত্যসেবা এখনও চলে। ওখানে দুর্গাপ্রতিমা পুজো হয় বলে আমাদের বাড়িতে প্রতিমার বদলে কেবল দুর্গার মুখ পুজো হয়।'

এই গল্প শেষ হতে না হতে পায়ে পায়ে আমরা এসে পড়েছি যামিনী রায়ের নিজের তৈরি ভিটেতে। প্রবেশপথ শহরের প্রধান সড়কের ওপর। সারদা বালিকা বিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে ঢুকতে হয়। পৈতৃক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রামতারণ রায় কাঁচা বাড়ি বানিয়েছিলেন। আর একতলা সাদামাটা পাকা এই আবাস যামিনী রায়ের একেবারে নিজের মত করে করা। পরে অবশ্য পুত্র অমিয় রায় কিছুটা এবং তারও পরে কণিষ্ঠ পুত্র মণি রায় গৃহটির অনেক সংস্কার করেছেন।

বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগান। মাঝখানে বাড়ি। এক কোণে কুয়ো। আমড়া, কুল, কাজু, কদম, আতা, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছগাছালি নিয়ে পরিবেশ ভারি চমৎকার। বাড়ির সামনে এক বিরাট জোড়া আমগাছ ছিল। তার তলায় প্রায়ই শিল্পী বসতেন। আজ আর সেই গাছ নেই। যামিনী রায় থাকতেন নাকি পূর্বদিকের ঘরে।

নিজের তৈরি এই সাধের আবাসে শিল্পী শেষ এসেছিলেন ১৯৪২-এ।

তারপর আর আসেননি বটে তবে বেলেতোড়ের সব খুঁটিনাটি খবর সযত্নে রাখতেন। জ্ঞাতিভাই বিশ্বনাথ রায় কথায় কথায় বললেন, 'আমরা কলকাতায় দেখা করতে গেলে তিনি গ্রামের সব কজন আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত জনদের খবরাখবর নিতেন। নানা রকম সংবাদ তাঁদের পৌঁছে দিতে বলতেন। বেলেতোড়ের জন্যে তাঁর কতটা ভালোবাসা তা তখন বুঝতে পারতাম।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী কণিকা রায় বললেন, 'একবার ওনার বালীগঞ্জের বাড়িতে ষাট দশকের শেষের দিকে গিয়েছিলাম। তিনি দেশের সব কিছু আগ্রহ করে জানতে চাইলেন। তাঁকে সব শোনালাম। কিন্তু পাঁচের রাস্তা

হয়েছে, ইলেকট্রিক এসেছে শুনে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললেন, 'সব মাটি হয়ে গেল। আমার স্বপ্নের বেলেতোড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।'

এতক্ষণ কথা শুনছিলাম বিভোর হয়ে। কখন যে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে টেরই পাইনি। ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আর দেরি করলে কলকাতায় ফেরা হয়তো হয়ে উঠবে না। সবাইকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় পা বাড়ালাম।

ক্লান্ত সূর্যের নরম আলোয় আমার তীর্থস্থান বেলেতোড়কে শেষ বারের মত ভালো করে দেখে নিলাম। ফেরার পথে মনে এল শিল্পীর নানান কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তাঁর আঁকা ছবি। আশ্চর্য মানুষ। আচার আচরণে, পোষাক পরিচ্ছদে, ছবির বক্তব্যে, আঙ্গিকে, সব কিছুতেই ছিল একেবারে খাঁটি দিশি মেজাজ। আর এর সবটাই তিনি আয়ত্ব করেছিলেন বেলেতোড়ের আকাশ বাতাস মাটি থেকে।

তাই দীর্ঘকাল শহরে থেকেছেন কিন্তু তার ছাপ পড়েনি ছবিতে। ছোপ পড়েনি দৈনন্দিন জীবন চর্যায়। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বাবু কালচারে মোটেই মাতেননি। বরং ঠিক উল্টোটাই হয়েছে। জীবন ও শিল্পে বেলেতোড়ের শৈশব জীবনের দর্শন স্মৃতি অনুভূতি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। তাই যামিনী রায়ের জন্মভূমি বেলেতোড় শুধু তাঁর জীবনের নয়, শিল্পেরও প্রকৃতি গৃহ।

সম্বর্ধনা ও সম্মান

জীবনভোর শিল্পসাধনা এবং ভারতশিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে দিল্লীর ললিতকলা একাডেমি শিল্পীকে তাঁর বালীগঞ্জ প্লেস ইস্টের বাসভবনে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। সভায় পৌরহিত্য করেন গুজরাটের রাজ্যপাল এবং একাডেমির চেয়ারম্যান মেহদি নাওয়াজ জাং। তিনি তাঁর বক্তব্যে যামিনী রায়ের অসাধারণ অবদানের কথা বলেন এবং শিল্পীর হাতে অঙ্গবস্ত্র তুলে দেন। বাংলায় লেখা তাম্র পাত্রটি পড়ে শোনান একাডেমির সেক্রেটারী শিল্পী ভবেশ সান্যাল। দিল্লী মাদ্রাজ শান্তিনিকেতন এবং স্থানীয় বহু শিল্পী শিল্পরসিক সেদিন উপস্থিত ছিলেন এই ঘরোয়া সভায় চুয়াত্তর বছরের বর্ষীয়ান শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে। এঁদের মধ্যে প্রদোষ দাসগুপ্ত, শঙ্খ চৌধুরী, এন সন বেন্দ্রে, কে কে হেব্বার, এম এস চাওদা ও রামকিঙ্কর বেজের নাম উল্লেখযোগ্য।

যামিনী রায় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর ললিতকলা আকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন।

কলিকাতা পৌর সংস্থা শিল্পীকে পৌর সম্বর্ধনা জানান মঙ্গলবার ১৬ই আগষ্ট, ১৯৬৬, অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায়। অনুষ্ঠান হয়েছিল শিল্পীর বালীগঞ্জ প্লেস ইষ্টের বাড়িতে।

ভারত শিল্পকলায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ভারত সরকার শিল্পীকে পদ্মভূষণ খেতাবে সম্মানিত করেন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পীকে সম্মানসূচক ডি লিট প্রদান করেন ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

জাতীয় সম্পদ

একসঙ্গে চারজন ভারতীয় শিল্পীর শিল্পকর্মকে ভারত সরকার 'ন্যাশনাল ট্রেজার' বলে ঘোষণা করেন ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই চার-জন হলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অমৃতা শেরগিল এবং যামিনী রায়। এই ঘোষনার বলে উপরোক্ত চার চিত্রকরের চিত্রকর্ম ভারত সরকারের আইনানুগ অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। এছাড়া এই তালিকায় আরও তিনজন হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শৈলজ মুখার্জী।

ডাকটিকিট

আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ক চারটি ডাকটিকিট ভারতসরকার প্রকাশ করেছিলেন ১৯৭৮ সালের ২৩শে মার্চ। ভারতীয় ডাক বিভাগের এই প্রকাশনার চারজন শিল্পী হলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলজ মুখাজী, অমৃতা শেরগিল ও যামিনী রায়। যামিনী রায় অঙ্কিত 'দুই নারী' চিত্র সম্বলিত ডাক টিকিটের মূল্য ছিল পঁচিশ পয়সা।

তথ্যচিত্র

জীবিত অবস্থায় শিল্পীদের জীবন ও শিল্পকে সচল চলচ্চিত্রে ধরে রাখবার প্রবণতা আমাদের দেশে একেবারে প্রায় নেই বললেই চলে। সৌভাগ্যবশতঃ যামিনী রায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শিল্পীর বড় নাতি দেবব্রত রায় (ধর্মদাস রায়ের পুত্র) ১৯৬৮ তে ২০ মিনিটের একটি রঙিন তথ্যচিত্র তুলে ছিলেন। 'যামিনী রায়' এই নামে তথ্য চিত্রের বিষয়টি তাঁরই লেখা। ভাষ্যপাঠ করেছিলেন এন বিশ্বনাথন।

শিল্পীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেবব্রত রায় 'পোট্রেট অব এ পেইণ্টার' এই নামে আর একটি রঙিন তথ্যচিত্র তোলেন। তাঁর নিজের লেখা এবং নির্দেশনায় ২০ মিনিটের এই ছবির ভাষ্যপাঠ করেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। বিড়লা একাডেমিতে শতবার্ষিকী প্রদর্শনী চলাকালীন প্রতি শনিবার ও রবিবার এই তথ্যচিত্রটি সর্বসাধারণের জন্যে দেখান হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে শিল্পীদের ওপর আরও কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘের অথ্যচিত্র তোলা হয়েছে। যেমন মকবুল ফিদা হুসেন ও শুভ ঠাকুরের ওপর ছবি তুলেছিলেন শান্তি চৌধুরী। অবনীন্দ্রনাথের ওপর পূর্ণেন্দু পত্রী। মীরা মুখোপাধ্যায়ের ওপর অঞ্জন রায়। বিনোদবিহারীর ওপর সত্যজিৎ রায়। রামকিঙ্করকে নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের তোলা রঙিন তথ্যচিত্রটির কোন হদিশ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

—নন্দলাল বসুর জীবন শিল্প নিয়ে হরিসাধন দাসগুপ্ত একটি ছবি করেছিলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে নিয়ে সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি দশ মিনিটের তথ্যচিত্র করেছিলেন। শুনেছি ছবিটি অসম্পূর্ণ, ব্যক্তিগত প্রয়াসে তোলা অপর ছবিটি কোথায় এবং কার কাছে আছে তার কোন সন্ধান মেলেনা।

ক্যালেণ্ডার ও ছবির প্রিন্টস

যামিনী রায়ের ছবি নিয়ে ক্যালেণ্ডার হয়েছে বেশ কয়েকবার। তাছাড়া ভারতীয় শিল্পীদের ছবি নিয়ে ক্যালেণ্ডারে যামিনী রায়ের ছবি ছাপা হয়েছে বার বার। তবে শিল্পীর একক ছবি নিয়ে যে কয়েকটি ক্যালেণ্ডার ছাপা হয়েছে তারমধ্যে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে 'ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড', ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট লটারি' এবং ঐ একই বছরে 'মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড' ছবি নিয়ে এক পাতার এক রঙা উইনিসেফ থেকে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কোটস ইণ্ডিয়াও একবছর শিল্পীর ছবি দিয়ে ক্যালেণ্ডার করেছিলেন। 'সিন্ধিয়া ওয়ার্কসপ লিমিটেড' ১৯৭৮ এ যামিনী রায়ের আঁকা কৃষ্ণলীলার ১৪টি ছবি দিয়ে একটি চমৎকার টেবিল ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করেছিলেন ১৯৮৭-তে জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পিয়ারলেস কোম্পানী শিল্পী অঙ্কিত ৬টি ছবি নিয়ে সুন্দর ক্যালেণ্ডার করেছিলেন।

কিংস পাবলিসিটি এ্যাণ্ড সেলস প্রমোশন এবং পিয়ারলেস জেনারাল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানীর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় যামিনী রায়ের পাঁচটি জনপ্রিয় ছবির বড় আকারের প্রিণ্টস প্রকাশিত হয়। ছবির মধ্যে রয়েছে গনেশ জননী, কৃষ্ণ যশোদা, কীর্তন, কুইন এবং ওয়ারকার। দাম পঞ্চাশ টাকা।

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিড়লা আকাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতেও শিল্পীর কয়েকটি ছবির ছোট আকারের প্রিণ্টস প্রকাশিত হয়েছিল।

চিত্রউপকরণ

ছেলেবেলায় বেলেতোড়ে থাকার সময় যামিনী রায় হলদে খয়েরি রঙের গেরিমাটি দিয়ে ছবি আঁকতেন। চিত্রচর্চা শুরুর গোড়ার দিকে চারটি রঙে ছবি করতেন। পটোদের মত নিজের ছবির রঙ নিজেই তৈরী করতেন। গাছের নীল, ভুষো, ইয়ালো ওকার ও ভারমিলিয়ন এই চারটি রঙ।

পরের দিকে অবশ্য ছবিতে সাতটি রঙ ব্যবহার করতেন। পটোদের মত নানারকম মাটি বা উদ্ভিদ থেকে বর্ণ বানাতেন। ধূসরের জন্যে গঙ্গামাটি, টকটকে লাল ও হলুদের জন্য নানা রকমের ধাতু ও পাথর, সাদার জন্যে চুন, নীলের জন্যে ইণ্ডিগো বা নীল। আর তেলের বাতির ভুষো দিয়ে কালো রঙ।

প্রথমদিকে রঙেরসঙ্গে মেশাতেন তেঁতুলবিচীর আঠা। কিন্তু তাতে বর্ণদীপ্ত কালো হয়ে যেতে থাকে। তাই পরের দিকে রঙে মেশাতেন শিরীষের আঠা।

কাপড় বা চটের ওপর গোবর লেপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন স্বহস্তে। তার ওপর ছবি আঁকতেন। এটা যেন ছিল তার দিশি ক্যানভাস। দিশি রঙ ও ক্যানভাসের মত একেবারে নিজস্ব প্রথায় তুলি তৈরি করেছিলেন। ভাঙা সরু লম্বাকৃতি কাঠের টুকরোর মাথায় দাঁড়, তুলো বা পাট জড়িয়ে বসাতেন তুলি। পরের দিকে অবশ্য দোকান থেকে কেনা ব্রাসও ব্যবহার করেছেন।

স্থায়ী সংগ্রহশালা

যামিনী রায়ের দেহাবসানের পর (২৪. ৪. ১৯৭২) পর শিল্পীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ছবি নিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কবি বিষ্ণু দের নেতৃত্বে কলকাতার কিছু বুদ্ধিজীবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। আবেদনে আসতে অনুরোধ করা হয়েছিল যে শিল্পীর নিজস্ব সংগ্রহের ছবি সরকার কিনে নিয়ে যেন তাঁর আবাসেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ রাজি হলেন এক শর্তে। তা হল সব ছবি চলে যাবে দিল্লীর ন্যাশানাল গ্যালারি অ্যব মডার্ণ আর্ট-এ। আবেদনকারীরা এই শর্তে বাধ সাধলেন ন্যায় সঙ্গত কারণেই।

এ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারাল স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানালে তাঁরা জানান কেন্দ্রীয় সরকার যদি ছবির আয়মূল্যের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করেন তবে তাঁরা অবশিষ্ট ছবি কিনে নিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হয়ে গেলেন আগের শর্তে। বাছাই করে দুশো ছবি নিয়ে গেলেন শিল্পীর ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্টে দু লাখ টাকার বিনিময়ে।

রাজ্য সরকার ১৯৭৮ এ আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে দুশো চব্বিশটি ছবি কিনে নেন। উপহার হিসাবে পান আরও পঞ্চাশটি। ডিহি শ্রীরামপুরের একতলা মাসিক দু হাজার টাকার অনুদানে পঁয়ত্রিশ বছরের জন্যে লিজ নেওয়া হয়। ১৯৭৯-তে স্থাপিত হয় সংগ্রহশালা। কিউরেটর নিযুক্ত হন যামিনীবাবুর জীবন ও শিল্পের নিত্য সহচর অমিয় রায় ওরফে পটলবাবু। কিন্তু গোছগাছ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয় ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

একতলার পাঁচটি ঘরে শিল্পীর পরিকল্পনামত ছোট ছোট টুলের ওপর দাঁড় করানো আছে বিভিন্ন পর্যায়ের সত্তর আশীটি ছোট বড় ছবি। বাকিগুলো নাকি আছে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে রিজার্ভ কালেকশান এ। পরিকল্পনা আছে প্রতিমাসে ছবি বদল করা হবে। দেশে শিল্পীর বাসভবনে এমন ভাবে স্থায়ী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার নজির খুব একটা না থাকলেও বিদেশে এমন রেওয়াজ আছে। এইতো ভাস্কর হেনরি মুরের প্রয়াণের পর তাঁর আবাসে তারই ভাস্কর্য নিয়ে একটি সংগ্রহশালা তৈরির সংবাদ শোনা গেল।

নির্দেশিকা

যামিনী রায় : বিষ্ণু দে। মহালয়া ১৩৮৪।

রবীন্দ্র চিত্রকলা রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা : সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারী ১৯৮২।

ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। কমল সরকার। জুলাই ১৯৮৪।

রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ : কমল সরকার। ডিসেম্বর ১৯৮৬।

ভারতশিল্প : নির্মলকুমার ঘোষ। ১৯৭৩।

ভারতকোষ : পঞ্চম খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৯৭৩।

স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যৎ : বিষ্ণু দে। বৈশাখ ১৩৮০।

স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বৈশাখ ১৩৯১।

নানারঙে দেবীপ্রসাদ : প্রশান্ত দাঁ। অগ্রহায়ণ ১৩৯১।

ভারতের শিল্প ও আমার কথা : অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলী)। ১৯৬৯।

গগনেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী : জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬৭।

পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। বৈশাখ ১৩৭৮।

দেশ। ১১ই এপ্রিল ১৯৮৭ সংখ্যা।

ক্ষণিকা : ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। যামিনী রায় সংখ্যা : প্রশান্ত দাঁ ও জয়ন্ত রায় সম্পাদিত। ১৩৭৮।

অমরশিল্পী যামিনী রায় : প্রশান্ত দাঁ। অমৃত। ৫ই মে ১৯৭২।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৭। যুগান্তর সাময়িকী : ১২ই এপ্রিল ১৯৮৭। আজকাল : ১৯শে এপ্রিল ১৯৮৭। বর্তমান : সাপ্তাহিকী : ১৯৮৭।

সেদিনের শিল্পে পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়া : অতুল বসু। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৪শে মে ১৯৮৭।

শিল্পী চিন্তা : প্রদোষ দাশগুপ্ত : যুগান্তর সাময়িকী। ২৪শে মার্চ ১৯৮৫।

প্রতিক্ষণ : গ্রহণে বর্জনে যামিনী রায়। মৃণাল ঘোষ। ১৭মে—১লা জুন ১৯৮৭। বর্ষ ৪, সংখ্যা ২১।

যামিনী রায়ের একশো বছর। অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়। সানন্দা ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৭।

The two great Indian Artists : edited by Prasanta Daw. 1978.

Jamini Roy : Contemporary Indian Art Series. Lalit Kala Akademi. 1973.

Contemporary Indian Painters. G. Venkatachalam. Bombay. প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

Centenary Volume : Government College of Art & Crafts, Calcutta, 1964.

Lalitkala Contemporary No 2. (প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই)

The Art of Jamini Roy—a centenary volume, Published by Jamini Roy Birth Centenary Celebration Committee, 15th April 1987.

Specill Exhibition on Paintings and Sketches of Jamini Roy. Published by Victoria Memorial, Calcutta, 31st Jan. 1981.

Jamini Roy tells of struggle to find his medium : Dorthy Norman. Times of India. 13th Feb. 1955.

Jamini Roy on Interpretation. A. S. Rahman, Times of India. 26th Sept, 1954.

Jamini Roy new trends : by a Statesman Staff eorrespondent. Statesman, 13th June 1954.

A well known Indian Artists Builds a new House : by An Art critic, Statesman, 11th June 1950.

Jamini Rov, Modernist & Versatile by An Art critic, Statesman, 12th January 1947,

Akademi Honours Jamini Roy : The Statesman, 17th April 1961.

National Treasures, The Statesman 5th Dcem 1976.

Indian Ambassador to the U.S.A. The Illustrated weekly. 23rd August 1959

Jamini Roy Exhibit : San Francisco progress. 30th Oct, 1957.

Jamini Roy : Allens Press Clipping Bureau. San-Francisco, 8th Nov. 1957.

Un grand peintre, Jamini Roy : Herve Masson A. Arts. 16th March 1951.

In woodlands of June : Dorothy Adlow. The Christion Science Monitar, 17th June 1958.

Jamini Roy : The Statesman, 20 th April, 1972.

Out of Town Art : Allen's Press clipping Bureau. San-Francisco. 21st November 1957.

Jamini Roy : Calcutta Note Book. The Statesman, 6th April 1964.

Art with love : by a correspondent. The Statesman. 8th March 1971.

Jamini Roy : Calcutta Note book. The Statesman. 1st May 1972.

Jamini Roy : Unconventional Painter of Folk Art. The Illustrated weekly of India. 21st November 1948

Indian Ambassador to the U. S. A : The Illustrated weekly of India 23rd August 1959,

Jamini Roy : John Garth. Allen's Press clipping Bureau. San Francisco. 8th November 1957.

Jamini Roy : Oakland Tribune, 3rd November 1957.

In woodlands of June : Dorthy Adlow. The Christion Science Monitor. 17th June 1958

Un grand peintre, Jamini Roy : De L'inde Arts. 16th March 1957.

The Art of Jamini Roy : Arany Banerjee. 12th April 1987.

Jamini Roy : The peasant painter. Austin Coates. Imprint. August 1973.

Jamini 'Roy : Shahid Surhawardhy Marg. No I. Volume—2.

Honours for Artists. Link. April 23, 1961.

Jamini Roy : Mulk Raj Anand. World window. Vol II. No 3.

Jamini Roy : Artrends. A contemporary Art Bulletin. Vol.—1. No. 2. January 1962.

Jamini Roy A profile ; Oxygen News. Quarterly House Journal of Indian Oxygen Ltd. Vol-5, No. I January to March 1965.

Jamini Roy : New Mexico Quarterly winter No 1954—55.

Jamini Roy : Asian Artists in crystal. 1956.

Jamini Roy : An Indian Sensibility, Indian Today. 31st May 1987.

Portraying the Artist : Ella Datta. Business Standard. 19th April 1987.

———

যামিনী রায়ের রচনা

ছেলেবেলা

আমার ছেলেবেলা কেটেছে বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় নামে ছোট্ট একটা গ্রামে।

আমার বয়স তখন চার পাঁচ বছর। বাবা রোজ সকালে হাত ধরে আমাকে নিয়ে যেতেন বৈঠকখানা বাড়িতে। তোমরা হয়ত বৈঠকখানা বাড়ি শুনে অবাক হচ্ছ? ভাবছ এ আবার কি? কিন্তু তখনকার দিনে, আমাদের গ্রামে আড্ডা দেবার জন্য এমন আলাদা বাড়ি ছিল। সেখানে তাস পাশা গল্পগুজব থেকে শুরু করে গ্রামের নানারকম বিষয় আলোচনা হত।

আমাদের বাড়ী থেকে বৈঠকখানা বাড়ি মাত্র তিন চার মিনিটের পথ। যাবার সময় রাস্তার এপাশ ওপাশ থেকে লাল, সাদা, নীল প্রভৃতি নানা রঙের পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে পকেটে জমা করতুম। বৈঠকখানা বাড়িতে বাবা যখন সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল আমি তখন ঘরের এককোণে বসে মেঝের ওপর কুকুর বেড়াল ঘোড়া আঁকতাম। তারপর পকেট থেকে লাল, নীল, সাদা নুড়ি বের করে একটার পর একটা সাজিয়ে তাদের গা রঙীন করতাম।

একদিন বাবার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন তাঁর এক শিল্পী বন্ধু। নামটা মনে নেই। তিনি ত ঘরের মেঝে রঙ বেরঙের পাথর দিয়ে সজ্জোন ঘোড়া দেখে অবাক। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—'খোকা এঁকে যাও, তোমার হবে'।

বেলেতোড়ের বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হতো। পুজোর মাসখানেক আগে থেকে কুমোর আসত প্রতিমা গড়তে। নাওয়া খাওরা ভুলে হাঁ করে একমনে ঠাকুর গড়া দেখতাম। মনে মনে ঠিক করেছিলুম বড় হয়ে আমিও এমন বিরাট ঠাকুর গড়ব।

পুজোর সময় আমার সমবয়সী বন্ধুরা যখন ঢাকীর বাজনা শুনত তখন ঠাকুর দালানে বসে তন্ময় হয়ে ঠাকুর দেখতুম। ভাল করে লক্ষ্য করতুম কুমোর কেমন নাক মুখ চোখ হাত পা তৈরী করেছে। কোথায় কেমন রঙ লাগিয়েছে। আর সময় পেলেই স্কুল কিংবা বাড়ী পালিয়ে গিয়ে বসে থাকতুম কুমোর বাড়িতে। বাড়িতে আমার পাত্তা পাওয়া না গেলে খোঁজ পড়ত কুমোর পাড়ায়।

আরও ক বছর পরের কথা। একটু বড় হয়েছি। রীতিমত আঁকা-জোকা শুরু করেছি এমন সময় বাঁকুড়া জেলার এক চিত্র প্রদর্শনী হল। বাবার ইচ্ছে ছিল না, তবুও একটা ছবি পাঠালুম ওখানে। ছবিটার নাম দিয়েছিলুম 'সমাজ'। ঐ ছবিটা দেখে খুশি হয়ে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে একটা গিনি উপহার দিয়াছিলেন। সেই প্রথম জানলুম আমিও ছবি আঁকতে পারি।

এই উৎসাহই আমায় ছবি আঁকার দিকে এগিয়ে দিল। স্কুলের পড়া শেষ করে এলাম কলিকাতায় ছবি আঁকা শিখতে। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন সাহেব আমার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে কোন পরীক্ষা না নিয়েই যে কোন ক্লাসে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং ছাত্র অবস্থাতেই আমার একটা ছবি বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন ক্লাসে।

কিন্তু আর্ট স্কুলের পরিবেশ আমার মোটেই ভাল লাগত না। আমি যা চাই মনে মনে তার কিছুই ছিল না আর্ট স্কুলের আবহাওয়ায়। খাঁচায় বন্ধ পাখির মত মনটা ছটফট করত। উড়ে যেতে চাইত অনেক দূরে নীল আকাশে।

বেলেতোড়ের আকাশ, বাতাস, মাটি, পাথর, গাছপালা, সাঁওতাল ছেলে মেয়ে, একদিকে গ্রামের অদূরে ছবির মত আঁকা বিহারের পাহাড় আর অন্যদিকে গঙ্গাতীরের উর্বর বদ্বীপের মতো সবুজ মাঠ চোখের সামনে ভেসে উঠত। তাইতো কোনদিন আর্টস্কুলে স্থায়ীভাবে পড়াশুনা করতে পারলাম না। কতবার ভর্তি হলুম আর কতবার যে পড়লুম। অনুলেখন : প্রশান্ত দাঁ

শ্রীশ্রীহরি

আমাদের দেশেব কৃষকের অবস্থা তখনও খুব হীন, আজও তাই =আমার বাবা দেশের কৃষক ঐ অবস্থার জন্য ব্যথা পেতেন, কৃষকের জীবন পছন্দ করতেন, ও নিজের জীবনে'প্রয়োগ করেছিলেন। আমার ছেলেবেলা কেটেছে প্রায় কৃষকের ছেলের মতই, তিনি সেই সময়ের এই স্কুলের শিক্ষা পছন্দ করতেন না. কেবলই বলতেন ছেলেদের ও সমাজের জন্য সকলকেই একহাতে লাঙ্গল এক হাতে বই = তিনি মাত্র দু একখানা বই পড়া ইহাই যথেষ্ট মনে করতেন। কাজেই আমার ইংকুলে পড়ার ব্যবস্থা তিনি করেন নাই, করার ক্ষমতাও ছিল না আর্থিক দিক থেকে। দেশের বাংলা স্কুলে সামান্য লেখা পড়া করে, আমার মাতুল, কলিকাতায় থাকতেন তিনি পড়ার জন্য আমার বড় ভাইকে নিয়ে আসেন, কলিকাতার স্কুল কলেজে আমার বাবার আপত্তি সত্বেও, তিনি সহজে ক্ষমা করতে পারেন নাই. আমার মামাকে ও দাদাকে।

আমার দাদার ও মামার সামান্য আয়, তবু তাঁরা আমাকে নিয়ে আসেন আর্ট স্কুলে ভর্তি করার জন্য। আমি ছেলেবেলায় মাটির জন্তু জানোয়ার গড়তে ভালবাসতাম, আঁকতেও ভালবাসতাম, কিন্তু গড়া বা আঁকা কোন ট্রাডিসনকে ভালবেসে তা বলতে পারি না। শুধু প্রতি শিশুর মনে যে মাটি নিয়ে খেলার প্রবৃত্তি থাকে ও কালি ও কয়লা দিয়ে আঁকার প্রবৃত্ত থাকে, সেই রূপ আমারও ছিল, তবে একটু বেশী মাত্রায় ছিল বোলেই বাংা ও আত্মীয়রা আর্টস্কুলে শেখার জন্যে পাঠান। তাতে কারও বিশেষ আপত্তি ছিল না।

স্মৃতিকথা

তুমি এসেছো দ্বারিক, লিখে নাও ঠিক গুছিয়ে, আমার তো লেখা আসে না। একটি মাত্র ঘটনার কথা বলেই সেই অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমার শরীর খুব দুর্বল, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে প্রতিদিনই সেই তিন ভায়ের কথা মনে পড়ে ও আমার প্রতিদিনের জীবনের পথ আলোকিত করে রাখে। তাঁদের সেই ভালবাসার কথা লিখে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, অন্তরের এই ভাব কারো পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা বলতে পারি না।

যখন আমি মহর্ষি ভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি আঁকছিলুম সেই সময়ে একদিন আমার হঠাৎ জ্বর এসে পড়ে। আমি সেইখানে শুয়ে পড়েছিলুম, জ্বরের ঘোরে আমার ঘুম এসে গিয়েছিলো। হঠাৎ আমার কানে একটা গানের সুর বাজতে লাগলো, চোখ খুলে দেখলুম আমার মাথার দিকে ঘরের মধ্যে একটি ফুটফুটে ছেলে গান গাইছে। সেই গান শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম। ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করে জানলুম, তার নাম সৌম্য। সৌম্যব সঙ্গে সেই থেকে আমার ঘনিষ্ঠতা—সুরু হয় গান শুনে।

এর পর আর একটি ঘটনার কথা ছবি দেখার মতো আজ আমার মনে পড়ছে। নবু তখন ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সম্পাদক। একদিন নবু এসে বললে যে আমার ছবির প্রদর্শনী করবে। নিয়ে গেল টেনে বড় বড় ছবি তার বাবার কাছে। নবু বল্লে—বাবার ইচ্ছে যে আর একবার আমার আঁকা ছবিগুলো দেখেন। সে যে কত বড়ো আনন্দের দিন সে আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। আজও মনে করে রেখেছি।

শ্রদ্ধেয় গগনবাবুই আমার ছবির প্রথম প্রশংসা করেন। যখন প্রদর্শনী খোলা হোল গগনবাবু তখন অসুস্থ। তখন তিনি বাক্‌শক্তিরহিত, ঠিক মতো দাঁড়াতেও পারেন না। আমার ছবি দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। তিনি চোখের জল দিয়ে আমার ছবির প্রশংসা করে গেলেন, জানিয়ে দিলেন আমাকে তাঁর অন্তরের কথা - আমাকে তিনি কত ভালবাসেন, স্নেহ করেন।

আজ নবু নেই, সবাই সরে গেছে আমার চারপাশ থেকে। আমি কাজ করে চলেছি তাঁদের স্নেহ ভালবাসার আশীষ নিয়ে। নিত্য কর্মই আমাকে তাঁদের তিন ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পনের শক্তি দান করেছে।

শিল্পী নন্দলাল বসু

নন্দলাল ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ জন। হ্যাভেল সাহেবের ইস্কুলে একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, উনি নেচার ষ্টাডির ক্লাশ করেছেন, আমি করিনি, উনি পারস্‌পেক্‌টিভ এঁকেছেন, আমি আঁকিনি, তবু আমরা অন্তরঙ্গ থেকেছি। উনি বলেছেন এর থেকে আলাদা কিছু করতে হবে, আমিও আমার রক্তে আমার চোখের অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছি এটা ঠিক আমাদের জিনিস নয়।

নন্দলাল তারপর অবনীন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। বলেছেন—এই-ই ভারতীয় পদ্ধতি, আমি সে পদ্ধতিকে শিল্পসম্মত বা আমাদের চরিত্র সম্মত বলে মেনে নিতে পারিনি, আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা মারফৎ আমার পদ্ধতিতে এসে পৌঁছেছি।

শিল্পাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও আমি তাঁর কর্মকে শ্রদ্ধা করে এসেছি আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করেছি।

Sender's name and address E M Forster
Kings College
Cambridge

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY
ENCLOSURE, IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED
OR SENT BY ORDINARY MAIL
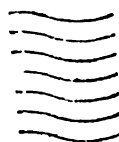
Replied 21.1.63
25 12 63

Mr Jamini Roy
18 Debi Saranpore Lane
Calcutta 19
INDIA

যামিনী রায়কে ফরস্টারের চিঠি

বিলেতের আরকেড গ্যালারীতে যামিনী রায়ের ৫০টি ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৪৬ এর ২৫শে এপ্রিল থেকে ১৬ই মে পর্যন্ত। এই প্রদর্শনী বিদেশের মাটিতে করা সম্ভব হয়েছিল মূলতঃ যামিনীবাবুর ছবির গুণমুগ্ধ ও শিল্পরসজ্ঞ জন আরুইনের সহায়তায়। এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ই এম ফরস্টার। ফরস্টারের দ্বারোদ্ঘটানের সংবাদ পাচ্ছি সিন্ধিয়া ওয়ার্কসপ লিমিটেড কর্তৃক ১৯৭৪এ প্রকাশিত যামিনী রায়ের ১৪টি রঙীন ছবি সম্বলিত টেবিল ক্যালেণ্ডারের ছোট ভূমিকাতে।

এডওয়ার্ড মরগান ফরস্টারের জন্ম ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে। টনব্রিজ স্কুলের পাঠ্যক্রম শেষ করে কেমব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তি হন। কলেজের শেষ পরীক্ষায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হলেও যোগাযোগ ছিল সারাজীবন। এই কলেজেই অনারারি ফেলোসিপ পেয়েছিলেন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

বলিষ্ঠ লেখক ফরস্টার ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এসেছিলেন দুবার। প্রথমবার ১৯১২—১৩ এবং দ্বিতীয়বার ১৯২১ সম্ভবতঃ এক হিন্দু রাজ্যের মহারাজার দেওয়ান রূপে। তখনই তিনি এই ভারতবর্ষকে দুচোখ মেলে দেখেছিলেন। অনুভব করেছিলেন ভারত আত্মাকে। সেই দেখা ও অনুভবের অভিজ্ঞতা নিয়েই ১৯২৪ এ তাঁর কলম দিয়ে বেরোয় 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'। ষাট বছর আগের সেই লেখা পৃথিবীর যে কোন দেশের মুক্তিকামী মানুষের কাছে আজও অনুপ্রেরণা যোগায়। কিছুদিন আগে ডেভিডলীন বিষয়টি চলচ্চিত্রায়ন করেছেন।

অন্য বিখ্যাত চারটি উপন্যাস হল 'হাওয়ার্ডস এণ্ড দি লংগেষ্ট জার্ণি", 'এ রুম উইথ এ ভিউ', 'হিলস অফ দেবী' এবং 'হোয়ার এঞ্জেলস ফীয়ার টু ট্রেড'।

বহু ছোট গল্পও লিখেছেন। কিছু নির্বাচিত গল্প নিয়ে একটি 'কালেকটেড সর্ট স্টোরিস' পাঠকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

জগৎ বিখ্যাত এই ঔপন্যাসিক ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ও বিনয়ী। এই আত্মপ্রত্যয়ী লেখকের বলিষ্ঠ রচনা নিয়ে সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকরা নানা মন্তব্য ও বিশ্লেষণ করেছেন।

তবে নিজের লেখা সম্পর্কে ফরস্টার তাঁর অশীতি বর্ষ জন্মদিন উপলক্ষে বি বি সির এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। I have written as I like to... I write for two reasons, partly to make money and partly to win the respect of people whom I respect. I had better add that I am sure, that I am not a great novelist.

Dear Mr Jamini Roy

I am so pleased to receive — on my 84th birthday — your kind letter and, with it, the most delightful picture which now stands on my mantelpiece. My health is quite good for my age, but I fear that the passage of the years has made me a poor correspondent. But my esteem for yourself and your art has never lessened, and I still treasure, in my London flat, your magnificent "Farmer" with his little bird.

Yours very sincerely

E M Forster

K.C.C.

1.1.63

Dear Mr. Jamini Roy,

I am so pleased to receive on my 84th birthday—your kind letter and with it the most delightful picture which now stand on my mantlepicc. My health is Quite good for my age. And I fear the pass age of the years has made me a poor correspondent. But my esteem for yourself and your art has never lessened, and I still treasure, in my London flat, your magnificient his 'Farmer' with his little bird.

1. 1. 63.

Yours sincerely,
E. M. Froster.

যামিনী রায়ের লেখা চিঠি

যামিনী রায়ের স্নেহধন্য হয়েছিলেন সুনীল মাধব সেন। তিনি প্রায়ই যেতেন স্ত্রী অরুণা সেনকে নিয়ে যামিনী রায়ের ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে যেতেন ছবি। যামিনী রায়কে দেখাবেন বলে।

যামিনী রায় সস্নেহে ছবি দেখে নিজের মতামত জানাতেন। তারপর চা জলখাবার। অধিকাংশ দিনই জলখাবারের তালিকায় থাকত ছানার গজা, তিনি নিজে খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। বলতেন, 'এ একেবারে দেশি খাবার। ঘরে চিনি দিয়ে ছানা পাক করা'।

ছবি সম্পর্কে সুনীল মাধব সেনকে একদিন বলেছিলেন, 'দেখ আমি আঁকছি একরকম। তুমি আঁকছ আর একরকম। তোমার ছবি দেখছি পটধর্মী কিন্তু আধুনিক ঢং-এ। তোমার ছবিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে। এ আমার ব্যক্তিগত মতামত। নির্দেশ নয়। কাউকে কোন উপদেশ দেবার কিছু নেই। সাধনা থাকলে যে যার পথ সে নিজেই করে নেবে।'

যামিনী রায়কে সুনীল মাধব তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯৫৩-র নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে যামিনী রায় শিল্পীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সুনীল মাধবের তখন একটি রেসিং মোটরগাড়ী ছিল। নিজেই চালাতেন। এই গাড়ীতে করেই তিনি যামিনী রায়কে সেদিন নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। চার আসনের বিদেশী গাড়ীটি যামিনী রায়ের খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি কথায় কথায় তারিফ করেছিলেন। পুরো সন্ধ্যে খোশ মেজাজে গল্প করে কাটিয়েছিলেন। যাবার সময় সুনীল মাধবের ডায়েরিতে পত্রাকারে নিজের মনের কথা লিখে রেখে যান। নীচে তা ছাপা হল। দ্বিতীয় চিঠিটি আসে ডাকে।

শ্রীশ্রীহরি

আর্ট স্কুলে ছেলে পড়ে শুনলে মেয়ের বাপ মুখ বাঁকিয়ে চলে যান। স্বামী ছবি আঁকলে, স্ত্রীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই, ইহাই এদেশের বর্তমান সমাজ।

আজ এই শিল্পী দম্পতিকে দেখে আনন্দ পেলাম, কতখানি সাহায্য নানারকমে পান শিল্পী সুনীল মাধব, তাঁর স্ত্রী কল্যাণীয়া অরুণার কাছ থেকে।

শ্রীযামিনী রায়
৪/১১/৫৩

শ্রীশ্রী হরি

আর্ট স্কুলে ছেলে বয়েস; [illegible]
[illegible] হঠাৎ বিদায় চলে যান
স্বামী স্ত্রী উভয়ের [illegible],
কোন যোগাযোগ নাই। [illegible]
[illegible] বন্ধুদের [illegible]। আজ
এই শিল্পী দম্পতিকে দেখে আনন্দ
পেলাম, কতখানি সাহায্য নানারকমে
পান শিল্পী সুনীল মাধব, তাঁর স্ত্রী
কল্যাণীয়া অরুণার কাছ থেকে।

শ্রীযামিনী রায়
৪/১১/৫৩

শ্রীশ্রীহরি　　　১৮, ডিহি শ্রীরামপুর লেন
বালীগঞ্জ কলকাতা-১৯

প্রিয়বরেষু,

সেদিন একখানি ছবি ফেলে গেছেন, আপনারা যাবার পর দেখতে পেলাম। আপনি জানালে, কল্যাণীয়া শিবানীর হাতে দিয়ে দেব। সেদিন আপানারা আসাতে আনন্দ পেয়েছি। আপনারা আমার শুভ কামনা গ্রহণ করিবেন।

ইতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যামিনী রায়

একদা গৌড়বঙ্গের নবীন শিল্পীদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল 'রূপযানী।' এই সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে একবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল শিল্পীর বরাহনগরের বাসভবন গুপ্তনিবাসে।

অবনীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ঐ সভায় মানপত্র পাঠ করেন রূপযানীর সভাপতি ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে 'অবনীন্দ্র জয়ন্তী' এই নামে একটি ছোট স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। তখন রূপযানীর দপ্তর ছিল ৪২-এ, জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। তবে অধিকাংশ মিটিং আলাপ আলোচনা হত সতু লাহার যতীন্দ্রমোহন এভিনিউয়ের বাড়িতে।

আনন্দবাজার পত্রিকার ২৮. ৩. ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদ স্তম্ভে দেখা যায় যে সেই উষ্ণ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আর্ট লইয়া দলাদলি করার দিন আর নেই। এক্ষণে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে সমগ্র জীবন তিনি আর্ট লইয়া কাটাইয়াছেন এবং ইহাতে তিনি এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন যে রসের ধারা এক। পশ্চিম হইতেই আসুক অথবা পূর্ব হইতেই আসুক আর্ট একই—ইহার মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। তিনি বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা জানান যে, তিনি যেন আরও কিছুকাল শিল্পীদের সঙ্গে, আনন্দ ও সুস্থ দেহে কাটাইতে পারেন'।

এই সভায় কলকাতার খ্যাতনামা অনেক শিল্পীদের সঙ্গে যামিনী রায়ও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি লেখার মধ্যেও যামিনী রায়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই বিষয়ে রূপযানীর সম্পাদক শম্ভুনাথ শীলকে লেখা যামিনী রায়ের চিঠি।

শ্রীশ্রীহরি　　　১১।৩।৪৯

প্রিয়বরেষু,　　　১/২বি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন বাগবাজার

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, উত্তর দিতে দেরী হইল, শরীর অসুস্থ, ত্রুটী লইবেন না।

বর্তমান যুগে গুরুজনকে না মানাই রীতি হোয়েছে। এই যুগে আপনারা পরম শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে যে শ্রদ্ধা জানাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে পরম তৃপ্তি পাইলাম। ইহা আমাদেরই করার কথা। আমাদের কর্তব্যের ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

প্রিয় বন্ধু = আপনার চিঠি যথাসময় পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হইল, শরীর খারাপ, কিছু মনে করিবেন না।

বর্তমান যুগে গুরুজনকে না মানাই রীতি হয়েছে—আপনারা এই যুগে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে যে শ্রদ্ধা জানাইবার আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে পরম তৃপ্তি পাইলাম। ইহা আমাদেরই করার কথা। আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

অন্তরে শ্রদ্ধা থাকিলেও বাইরে প্রকাশও দরকার। বর্তমান পূজনীয় ঠাকুর মহাশয় নানা রকমে ক্লান্ত, এই সময়েই ত আপনজনের দরকার। শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা জানান এক কথা—আর তাঁর অন্তরের কামনাকে শ্রদ্ধা করে রূপ দেওয়া, রূপকারদের

অন্তরে শ্রন্ধা থাকিলেও বাইরে প্রকাশও দরকার। বর্তমানে পূজনীয় ঠাকুর মহাশয় নানা—রকমে ক্লান্ত, এই সময়েই ত আপনজনের দরকার। শুধু মৌখিক শ্রন্ধা জানান এক কথা—আর তাঁর অন্তরের কামনাকে শ্রন্ধা করে রূপ দেওয়া রূপকারদের কর্ত্তব্য কাজ ; এতেই তিনি তৃপ্ত পাইবেন। তবে বাহ্য প্রকাশও দরকার। আপনাদের ব্যবস্থামত আমার দ্বারা যাহা সম্ভব নিশ্চয়ই করিতে হইবে।

কিছু লেখার কথা জানিয়েছেন, ইহাতে অনধিকারী আমি, আপনাদের কেহ একবার আসিলে এ বিষয়ে আলোচনা করিব। আমার শুভ কামনা জানবেন।

ইতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীযামিনী রায়

শিল্পবিচার

(১)

কি কারণে যামিনী রায় এত জনপ্রিয় হলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। এক সময়ে আমাদের দেশের ইংরাজি শিক্ষিত নব্যভাবাপন্ন দেশী লোকের কাছে চিত্রের বিচার চলত পারসপেকটিভ ও অ্যানাটমির মাপকাঠি দিয়ে। স্বভাবের অনুকরণকে তাঁরা আর্ট মনে করতেন। তাঁরা রাস্কিন পড়েছিলেন, র‍্যাফেল টিশিয়ান, জশুয়া রেনল্ডস ছিলেন তাঁদের আদর্শ। এই মনোভাব একদিন রাজা রবিবর্মাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, রাজাকে পেয়ে তাঁদের টিশিয়ান র‍্যাফেলের অভাব পূরণ হল। আজকের আমাদের উচ্চ শিক্ষিতেরা রাস্কিনের পরিবর্তে রজার ফ্রাই, হারবার্ট রীড, ক্লাইভ বেল পড়ছেন। র‍্যাফেল এখন আর আমাদের নব্য বাঙালীর আদর্শ নয়। এঁদের আদর্শ মাতিস, পিকাসো। পারসপেকটিভ বা এ্যানটমি যে আর্ট নয়। তা এঁরা জেনেছেন। Significant form আর Abstract Quality আর Contour এর ব্যবহার, তাই এঁরা ছবিতে দেখতে চান। নন্দনশাস্ত্রের এই নতুন পাঠ নিয়ে যাঁরা যামিনী রায়ের চিত্র দেখলেন, তাঁরা মুগ্ধ হলেন, এই সব ছবির সঙ্গে নব্য বিলাতি ছবির মিল পেয়ে আমাদের দেশের একমাত্র পটচিত্র বিলাতি আধুনিকতম রুচির মাপকাঠিতে মাপা যায়—এই তাঁরা মনে করেছিলেন বলেই যুগপৎ পট ও পটের আধুনিক সংস্করণ তাঁদের এত আকৃষ্ট করল। তাই আজ যামিনী রায় আমাদের অতি মার্জিত, অতি আধুনিক শিক্ষিত শহরবাসীর অতি প্রিয় চিত্রকর।

যামিনী রায় দেশী পট থেকে কতটুকু গ্রহণ করেছেন এবং পটের প্রভাব তাঁর ছবিতে কতটুকু নূতনত্ব দিয়েছে আমরা দেখলাম। রসিক সমাজে তাঁর ছবির এতটা আদর কেন, তারও কারণ আমরা কিছুটা পেলাম। এখন আরও একটা প্রশ্ন আসতে পারে। এই আলোচনা থেকে এ কথা মনে হতে পারে, যামিনী রায়ের দান চিত্রের ক্ষেত্রে নূতন ফ্যাসানের প্রবর্তন। রুচির প্রবর্তন আর ফ্যাসানের প্রবর্তন, দুএর মধ্যে পার্থক্য আমাদের ধারণায় থাকলেও অনেক সময়ে ঠিক ঠিক তফাত করে দেওয়া কঠিন। কোন্ উদ্দেশ্যে চিত্রকর একটা নতুন কোন আদর্শ নতুন অংকন রীতি গ্রহণ করেন সে বিচার করতে যাওয়া সহজ নয়। চিত্রকরের রচনার মধ্যে দিয়ে যা আমরা পাই, তাই দেখে মতামত দেওয়া চলে। সেইভাবেই এ পর্যন্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি; এ বিষয়ে আরও দু এক কথা বলা যেতে পারে।

প্রতিভাবান চিত্রকর মাত্রেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। এই বিবর্তনের পথে রীতি স্টাইলের সব কিছু হেরফের ঘটতে পারে। একই প্রতিভার একাধিকবার দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন ঘটতে পারা অসম্ভব নয়। এই পরিবর্তনে যে চিত্রকর ছিল, সে মূর্তিকার হতে পারে তাও সম্ভব। কিন্তু কেবল পরিবর্তন আছে, বিবর্তন নেই। প্রতিভাবান শিল্পীর জীবনে এমন দেখা যায় না। চিত্রকর যামিনী রায়ের চিত্ররচনার ধারায় কিন্তু বিবর্তন নেই; কেবলই পরিবর্তন। তাঁর তৈল বর্ণের কাজ—অবনীন্দ্রনাথের অনুকরণ, বিলেতি ইমপ্রেসনিজম এর অনুসরণ—প্রতি পদক্ষেপেই আমরা দেখি তিনি নূতনত্ব খুঁজেছেন এবং নূতনত্বের সন্ধান করতে গিয়ে রীতির বাইরে সঙ্গাকে নিয়েছেন। যামিনী রায়ের চিত্রের এরূপ দ্রুত পরিবর্তন আমাদের মনে কৌতুহল জাগাতে পেরেছে; কিন্তু চিত্রকরের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতে আমরা পাই না। তাই রসের দিক দিয়ে তাঁর চিত্র নতুন নয়।

শিল্পী যামিনী রায়। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়।
আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫।

(২)

দীর্ঘকাল অবসানে বাংলাদেশের আর একজন সুদক্ষ প্রবীণ শিল্পী পরিণত বয়সে স্বদেশের বিভিন্ন শিল্পরীতির ঐতিহ্যধারার বিশেষ একটি শাখা অবলম্বন করে চিত্রকলার জগতে যেমন করলেন অলোড়ন সৃষ্টি, তেমনি করেছেন যশ ও অর্থ উপার্জন।

ইনি হলেন স্বনামধন্য শিল্পী যামিনী রায় মহাশয়। তিনিও শুরু থেকে দীর্ঘদিন করেছেন ভিন্নপন্থায় সাধনা। তেল রং এ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তিনি এককালে পোর্ট্রেট রচনা করেছেন অতি চমৎকার। আমার পিতা-মাতার অয়েল পোর্ট্রেট করে দিয়েছিলেন তিনি বহুদিন আগে এবং তা হয়েছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের প্রতিমূর্তি চিত্র।

অবশেষে তিনি যে নতুন পথটি ধরলেন তা হোল আমাদের বাংলা ভূমির লোকশিল্প বা ভূমিজ শিল্পকলার পথ ও পদ্ধতি! বাংলা দেশের এই নিজস্ব স্বতন্ত্র শিল্পের ঐতিহ্যও অতি পুরাতন। যামিনীবাবু এর রূপ. রেখা ও আঙ্গিক অবলম্বন করে এগিয়ে চললেন এক নতুন যাত্রাপথে। তিনি ঐ প্রাচীন ধারাটিকে বইয়ে দিলেন একটি নতুন খাতে। সৃষ্টি হোল নব নব রূপাকৃতির সম্ভার। বাংলার প্রাচীন পট ও পাটাচিত্র থেকে নানা টাইপ ও আদর্শ সংগ্রহ করে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের যে নতুন রূপ তিনি রচনা করেছেন, তা হয়েছে অতি অভিনব। এই নতুন রূপের নবীন সাধনা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দেশ বিদেশে খ্যাতিমান করে তুলেছিল।

তবে এখানে একটা প্রশ্ন উঠে যে, আজকালকার বিজ্ঞানভিত্তিক শহুরে জীবনের কেন্দ্রে বসে কোন কোন মার্জিত বুদ্ধির আর্টিস্টের পক্ষে শুধু গ্রামীন

ভাব ও লোকশিল্পের প্রকৃত মহিমা সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা। যদি কেউ তা চেষ্টা করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রচনায় সাফল্যের চিহ্ন যদি পরিস্ফুটও হয়, তাহলে কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতা অনিবার্য। ফোকমাইণ্ড না হলে প্রকৃত ফোক আর্ট সৃষ্টি হতে পারে না। সেই বিশেষ পরিবেশ ও সেই সমাজ জীবনকে অস্বীকার করে চিত্রপটে তারই প্রতিফলন করতে বসলে একটু বিচ্ছিন্নতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফরাসী দেশের বিখ্যাত শিল্পী গঙ্গার শেষ জীবনাদর্শ এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজের দেশের সভ্যতার মোহ কাটিয়ে তাহিতী দ্বীপে নির্জনে বাস করছিলেন, সেখানকার আদিম জীবনের সঙ্গে একাত্ম একপ্রাণ হয়ে —, তা থেকে চিত্রকলার নতুন উপাদান ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করবার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সেই দ্বীপবাসীদের সভ্যতা, ভাব ও ভাবনাকে চিত্রপটে অকৃত্রিমভাবে ও সুসিদ্ধ উপায়ে রূপবদ্ধ করতে তিনি সক্ষম হোন।

ভারত শিল্পী ও আমার কথা। অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। (ও. সি, গাঙ্গুলী)। এপ্রিল ১৯৬৯।

(৩)

ঊনিশ শ বিশ থেকে ঊনিশ শ তিরিশ এই মধ্যবর্তী কালে বেঙ্গল স্কুল মুভমেণ্টের তুঙ্গ অবস্থা, অথবা এক কথায় স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এই সময়েই বেঙ্গল স্কুলের প্রতিভাবান শিল্পীরা সারা ভারতে বেঙ্গল স্কুলের ধ্বজা নিয়ে দেশের চারিদিকে জড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় শিল্পের জয়গানে মেতে তার প্রচার কার্যে। এই ভাবে অনেক শিষ্য এসে জড়ো হল জাতীয়তাবাদী নিশানের নীচে। পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে লক্ষ্ণৌ এবং লাহোর, আর দক্ষিণে মাদ্রাজ, তথা মছলিপটম থেকে শ্রীলংকা। এটা সত্যই একটা বিস্ময়কর ঘটনা যে সমস্ত দেশই তখন নতুন স্বদেশী শিল্পের উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল নতুন এক রুচি সম্পন্ন শিল্পের পরিকল্পনায়, জাতীয়তাবোধের আত্মগরিমায়। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে গান্ধিজীর তদানিন্তন স্বদেশী আন্দোলনই এই শিল্প প্রেরণার মূল উৎস।

বেঙ্গল স্কুলের এই বিরাট মুভমেণ্ট একমাত্র খৃঃ পূর্ব তিন শতকে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, এই বিরাট মুভমেণ্ট সম্ভব হয়েছিল আমাদের তৎকালীন রাজনীতি মূলক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। সাধারণ মানুষ তখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনাধীনে পর্যুদস্ত। তাই তারা নিজেদের দেশ এবং তাঁর নিজস্ব শিল্প এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে ভাবতে শিখল কোন শিল্প প্রেরণার অনুজ্ঞায় নয়, নিছক রাজনীতির খাতিরে অথবা স্বদেশী মন্ত্রে উত্তেজনায়। তারা তখন একবারও ভেবে দেখলো না রিভাইবেলিজমপুষ্ট নতুন স্বদেশী আর্টের পরিকল্পনা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ কিনা? এই বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান

উদ্যোক্তা অবনীন্দ্রনাথ নিজেই কাব্যধর্মের মননে তাঁর শিল্পদৃষ্টির পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। যার ফলে তাঁর শিল্পদৃষ্টি প্রায়শই একটা রহস্যের আবরণে ঢাকা থাকত। তাঁর চিত্রাঙ্কনে রংএর পরতে পরতে ফরম তার নিজস্ব সত্তা হারাত এবং যা থাকত তা শুধুমাত্র একটা আবছা, অস্পষ্ট ছবির উচ্ছ্বাস-সুসংবন্ধ, স্পষ্ট, প্রতীয়মান ফরমবিহীন স্বপ্নময়তা। এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের হাতে আরও যেন দুর্বলভাবে প্রকাশ পেলো। তাই দেখি সারা দেশে শিল্পের জগৎ কেমন যেন হীনবীর্য, ধোঁয়াটে রূপ ধারণ করলো, ছবির অন্তর্নিহিত শক্তির অভাবে। কবি রবীন্দ্রনাথ এই বিপর্যয় সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং নিজের মনে যথেষ্ট পীড়িতবোধ করছিলেন, কেননা তিনি নিজে চিত্রকর ছিলেন না এবং সেইজন্যে সরাসরি ছবি এঁকে তাঁর পক্ষে তখনও সম্ভব হয়নি দেখিয়ে দিতে ছবির আসল রূপ কেমন হওয়া উচিত। তখন তিনি কবিতার গায়ে যেসব আঁকি-বুঁকি করে ছবি আঁকার জগতে প্রবেশাধিকারের চেষ্টা করছিলেন সেগুলো তখনও তাঁকে কোন নিশ্চয়তার প্রমাণ হিসেবে আশ্বাস দিতে পারেনি। ছবি আঁকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যথেষ্ট বলে কিন্তু ছবির আঁকার রীতি, নীতি, কৌশলাদি তার আয়ত্তাধীন না থাকার দরুণ তিনি যথারীতি ছবি আঁকতে পারেননি। সেই জন্যেই তিনি কথার মাধ্যমে শিল্পীদের কাছে তাঁর আবেদন জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দঃখের বিষয় কবিগুরুর এই সব অমূল্য কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। তাই রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হলেন ছবি এঁকে দেখিয়ে দিতে ছবির সত্যিকারের রূপ কেমন হওয়া উচিত। ছবি আঁকার প্রাথমিক চেষ্টার প্রায় দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ঊনসত্তর বছর বয়সে সম্পূর্ণ নিজস্ব টেকনিকে সত্যিকারের ছবি এঁকে আধুনিক জগতে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত হলেন তখন সবাই সমূহ বিনিময়ে তাঁর ছবির দিকে তাকালেন। তাঁর জোরালো রংএর ব্যবহার এবং সুস্পষ্ট ফরম-এর অবতারণা ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে রুচিজ্ঞানের সম্পূর্ণ এক নতুন মাপকাঠির সন্ধান দিল।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম পুরোধা, যামিনী রায় বেঙ্গল স্কুলের এই সঙ্কটময় ক্ষণে যখন নিজের পথ খুঁজে নিতে সচেষ্ট ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের ছবির মহত্ত্বে এবং শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পে নতুন এক অধ্যায় রচনা করলো। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, তার মধ্যে মহৎ রূপবোধের যে আভাস পাই তার জন্য।.........রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা তখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশো বছর ধরে রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই

প্রতিবাদ করতে চান, ছবির জন্যে খুঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া। তাঁর প্রতিবাদ গোটা শৌখিন ভারতীয় শিল্প. প্রাচ্য শিল্পবাদ, সবের বিরুদ্ধে।' (যামিনী রায়। বিষ্ণু দে লিখিত পৃঃ ৮১-৮২)।

যামিনী রায় এই প্রসঙ্গে তিনটি খুবই জরুরি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন খুবই খোলাখুলিভাবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যা বেঙ্গল স্কুল মুভমেণ্টের আসল রূপের (দুর্বলতা) একটি সঠিক ধারণায় পৌছতে সাহায্য করে, যেমন (১) আমাদের জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান মস্ত এক ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে যার পূরণ এ পর্যন্ত হয়নি, (২) বেঙ্গল স্কুল চিত্র শৈলী নির্বীর্য এবং তার জন্যে প্রয়োজন এক জোরদার শিরদাঁড়া এবং (৩) ভারতের জাতীয় শিল্প সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা এনং তথাকথিত প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে যে প্রচারকার্য চলে আসছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

কিংবা অন্যকোনভাবে নিজের মতামত কদাচ জাহির করেছেন। তাঁর মতামত তিনি শুধু তাঁর নিকট বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছেন নানা আলাপ আলোচনায় অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ধীর মনোবৃত্তি অনুযায়ী তিনি সাধারণত কোন বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না। কিন্তু তাহলেও তিনি নিজে একজন দৃঢ় প্রত্যয়ের মানুষ ছিলেন এবং এই অসাধারণ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মতামত দিতে ইতস্ততঃ করেননি।

শিল্পচিন্তা : প্রদোষ দাশগুপ্ত। যুগান্তর, ২৪ মার্চ ১৯৮৫।

প্রদর্শনী ও আলোচনা

(১)

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২০ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর অবধি নিজের বাসভূমি বাগবাজারের ১/২ বি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের অনুষ্ঠিত যামিনী রায়ের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পবেত্তা ও কলারসিক ষ্টেলা ক্রামরিশ। শান্তা দেবীর কলমে প্রবাসীর, বৈশাখ ১৩৩৯ এর পাতায় এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে লেখাটির আংশিক এখানে প্রকাশিত হল।

শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী

শ্রীশান্তা দেবী

গত জানুয়ারী মাসে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের গৃহে চিত্র প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রদর্শনী মাসাধিক পূর্বে ডিসেম্বর মাসে খোলা হইয়াছিল। সামান্য তিনখানি ঘর শিল্পীর তুলিকা স্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দুইখানি ঘরে। দেওয়ালের উপর দিকে যামিনীবাবুর নিজ অঙ্কিত নানা বর্ণের সুদীর্ঘ পটগুলি ফ্রেস্কোর মত চারিধার জুড়িয়া লম্বা করিয়া বসানো হইয়াছিল। তাহার নীচে এক একখানি স্বতন্ত্র বড় ছবি। ছবির নীচে ছোট ছোট কাঠের পিঁড়িতে মাটির পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে ও ধুনুচিতে ধুনা। মেঝেগুলিতে আলপনার চিত্র; বসিবার আসনও চেয়ার নয়, একেবারে স্বদেশী আসন। চিত্রগুলির

অঙ্কন পদ্ধতি বাংলার পট অঙ্কনের পদ্ধতির মত। তাই এই সম্পূর্ণ বাংলা গৃহসজ্জা। তাহার সহিত মিলিয়া কলিকাতা শহরের পুরাতন পাড়ায় বাংলার পল্লীর স্নিগ্ধ ও প্রাকৃতিক বর্ণসুষমা ঘরের কোনেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কোন জাতীয় চিত্র প্রদর্শনী কি করিয়া সাজাইতে হয়, শিল্পী তাহা অধিকাংশের অপেক্ষাও ভাল দেখাইয়াছেন।

যামিনীবাবু পুরাতন শিল্পী। দশ বারো বৎসর পূর্বে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টে তাঁহার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা অনেক ছবি দেখিয়াছি। তিনি তৈলচিত্রে বড় বড় প্রতিকৃতি আঁকিতেন। তাঁহার পর তাঁহার বাঙলা ঘরোয়া ছবিও দেখিয়াছি। সেগুলির অঙ্কন পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিল না।

গত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে তিনি পুরাতন পাশ্চাত্য পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পদ্ধতিতে আঁকার পরীক্ষা করিতেছেন।

তিনি বলেন, তৈলচিত্র আঁকিতে আঁকিতে তাঁহার মনে হয়, রঙের বাহুল্য বর্জন করিয়া শুধু রেখার ভাষার সাহায্যেই চিত্রকরের মনের ভাব ব্যক্ত হওয়া উচিত। তাই রঙ ছাড়িয়া শুধু সাদা পটের উপর কালো তুলির রেখার সাহায্যেই তিনি কিছুদিন ছবি আঁকেন। এই ছবিগুলি সম্পূর্ণ বাংলা ধরণের নয়, খানিকটা আধুনিক পাশ্চাত্য ইম্প্রেস্যানিষ্ট রেখাচিত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। পাশাপাশি উপবিষ্টা দুই সখীর একটি চিত্র অনেকটা এই রকম। বালক কৃষ্ণ-বলরামের সুন্দর চিত্রটি ঠিক এই রকম না হইলেও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষার পরিচয় ইহাতেও পাওয়া যায়। তবু এই চিত্রগুলির ভিতর শিল্পীর বাঙালী প্রাণ আপনাকে অনেকখানি প্রকাশ করিয়াছে। বাঙালী পুরাতন পটুয়াদের ছবির নকল তিনি করেন নাই। নিজের শক্তির স্বাভাবিক বিকাশে যে রীতিতে তিনি পৌঁছিয়াছেন তাহার সহিত পটের সাদৃশ্য আছে মাত্র।

তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলা চিত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিয়াছেন। কালীঘাট হইতে শুরু করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় প্রভৃতি নানা গ্রামে তিনি যে সকল পুরানো পট সংগ্রহ করেন তাহাও তাঁহার প্রদর্শনীর একটি ঘরে সজ্জিত দেখিলাম। তিনি দেখিলেন বাঙালী পটুয়ারাও প্রধানত রেখার সাহায্যেই তাহদের মনের কথা আশ্চর্য নিপুণ ভঙ্গীতে বলিয়া গিয়াছে। ইহারা শুধু যে শিব-পার্বতী, দশানন, বালী-সুগ্রীব, লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবিই আঁকিয়াছে তাহা নয়, তাহাদের চোখে দেখা এই বাংলা দেশের নানা ছবিও তাহারা এই তুলির কালোরেখার স্বচ্ছন্দ ও শক্তিশালী ভাষায় বলিয়া গিয়াছে। প্রসাধন শেষে সুন্দরী কবরীতে স্বহস্তেও ফুল পরাইয়া দিতেছেন, তাঁহার আনত মুখ, দেহযষ্ঠিতে বেষ্টিত বস্ত্রাঞ্চল, ঊর্ধ্বে উত্থিত বাহুলতা, আঙুলের ডগায় সযত্ন স্পর্শে ফুল ধরার ভঙ্গী—সব যেন পটুয়া একটি রেখারই বহুমুখী গতির সাহায্যে আঁকিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলধারা যেমন মাটির উপর দিয়া ডালপালার ভঙ্গিতে স্বাভাবিক ভাবে গড়াইয়া চলিয়া যায়, পটুয়াদের এই রেখাগুলিও যেন তুলির মুখ হইতে তেমনি সহজে বাহির হইয়া ছবির রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ধনী হুকা হাতে তামাক খাইতে সরিয়াছেন,

প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে সপ্রেম-স্পর্শে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তরুণী দীর্ঘ কেশ রোদে শুকাইতেছে, বিড়াল প্রচণ্ড চিংড়ি মাছ ধরিয়া খাইতেছে—এইরূপ নানা বিষয়ই দেড় শত বৎসর পূর্বে বাঙালী পটুয়ারা তুলির বাঁকা টানে আঁকিয়া গিয়াছে। বাংলার গ্রামের ঘর হইতে এই রেখাচিত্রগুলি এবং রঙীন পটগুলি সংগ্রহ করিতে করিতে যামিনীবাবুর মনে হয় বাংলার চিত্রশিল্পকে পুনরুজ্জীবন দান করিতে হইলে অজন্তা রাজপুত কিংবা মোগল-পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া চলিলেই হইবে না। এগুলি ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা ভাষা যেমন বাঙালীর নিজস্ব ভাষা, তেমনি বাংলার পট বাঙালীর একান্ত নিজস্ব চিত্র। বাঙালী শিল্পীকে এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে এবং সেই পথে তিনি আপনা হইতেই বিনা অনুকরণে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙালী শিল্পী রাজপুত কি অজন্তা চিত্রপদ্ধতির সাহায্যে চিত্তকমলের সকল দলগুলি মেলিয়া ধরিতে পারিবেন না। যে ভাষা নিজের ভাষা নয় তাহা আয়ত্ত করা যায় কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে বলিয়া তাহাকে সৃষ্টির উপায় করিয়া তোলা যায় না।

যামিনীবাবুর রঙীন পটগুলির অধিকাংশই মণ্ডন শিল্পের ধরণের। বিশেষ কোনো বিষয় লইয়া আঁকা একক চিত্র অথবা কাহিনীর চিত্রাবলী সেগুলি নয়। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের চিত্রটি মণ্ডন শিল্পের মত হইলেও বিশেষ একটি বিষয় লইয়া আঁকা। বাল্মীকি ও লবকুশ সীতা ও লবকুশ ইত্যাদি ছোট ছোট কয়েকটি কাহিনীমূলক ছবি আছে। বাকী বড় চিত্রগুলি নানা ভঙ্গীতে উপবিষ্টা, অর্ঘ্য হস্তে দড়াইয়া অথবা পূজা নিবেদন ভঙ্গিতে আনতা রমণী মূর্তিগুলিকে মোটিফ হিসাবে ব্যবহার করিয়া নানা রঙে পটগুলি সাজানো হইয়াছে। এই ছবিগুলির বর্ণসুষমা ও স্বচ্ছন্দ রেখাপাত দেখিয়া মন স্নিগ্ধতায় ভরিয়া যায়। রংগুলি সবই বাংলা পটের সকল রকম মাটির রং। তবে আমরা আজকালকার চিত্রপ্রদর্শনীতে যে পটগুলি দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা যামিনীবাবুর নিজের আঁকা চিত্রের বর্ণসুষমা চক্ষুকে বেশী আনন্দ দেয়।

(২)
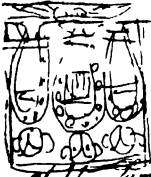
জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যামিনী রায়ের যোগাযোগ হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতিকে কেন্দ্র করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মহর্ষির জীবন থেকে আঁকা তৈলচিত্রটির অনুলিপির জন্যে অবনীন্দ্রনাথ তরুণ শিল্পী যামিনী রায়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যামিনী রায়ের অঙ্কিত ঐ মহর্ষির বিশাল তৈলচিত্রটি বর্তমানে আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।

ছবি আঁকার সূত্রেই অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তীকালে গগনেন্দ্রনাথ যামিনীবাবুর ছবির ভক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল উদ্যোগে সমবায় ম্যানসনে যে প্রদর্শনী হয়েছিল তার পেছনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটির অফিস এবং শিক্ষাকেন্দ্র সমবায় ম্যানসনে যামিনী

রায়ের ১৭৫টি ছবির প্রদর্শনী সুরু হয় ১৯৩৭ এর ১৯শে সেপ্টেম্বর। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন সেই সময়কার বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক।

The President and Committee of
THE INDIAN SOCIETY OF ORIENTAL ART
request the pleasure of

company at an
EXHIBITION OF PAINTINGS
By JAMINI ROY
at 11, ...ya Mansions, Hogg Street ...
floor / Calcutta, on Sunday, the 19th September 1937
at 5-30 P M

Hon Mr A K Fazlul Huq
Prime Minister of Bengal has kindly consented to
the Exhibition

(৩)

১০ নম্বর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ভাস্কর ক্ষিতীশ রায়ের ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত চিত্র প্রদর্শনীর মেয়াদ ছিল ১৯৩৮ এর ২রা থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর। ওই উপলক্ষে সেই সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকার সমালোচনা থেকে প্রদর্শনী সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যাবে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (১৯০১—১৯৬৫) পরে বোম্বের জে জে স্কুল অব আর্টে এবং তারও পরে বিলেতের রয়াল কলেজ অব আর্টের ছাত্র। সেখান থেকেই ভাস্কর্যকলা বিভাগের সেরা ছাত্র হিসেবে ডিপ্লোমা লাভ করেন (১৯৩৩)। আর এ. আর. সি এ (অ্যাসোসিয়েট অব দি রয়াল কলেজ অব আর্ট) সম্মানে ভূষিত হন। ঐ বছরই স্বদেশে ফিরে এসে ১০ নম্বর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ষ্টুডিও তৈরি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, আশুতোষ কলেজে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

MR. JAMINI ROY

CALCUTTA EXHIBITION OF PAINTINGS

The exihibition of Mr. Jamini Roy's paintings which opened on Friday at 10, British Indian Street has given the of a Calcutta public an opportunity of seeing the work distinguished Bengali artist.

On entering the room one is at once struck with the catholicity of Mr. Roy's style.

A portrait of van Gogh exhibiting something of the style of the master, shows the source from which Mr .Roy has drawn much of his inspiration. There is also a painting called "Two Gentlemen" very much in the manner of Cezanne and the Post-Impressionist School. A portrait of a lady is done some what in the Chinese manner., and there are several works reminiscent of Ajanta frescoes. But Mr. Roy is not a slavish imitator. His paintings, in whatever manner, are in one sense quite indevidual.

Ther is a picture of a running deer which is a happy piece of work.

(৪)

বাগবাজারে শিল্পীর আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে ১৯৪১ এর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এক প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীর সমালোচনা ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২. ১. ৪১ তারিখে। তার আংশিক এখানে ছাপা হল।

BENGALI ARTIST'S EXHIBITION

JAMINI ROY

MODERNIST & VERSATILE THEMES

By Our Art Critic

Jamini Roy's obsession, like that of the most vital painters in Europe to-day, seems to be the absolute search after the simple and the pure form, which would derive solely from the two-dimensional nature of painting. This was the problem of the Persians, of the Early Christian masters and of the folk-painters ; it is the almost in soluble problem of the modernist artist, who, lacking faith in the simple truths, still strives to attain simplicity out of his complicated and contradictory experiences.

The process followed by the most interesting among them, Picasso, Matisse, Dufuy, Soffici, has always been the same ; from the plastic they have arrived at the purely two-dimensional pictorial, to the craft-man's product where the main consideration is the insistence on the trait,

which demarcates painting from the other figurative arts. Jamini Roy, unconsciously and instinctively, because his ignorance of what is being done or has been achieved beyond the narrow circle of his personal experiences is astounding is following the same path. Hence, each exhibition of his has a new attraction ; it marks a further stage towards his ultimate goal.

(৫)

যামিনী রায়ের বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে যেকটি চিত্রকর্মের প্রদর্শনী হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি হল ১৯৪৫ এর ছবির মেলা। উদ্বোধন হয় ১৯৪৫ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি। সর্বসাধারণের জন্যে দ্বার খোলা ছিল ১৭ থেকে ২৩ এ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত।

(৬)

বিলেতের আরকেড গ্যালারিতে (১৫নং রয়েল আরকেড) শিল্পীর ছবির প্রদর্শনী হয় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। চলে ২৫শে এপ্রিল থেকে ১৬ই মে পর্যন্ত। এই প্রদর্শনী হয় রয়াল ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সৌজন্যে। বিলেতের বেশ কয়েকটি সংবাদ পত্রে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে ২৫. ৫. ৪৬. তারিখে কণ্টিনেণ্টাল ডেলি মেল পত্রিকার মতামত আংশিক ছাপা হল।

ART 1N ENGLAND

INDIA'S GREATEST LIVING PAINTER

BY PIERRE JEANNERAT

ARTISTS who abandon a lucrative mode of life in order to devote themselves to a painstaking and painful revaluation of their art have their leading pepresentative in Paul Gauguin.

We all know of the successful paris stockbroker, who, when over forty and until then a "Sunday painter," left wite, children and comfort because of an urge to give full expression to this feeling for form and colour. We all know of the desperad straits his decision brought about. and of the physical agony of genius as it flowered at last, in tune with the primitive luxuriance of south sea islands.

(৭)

এ সি. এ গ্যালারি, ৬৩, ইষ্ট, ৫৭ স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক—এই ঠিকানায় আমেরিকা শহরে শিল্পীর ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ থেকে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত। প্রথম সপ্তাহেই অর্দ্ধেক ছবি বিক্রী হয়ে যায়। দেশ বিদেশের কাগজে কাগজে এই উপলক্ষে আলোচনা সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এখানে আমেরিকান রিপোর্টারে প্রকাশিত ১৯৫৩-র ২রা অক্টোবরের খবর ছাপা হল।

আমেরিকার শিল্পানুরাগী মহলে যামিনী রায়ের চিত্রাবলীর বিপুল সম্বর্ধনা ও সমাদর

বিখ্যাত শিল্পী যমিনী রায়ের চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শহরের শিল্পানুরাগী ও শিল্প-সমালোচকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

লণ্ডনে একবার এবং প্যারিসে একবার তাঁর ছবির প্রদর্শনী এর আগে হয়েছিল ; তা ছাড়া গত ৪৫ বৎসরের মধ্যে বাহিরে কোথাও কোনও প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি যামিনী রায় বড় একটা পাঠান নি। নিউইয়র্কে তাঁর ছবির এই প্রদর্শনীর অনুমতি দিয়ে যামিনী রায় বিদেশবাসীকে তাঁর শিল্পের সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হবার সুযোগ দিলেন।

শিল্পী যামিনী রায়ের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী মিঃ হ্যারল্ড লেভেন্থ নামে একজন প্রাক্তন মার্কিণ সৈন্যের চেষ্টাতেই নিউইয়র্কে এই প্রদর্শনীটির আয়োজন বহুলাংশে সফল হতে পেরেছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শিল্পানুরাগী মার্কিণ সৈন্যেরা কলিকাতায় রায়ের শিল্পশালায় (ষ্টুডিও) প্রায়ই যেতেন।

(৮)

মার্কিন সংখ্যা স্মিথ সোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে যামিনী রায়ের ২১টি শিল্পকর্মের এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৮র ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত। এখানে সানফ্রানসিসকো থেকে প্রকাশিত 'এ্যালেনস প্রেস ক্লিপিংবুরো'র ১৯৫৭র ১লা নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনটির আংশিক তুলে ধরা হল।

Jamini Roy, French Indian Artist, Now At Park Museum

For the second time since the end of world war II the work of Jamini Roy, the Indian artist who once refused Mahatma Gandhi a private showing because, as he explained, "As a man I will gladly go and touch his feet with my hands. As an artist, never. It is his duty to come and visit, me," is being shown in the United States. Circulated by the Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, 21 paintings by the internationally known Indian painter are currently on view at M. H. De Young Memorial Museum where they will remain until November 26.

(৯)

মৃত্যুর পর শিল্পীর জীবনের পূর্বাপর কাজ নিয়ে একটি অতি মনোরম প্রদর্শনী হয় যামিনী রায়ের ১৮, বালীগঞ্জ প্লেস, ইষ্ট কলিকাতা ১৯, এই ঠিকানায়। প্রদর্শনীর আয়ুষ্কাল—১৯৭৫ এর ২৫শে জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

দেশ পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর যে সমীক্ষা ছাপা হয়েছিল তা এখানে আংশিক ছাপা হল।

চিত্র প্রদর্শনী

যামিনী রায়ের শিল্পকলার নিদর্শনের সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশী পরিচিত। তা সত্ত্বেও শিল্পীর পরলোকগমনের দু বছর পরে বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট-এ, তার নিজ বাড়িতে তাঁর পত্নী ও পুত্র অমিয় রায় তাঁর বিরাট শিল্পসম্ভার প্রদর্শনীর আয়োজন করে রসিকমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হলেন কারণ প্রদর্শনীটি সুনির্বাচিত, তার ওপর রচনাকাল অনুযায়ী ক্রমানুসারে সজ্জিত থাকায় অনেকেই শিল্পীর ইতিপূর্বে অপ্রদর্শিত ছবি দেখার সুযোগলাভ করেন। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীটি যতদিন খোলা ছিল ততদিনই দেশী ও বিদেশী বহু দর্শকের সমাগম হয়।

সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় মধ্যভাগেই যামিনী রায় দেশে ও বিদেশে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। পাশ্চাত্ত্য প্রথায় প্রতিকৃতি ও নিসর্গ দৃশ্য এঁকে জীবনের প্রথম দিকেই তিনি তৎকালীন সমাজে সমাদর লাভ করেন। তবে সাধারণ শিল্পীর মত তৎকালীন স্বীকৃতি ও স্তুতিবাদেও যে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেত পারেন নি, তা তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি থেকে জানা যায়। যামিনী রায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি বাঙালী বলে গর্ব অনুভব করতেন। একবার মনে আছে তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ তুমি বাঙালী ত? বাংলার জলবাতাসে যদি মানুষ হয়ে থাক তাহলে আমার ছবি বুঝতে পারবে। সত্যিই তাই, যামিনী রায় ছিলেন খাঁটি বাঙালী, ও এই বাংলার রূপই নানাভাবে তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্ত্য প্রথায় ছবি এঁকে সাফল্যলাভ করলেও তাঁর শিল্পীচিত্ত বিক্ষুব্ধই থেকে যায়—দেশের উপযোগী দেশের নিজস্ব কোনও বিশেষ শিল্পধারা আবিষ্কার করার জন্য তিনি যেন অস্থির হয়ে ওঠেন। অর্থ যশ ও প্রতিষ্ঠার মায়া ত্যাগ করে তিনি নিজ জন্মস্থান বেলেতোড়ে চলে যান। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া, পুতুল, খেলনা ও পটচিত্র দেখে তিনি মুগ্ধ হন ও এদের মধ্য দিয়েই যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পান। দেশের নিজস্ব এই শিল্পনিদর্শনের মধ্য থেকেই তিনি শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের রঙ তুলি ও ক্যানভাস ছেড়ে তিনি দেশী প্রথার কাগজ ও কাপড়ের ওপর দেশী কালো ও অন্যান্য রঙে, কেবলমাত্র তুলির কয়েকটি বলিষ্ঠ টানের মধ্য দিয়ে পরিচিত নানা মূর্তি আঁকতে শুরু করেন ঃ নধর নিষ্পাপ শিশুকে কোলে নিয়ে গ্রামের নারী দাঁড়িয়ে আছেন, স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল যুবতী আপনার মনে চুল বাঁধছে অথবা গৃহপালিত গরু ছাগল বা বনের কোনও পাখি। ··

(১০)

'দ্য ক্যালকাটা আর্ট গ্যালারী,' ১০ই, হোচি মিন সরণী, কলকাতা-৭১/এ শিল্পীর ২৫ টি ছবি ও ড্রইং নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত। এই উপলক্ষে প্রকাশিত অনুচিত্রাকৃতি

পুস্তিকাতে 'এন একজিবিশন অব ড্রইং' বলে উল্লেখ থাকলেও প্রদর্শনীতে অন্য মাধ্যমের ছবিও ছিল। এই ছোট পুস্তিকাটিতে ছোট ভূমিকা লিখেছিলেন কবি বিষ্ণু দে।

(১১)

ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি দিল্লীর ১২টি স্কেচ ও ১৬টি ছবি নিয়ে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন সাহিত্যিক ও শিল্পী সুভো ঠাকুর। এই উপলক্ষে প্রকাশিত ছোট পুস্তিকাতে শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর সঙ্গে 'মা ও ছেলের" রঙীন ছবি মুদ্রিত হয়।

(১২)

জন্মশতবর্ষ প্রদর্শনী

শিল্পীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় তিনটি বড় ধরণের চিত্র প্রদর্শনী হয়। যামিনী রায় বার্থ সেণ্টিনারি সেলিব্রেশন কমিটি এবং বিড়লা আকাডেমি অব আর্ট এ্যাণ্ড কালচারের যৌথ উদ্দোগে ১০৮—১০৯, সাদার্ন এভিনিউস্থ বিড়লা আকাডেমির প্রদর্শনশালায় ৬৯টি শিল্পনিদর্শন নিয়ে প্রদর্শনী হয়। বর্ষীয়ান শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, মিসেস সরলা বিড়লা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে (১৫ই এপ্রিল ৮৭) বক্তব্য রাখেন।

'দ্য আর্ট অব যামিনী রায়' এই নামে সাদা কালো ও রঙিন ছবিসহ একটি চমৎকার স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে যামিনী রায়, অধ্যাপক শহীদ সুরাওয়ার্দী, বিষ্ণু দে ও জন আরউইন, অশোক মিত্র প্রমুখ শিল্প বিশেষজ্ঞদের লেখার সঙ্গে বহু স্কেচ ও রঙীন ছবি ছাপা হয়।

অপর প্রদর্শনী হয় ৫৫, গড়িয়াহাট রোডে 'চিত্রকূট' প্রদর্শনশালায় ১১ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত। এখানে ছিল শিল্পীর পূর্বাপর কাজের মোট ৬৭টি শিল্পকর্ম।

একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে ছিল ৩৯টি ছবি। শিল্পীর নানা সময়ের প্রতিনিধিমূলক চিত্রকর্ম নিয়ে এই প্রদর্শনী শুরু হয় ১৫ই এপ্রিল। চলে ১৬ই মে পর্যন্ত।

বাঁকুড়ায় শিল্পীর জন্মভূমি বেলেতোড়ের নিয়োগী পাড়াতেও ১৫ই এপ্রিল 'শিল্পী প্রণাম' এই নামে এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

১৫ই এপ্রিল সকালে যামিনী রায়ের বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ির একতলায় চিত্রশালাতেও এক মর্ম্মস্পর্শী অনুষ্ঠানে জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ জয়পুর হাউসে যামিনী রায়ের ১৯৯টি চিত্রকর্ম নিয়ে ১৯৮৭-র ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত একটি চমৎকার প্রদর্শনী হয়। 'যামিনী রায়' এই নামি বহু স্কেচ ও ছবিসহ একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। শচীরাণী গুটুর হিন্দীতে লেখা একটি রচনাও স্থান পায়।

আমি যে সংসারে জন্মেছিলাম, বিশেষ করে আমার বাবা — তিনি, সেই সময়ের শিক্ষা, সংস্কারকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারেন নাই, তিনি নিজের জীবনে কেবলমাত্র

ছবি ছবিই। ছবি মানুষেরই রচিত। মানুষের রচিত সব কিছুরই মধ্যে তার ধর্ম, তার চরিত্র দৈনন্দিন জীবনের ও চিন্তাধারা সমস্ত কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযামিনী রায়